পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

অ্যানেস্থিসিয়া

(অবেদনবিদ্যা)

COMPLIMENTARY

ডাঃ অরুণ কুমার পাল
বি. এস. সি., এম. বি. বি. এস., ডি. এ. (ক্যাল),
এম. এস. (অ্যানেস্থিসিয়া)
রীডার, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি,
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল,
কলিকাতা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

Anaesthesia
Dr. Arun Kumar Paul

প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৮৪

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা]
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
রূপ-লেখা
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

চিত্রাঙ্কন : এস্ মিত্র
প্রচ্ছদ : দুর্গা রায়

মূল্য : বাইশ টাকা

Published by Sri Dibyendu Hota, Chief Executive officer, West Bengal State Book Board under the Centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional lauguages at the University level launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী স্মরণে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশের জন্য আমি অনেকের কাছেই বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ জে. বি. মুখার্জী, অধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলিকাতা, ডাঃ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্ট অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলিকাতা, ডাঃ হরেন ঘোষ, অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা, ডাঃ বিমল বরণ হোড়, হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্ট অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা ডাঃ প্রতুল কুমার দাশ, শিশু-শল্যচিকিৎসক, মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা এবং ডাঃ সুধীর কুমার ভট্টচার্য আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন —এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ডাঃ দিলীপ মুখার্জী, ডাঃ কে. কে. হোড়, ডাঃ ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ প্রুফ সংশোধনে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

'স্বাস্থ্যদীপিকা' সম্পাদক বন্ধুবর নিতাই পদ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে আমাকে বাংলা ভাষায় লেখার উৎসাহ দেন—এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই পুস্তক প্রণয়নে বিভিন্ন মেডিকেল পত্রপত্রিকা এবং পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং সে সকল গ্রন্থশেষে উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলির লেখকের এবং প্রকাশকের কাছে আমি সবিশেষ ঋণী।

প্রচ্ছদের বয়েল অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিন এণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের ডেভেলপমেণ্ট ম্যানেজার আর. বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যানেস্থিসিয়ার যন্ত্রপাতির বেশ কিছু ফটোগ্রাফ সরবরাহ ক'রে এবং সক্রিয় সহযোগিতা ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থের সম্পাদনা কার্যে নানাভাবে সাহায্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের শ্রী অশোক এ্যাণ্টনি বিশ্বাস এবং বহু ছবি সুন্দরভাবে এঁকেছেন এস. মিত্র —এঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই পুস্তক প্রকাশনার বিরাট দায়িত্ব বহন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। এর মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শ্রী দিব্যেন্দু হোতা এই বই প্রকাশের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন—তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

এ ছাড়াও আমার বহু শুভানুধ্যায়ী, সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রী এই পুস্তক প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং প্রভূতঃ সহযোগিতা করেছেন—এঁদের সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে শ্রীমতী কন্যাকুমারীর সবিশেষ নামোল্লেখ না করলেই নয় কেন না এঁর উৎসাহ এবং প্রেরণা ছাড়া এই বই লেখা কখনোই সম্ভব হতো না। সর্বান্তঃকরণে তাঁকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

অরুণ কুমার পাল

ভূমিকা

অ্যানেস্থিসিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং এটি শল্যচিকিৎসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আধুনিক শল্য চিকিৎসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সুনিপুণ অ্যানেস্থিসিয়ার উপর। অপারেশনের আগে, অপারেশনের সময় এবং এমন কি পরেও এই অ্যানেস্থিসিয়া এবং এর আনুষঙ্গিক প্রয়োগ পদ্ধতি রোগীকে যথেষ্ট নিরাপদে এবং নিশ্চিন্ত আরামে রাখে। তাৎক্ষণিক জরুরী চিকিৎসায় এবং ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে অ্যানেস্থিসিয়া বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। ইংরেজি ভাষায় এই অ্যানেস্থিসিয়া বিষয়ে অনেক বই আছে কিন্তু বাংলা ভাষায় নেই। অথচ শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এখন জাতীয় নীতি হিসাবে স্বীকৃত। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা এখন ক্রমেই সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে। যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় এখনও মাতৃভাষার প্রচলন হয় নি, একথা অবশ্যই সত্য যে যথাসম্ভব মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয়গুলি ছাত্রদের কাছে বুঝিয়ে দিলে ছাত্ররা যত সহজে বুঝতে পারে—ইংরেজিতে তা পারে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাতেও মাতৃভাষা স্থান পাবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অ্যানেস্থিসিয়া বিজ্ঞানের মৌলিক এবং অত্যাবশ্যক বিষয়গুলিই এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের যাতে প্রাথমিক অ্যানেস্থিসিয়া এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। আশা করি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ যারা অ্যানেস্থিসিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী, যারা রোগীর শল্যচিকিৎসা ও তাৎক্ষণিক জরুরী চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটের কার্যকলাপের সংগে জড়িত তাদের এই বই পড়ে অনুধাবন করতে বিশেষ অসুবিধে হবে না। এই বই তাদের উপকারে লাগলেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশে আধুনিক চিকিৎসা খুবই প্রচলিত এবং মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের কাছে মেডিক্যাল ইংরেজি terminology (পরিভাষা) খুবই পরিচিত। অনেক ইংরেজী শব্দ বহুল ব্যবহারে আর বিদেশী বলে মনেই হয়

না। তাই অনেক রোগের নাম, লক্ষণ, ওষুধের নাম, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় নি। অনেক সুপরিচিত ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেক সময় মূল ইংরেজি, গ্রীক এবং ল্যাটিন শব্দগুলি বাংলা বানানে লেখা হয়েছে। পরিভাষা যাতে বিষয় বোঝার পক্ষে কোন রকমের বাধাসৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। গ্রন্থখানি বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে সহজ, সরল, সাবলীল এবং বোধগম্য করার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে আশা রাখি, বাংলা ভাষায় এই প্রাথমিক বইটি অ্যানেস্থিসিয়া বিজ্ঞানের ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক জ্ঞানবিস্তারে কিছু সহায়ক হবে।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৯০

৮ডি, মধুগুপ্ত লেন,

কলিকাতা,৭০০ ০ ১২।

অরুণ কুমার পাল

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক অ্যানেস্থিসিয়ার ইতিবৃত্ত

ব্যথা, বেদনা বা যন্ত্রণা মানুষের সবচেয়ে খারাপ অনুভূতি এবং সব থেকে বড় শত্রু। পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই যে কোন রকমের যন্ত্রণার শিকার হয়নি। আগেকার দিনে যখন অ্যানেস্থিসিয়ার বা অবেদন বিদ্যার কোন প্রচলন ছিল না, অথচ রোগ নিরাময়ের জন্য যখন শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হোত তখনই বোধ হয় মানুষ ভয়াবহ যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে বাধ্য হোত। তখন রোগীকে ধরে-বেঁধে কোনরকমে অপারেশন করা হোত এবং তা রোগীর পক্ষে এক অতি কঠোর যন্ত্রণাদায়ক পরীক্ষা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই শল্যচিকিৎসা-জনিত যন্ত্রণা উপশমের জন্য নানা রকমের ওষুধ, যেমন আফিম, সুরা, গঞ্জিকা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তার ফল হয়েছে অতি সামান্যই। শল্য-চিকিৎসক কোনরকমে তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করতে বাধ্য হতেন, তা তাঁর যতই দক্ষতা থাক না কেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, নানা অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক উপায়ে তখন শল্যচিকিৎসার জন্য মানুষের ব্যথা-বেদনার অনুভূতিকে কমানো হোত। রোগীর মাথায় কাঠের বাটি রেখে ক্রমাগত তার উপর পেটানো চলতো যতক্ষণ না রোগী অজ্ঞান হয়। আবার আসিরিয়ানরা (Assyrians) তাদের ছেলেদের সুন্নত করাতো শ্বাসরুদ্ধ করে, আধমরা অবস্থায়। বলা বাহুল্য অনেক সময়ই হিতে বিপরীত হতো এবং রোগীর মৃত্যুও ঘটতো।

শল্যচিকিৎসার জন্য নিরাপদ নির্বিঘ্ন অ্যানেস্থিসিয়ার কথা ভাবা হয় আজ থেকে প্রায় ১৪০ বৎসর আগে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে James Esdaile রোগীকে সম্মোহিত করে প্রায় ২৬১টি হারনিয়া, হাইড্রোসিল ব্যথাহীনভাবে অপারেশন করেন। আর এটি করেন আমাদের ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবংগের হুগলীর এক হাসপাতালে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে James Braidও এই প্রথায় কিছু অপারেশন করেন। কিন্তু এর ব্যবহার খুবই সীমিত ছিল—সব সময় ফলপ্রদ ছিল না, অনেকাংশে রোগীর মানসিক অবস্থা এবং চিকিৎসকের বিশেষ পারদর্শিতার উপর এর সাফল্য নির্ভর করতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে Joseph Priestley অক্সিজেন এবং নাইট্রাস

অক্সাইড আবিষ্কার করেন। তখন নাইট্রাস অক্সাইডের অজ্ঞান করার ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল না। Sir Humphry Davy প্রথমে বলেন যে নাইট্রাস অক্সাইড শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে নিলে ব্যথা-বেদনার অনুভূতি অনেক কমে যায়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Colton আমেরিকার হার্টফোর্ড শহরে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের নানারকম ক্রিয়া-বিক্রিয়া সর্বসমক্ষে দেখান। Horace Wells নামে এক দন্তচিকিৎসক লক্ষ করেন যে এই গ্যাসের প্রভাবে সাময়িকভাবে মানুষের ব্যথা-বেদনা একেবারে লুপ্ত হয়। Wells-এর অনুরোধে Colton একটি দাঁত তোলেন এই নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করে, এবং সম্পূর্ণ ব্যথাহীনভাবে। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ দিনই ঐ মুহূর্তেই আজকের আধুনিক অ্যানেস্থিসিয়ার জন্ম হোলো। Wells পরে বোষ্টন শহরে তাঁর এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন কিন্তু হারভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে ঐ পদ্ধতিতে দাঁত তোলার সময় রোগী যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করে। ফলে লোকে Colton-এর আবিষ্কারকে গুরুত্ব দেয় না এবং তাঁকে জুয়াচোর বলে বিতাড়িত করে। অবশ্য পরে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে Colton আবার নাইট্রাস অক্সাইড অ্যানেস্থিসিয়ার প্রচলন করেন। কিন্তু তখনকার দিনে নাইট্রাস অক্সাইড তৈরীর ভাল ব্যবস্থা ছিল না, এমন কি রোগীকে প্রয়োগ করারও ভাল যন্ত্রপাতি কিছু ছিল না। তাই এর ব্যবহার খুব ব্যাপক ছিল না এবং অনেক সময় ঠিক কার্যকরী করাও কঠিন ছিল।

আজ পর্যন্ত অজ্ঞান করার যত ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে ইথারের নাম বহুল প্রচারিত এবং ব্যবহৃত। বিশেষতঃ আমাদের দেশে ইথারের ব্যবহার এখনও অতি ব্যাপক। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে Valerius Cordus এই ইথার প্রথম তৈরী করেন এবং এর নাম দেন Sweet Oil of Vitriol। কিন্তু তখন এই ওষুধের অজ্ঞান করার জন্য ব্যবহার জানা ছিল না। Long ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে অজ্ঞান করার জন্য ইথারের ব্যবহার করেন। কিন্তু সে সময় জনসাধারণ এই অজ্ঞান করা জিনিসটিকে মোটেই ভাল চোখে দেখেনি এবং এটিকে তারা শয়তানের কাজ বলেই মনে করতো। জনসাধারণের ভয়ে Long ইথারের ব্যবহার বন্ধ করে দেন। তাঁর কাজের কথা তিনি লিপিবদ্ধও করেননি। সুতরাং ইথার অ্যানেস্থিসিয়ার প্রবর্তক বলে আমরা Mortonকেই ধরে নিই। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইথারের ব্যবহার করেন।

Jackson ছিলেন তখনকার দিনে এক রসায়নবিদ। তিনিই প্রথম Morton-কে সালফিউরিক ইথারের অজ্ঞান করার ক্ষমতা সম্বন্ধে জানান। Morton এতে

খুবই উৎসাহিত হয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইথারের ব্যবহার সম্বন্ধে নিশ্চিত হন। তিনি তখন ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ জেনারেল হাসপাতালে সর্বপ্রথম ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর সর্বসমক্ষে ইথার অ্যানেস্থিসিয়া দেখান। রোগী অপারেশন-জনিত কোন ব্যথা, বেদনা বা যন্ত্রণা বুঝতে পারেনি। Morton-এর এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং সকলে মুক্তকণ্ঠে Morton-এর প্রশংসা করেন।

Dr. Oliver Wendell Holmes এই অজ্ঞান অবস্থাকে সর্বপ্রথম 'anaesthesia' নামে অভিহিত করেন Mortonকে লেখা এক চিঠির মাধ্যমে। অবশ্য গ্রীক দার্শনিকরা এই কথাটি আগেই ব্যবহার করেছিলেন এবং ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের Bailyর ইংলিশ ডিক্সনারীতেও একথার উল্লেখ আছে।

যাই হোক, ইথারের পরেই অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য যে ওষুধটির নাম করতে হয় সেটি হোল ক্লোরোফর্ম। এই ক্লোরোফর্মের আবিষ্কার ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনজন বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এর আবিষ্কার করেন। এঁরা হলেন নিউইয়র্কের Samuel Guthrie, ফ্রান্সের E. Soubeiran এবং জার্মানীর J. Von Leibig। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে Dumus এর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেন, এর ফরমুলা তৈরী করেন এবং এর নামকরণও করেন। এর অজ্ঞান করার ক্ষমতা তখন কিন্তু জানা ছিল না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে Flourens প্রথমে এই তথ্য আবিষ্কার করেন এবং দেখেন যে ক্লোরোফর্ম ভেপার নিঃশ্বাসের সংগে নিলে প্রাণী এক অচেতন অবস্থায় আসে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দেই Simpson এর ব্যাপক ব্যবহার করেন। ধাত্রীবিদ্যায় ক্লোরোফর্ম ব্যবহার তিনিই প্রথম করেন। Simpson-এর এই অজ্ঞান করার কাজও তখনকার দিনে লোকে শয়তানের কাজ বলেই মনে করতো। কিন্তু Simpson বলতেন, এই অ্যানেস্থিসিয়ার প্রবর্তন বহুযুগ আগে থেকেই ভগবান নিজেই করে গেছেন। যখন ভগবান ইভ তৈরীর জন্য অ্যাডামের পাঁজর কেটে নেন তখন তিনি অ্যাডামকে যন্ত্রণা উপশমের জন্য গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন করে রাখেন। সেই গভীর নিদ্রাবস্থা এখনকার অ্যানেস্থিসিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

John Snow তখনকার দিনে ৪০০০-এর বেশী রোগীকে ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়া দেন এবং সব থেকে আশ্চর্য, একটি রোগীও এতে মারা যায়নি। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ায় Snow-এর অবদান অনেক। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তিনি ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়া দেন তাঁর অষ্টম সন্তান Prince Leopold-এর জন্মের সময়, গর্ভ-যন্ত্রণা কমানোর জন্য। পরে মহারাণী Snowর

এই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এমন কি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিয়াত্রিসের জন্মের সময়ও আবার ক্লোরোফর্মের সাহায্য নেন যন্ত্রণা উপশমের জন্য। এর পর থেকেই সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে অ্যানেস্থিসিয়াকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। পরে ক্লোরোফর্ম এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে অ্যানেস্থিসিয়া মানেই যেন ক্লোরোফর্ম করা—দুটি কথা যেন অভিন্ন।

এর পর থেকেই অ্যানেস্থিসিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে একটি বিশেষ স্থান দখল করে। নানান রকম অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ, তার প্রয়োগের নানা কৌশল, যন্ত্রপাতি একটির পর একটি আবিষ্কৃত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরও অনেক ওষুধ, যেমন ট্রাইক্লোরোএথিলিন, হ্যালোথেন, মেথোক্সিফ্লুরেন ইত্যাদি ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইনট্রাভেনাস ওষুধ, যেমন থায়োপেন্টোন (thiopentone), কেটামিন (ketamine), অ্যালথেসিন, (althesin), প্রোপানিডিড (propanidid) ইত্যাদি এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে Claude Bernard যে কিউরারী (curare) আবিষ্কার করেন সেটি তখন দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা তীরের ফলায় বিষ হিসাবে ব্যবহার করতো। পরবর্তীকালে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এটি আধুনিক অ্যানেস্থিসিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। Griffith এবং Johnstone ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে curareকে প্রথম অ্যানেস্থিসিয়ায় ব্যবহার করেন muscle relaxant হিসেবে। এর পরে গ্যালামিন (gallamine), প্যানকিউরোনিয়াম (pancuronium), অ্যালকিউরেনিয়াম (alcuranium), সাক্সামেথোনিয়াম (suxamethonium) ইত্যাদি muscle relaxant-এর প্রচলন হয়েছে। এই সব muscle relaxant-এর ব্যবহারের ফলেই আজকালকার endotracheal অ্যানেস্থিসিয়া এত উন্নত হয়েছে। এর জন্য Magill-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনিই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম endotracheal অ্যানেস্থিসিয়ার ব্যবহার করেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে Lundy প্রথম balanced বা সুষম অ্যানেস্থিসিয়ার কথা বলেন। এতে একটি ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের চেয়ে কয়েকটি বিশেষ ওষুধ যথাসম্ভব অল্প পরিমাণে রোগীকে প্রয়োগ করে আশানুরূপ এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অ্যানেস্থিসিয়া পাওয়া যায়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে Dennis Jacknon প্রথম অ্যানেস্থিসিয়াতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড

absorption প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন এবং Waters ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে আধুনিকীকরণ করেন।

কৃত্রিমভাবে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজের জন্য anaesthetistদের করণীয় বর্তমানকালে অনেক। Endotracheal intubation করে, Boyle apparatus-এর সাহায্যে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে রোগীকে কৃত্রিম শ্বাস নিতে সাহায্য করা হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে Crawford প্রথম যান্ত্রিক respirator-এর প্রবর্তন করেন। এটি বর্তমানে একটি অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং অনেক সময়ই অপারেশন থিয়েটার এবং intensive care unit-এর আধুনিক যন্ত্রপাতির অন্যতম।

অ্যানেস্থিসিয়ার এই প্রগতির ফলে এখন কত খারাপ খারাপ রোগী—যাদের আগে অপোরেশন করা যেত না, এখন তা কত সহজে করা যায়। এখন মস্তিষ্কের চিকিৎসায়, হার্টের অসুখে, কচি বাচ্চাদের এবং অতি বৃদ্ধদের শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার আধুনিক ওষুধ এবং পদ্ধতি বেরিয়েছে। ফলে অপারেশনে এখন আর ততটা ভয়ের কারণ নেই।

Resuscitation-এর ক্ষেত্রেও এই অ্যানেস্থিসিয়া বিভাগের কৃতিত্ব অনেক। রক্ত সঞ্চালন, intravenous থেরাপি, অক্সিজেনের ফলপ্রদ ব্যবহার কত জীবনকে যে মৃত্যুর দিক থেকে ফিরিয়ে আনে তার ইয়ত্তা নেই।

Regional analgesia-র ক্ষেত্রে বর্তমানকালে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। এক্ষেত্রে রোগীকে অজ্ঞান না করেই অপারেশনের জায়গাটি ব্যথা-বেদনাহীন, অসাড় রাখা হয়। অপারেশনের খানিক পরেই আবার অনুভূতি ফিরে আসে —স্বাভাবিক হয়ে যায়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে Karl Kollar কোকেন আবিষ্কার করেন এবং তারপর থেকে আরও অনেক local বা সীমাবদ্ধ অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। এদের মধ্যে প্রোকেন, অ্যামিথোকেন, লিগনোকেন, বুপিভ্যাকেন, মেপিভ্যাকেন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। Regional analgesia-র ক্ষেত্রে spinal analgésia এবং epidural analgesia বর্তমানকালে ব্যাপক প্রচলিত।

বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিশেষ চৈনিক পদ্ধতি acupuncture অ্যানেস্থিসিয়ার প্রচলন কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। বিশেষতঃ চীনে এবং জাপানে এর ব্যাপক প্রচলন। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এটি ঠিক ঐভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না, যদিও যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

বর্তমানে অ্যানেস্থিসিয়া বিভাগের কাজকর্ম শুধুমাত্র ব্যথাহীন শল্যচিকিৎসার

ক্ষেত্রে অপারেশন থিয়েটারেই সীমাবদ্ধ নয়। Pain clinic-এ, Intensive care unit-এ, এবং Poison treatment centre-এ অ্যানেস্থিসিয়া বিভাগের কাজ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। রোগীর fluid therapy, blood transfusion therapy, inhalation therapy এবং resuscitation-এর ক্ষেত্রে এদের অবদান অনস্বীকার্য। নানারকম বিষক্রিয়ায়, যেমন ঘুমের ওষুধের বিষক্রিয়ায়, বারবিচুরেট বিষক্রিয়ায়, কীটনাশক ওষুধের বিষক্রিয়ায়, এমন কি সর্পদংশনের ক্ষেত্রেও তাৎক্ষণিক চিকিৎসা anaesthetist দিয়ে করানোই শ্রেয়। কিছু জীবন সংশয়কারী অসুখ, যেমন status asthmaticus, status epilepticus, eclampsia, টিটেনাস, পোলিওমাইলাইটিস, myasthenia gravis ইত্যাদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে anaesthetistদের অবদান অনেক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অ্যানেস্থিসিয়ার ভয়-ভাবনা

আধুনিককালে শল্যচিকিৎসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। সবরকমের অপারেশন করা এখন কত সহজসাধ্য এবং নিরাপদ। রোগীর অপারেশনজনিত কষ্টও এখন বহুল পরিমাণে কমিয়ে আনা হয়েছে। এই শল্যচিকিৎসার অগ্রগতি কিন্তু একান্ত ভাবেই অ্যানেস্থিসিয়ার অগ্রগতির সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অ্যানেস্থিসিয়ার এত বিরাট অগ্রগতি সত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অপারেশন ও অ্যানেস্থিসিয়া সম্বন্ধে নানারকমের ভীতি আছে। কলকাতার মেডিকেল কলেজে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা প্রায় ৯৫ জন রোগীই অপারেশনের আগে নানারকম ভয়-ভাবনায় ভোগেন। আমরা যারা হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজের সংগে জড়িত, সাধারণতঃ রোগীর সামগ্রিক ভয়-ভাবনা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হই না। অনেক সময়েই এটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না। কিন্তু একটা অপারেশনের ভালোমন্দ অনেক কিছুই নির্ভর করে রোগীর মানসিক ভারসাম্যের উপর। বেশী রকমের ভয় রোগীর মনে অস্থিরতা আনে, রোগী ডাক্তারের সংগে সহযোগিতায় অক্ষম হয়। রাত্রে রোগীর ঘুম হয় না। রোগীর metabolic rate বেড়ে যায়। অপারেশনের পরেও নানা-রকমের জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে, এমন কি মানসিক বৈকল্যের কারণও হতে পারে।

রোগীরা সাধারণতঃ নানারকমের ভয়ের কথা ব্যক্ত করেন। অনেকে অজ্ঞান হতেই চায় না। কেউ মনে করেন অজ্ঞান অবস্থায় মনের গোপন কথা বেরিয়ে পড়বে। অপারেশনের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসতে পারে—এমনও অনেকে ভয় করেন। অনেকে মনে করেন, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন—আর জ্ঞান ফিরেই আসবে না। অপারেশনের পরের কষ্ট, যেমন ব্যথা, বেদনা, বমি ইত্যাদির ভয়ও অনেকের মনে থাকে॥

এছাড়াও আরও অনেক সমস্যাই রোগীর ভয়-ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাটাকুটি। সাংসারিক এবং পয়সাকড়ির ভাবনা, বাড়ী

থেকে অন্য জায়গায় থাকা, ইত্যাদি। হাসপাতালে অন্য রোগীর মৃত্যুদৃশ্য, নিকটাত্মীয়ের হাসপাতালে মৃত্যুস্মৃতি রোগীর মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। রোগীর যদি আগে কোন অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়া হয়ে থাকে তার স্মৃতি রোগীর ভয়-ভাবনার কারণ হতে পারে। অবশ্য অনেকে অপারেশনের পর ডাক্তারবাবু কি বলবেন—অসুখ সম্পূর্ণভাবে সারবে কি না—এসব ভাবনাও ভাবেন।

কিন্তু আজকের আধুনিক অ্যানেস্থিসিয়া সাধারণভাবে নিরাপদ ; অ্যানেস্থিসিয়াজনিত ভীতির বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বর্তমানকালে অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করার সময় কোন কষ্ট হয় না, উপরন্তু অনেক সময় বিশেষ আরামপ্রদ হয়। যতক্ষণ দরকার সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নেই রোগীকে অজ্ঞান রাখা যায়। অপারেশন শেষ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে। অপারেশনের আগে রোগীকে বিশেষভাবে সবরকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অ্যানেস্থিসিয়ার পক্ষে নিরাপদ ও উপযোগী করে নেওয়া হয়, যাতে পরে কোন রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। রোগী যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে তার নাড়ীর গতিপ্রকৃতি, রক্তচাপ, শ্বাসপ্রশ্বাস, দেহের তাপ-মাত্রার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয় যাতে অপারেশন ও অ্যানেস্থিসিয়ার কোন কুফল রোগীর ক্ষতি করতে না পারে। অপারেশনের পরেও রোগীর সবরকমের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখা হয়।

আজকের দিনে রোগী নিজের পছন্দ মত অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ বা প্রয়োগ-কৌশল বেছে নিতে পারেন যদি তার মোটামুটি অ্যানেস্থিসিয়া সম্বন্ধে একটা আন্দাজ থাকে। আজকাল অনেকেই অজ্ঞান অবস্থায় না থেকে অপারেশনের জায়গা অনুভূতিহীন করে (regional analgesia) অপারেশন করাতে পারেন। আবার অনেকে পুরোপুরি অজ্ঞান অবস্থায় থেকেই অপারেশন করাতে চান। রোগীর নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং তার বক্তব্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়গুলিকে সব সময়েই কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার ভয়-ভাবনা দূর করার জন্য ডাক্তার-রোগীর সম্পর্কের বিশেষ উন্নতির প্রয়োজন। Anaesthetist এবং রোগীর সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ, শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং সহানুভূতিপূর্ণ। অপারেশনের দু-চার দিন আগে থেকেই রোগীর সংগে anaesthetist-এর পরিচয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই pre-anaesthetic visit-এর সময় রোগী তার সমস্ত সমস্যা, ভয়-ভাবনা

খোলাখুলিভাবে তাঁর ডাক্তারকে বলবেন। অবশ্য anaesthetistও রোগীর মনের কথা সহৃদয়ভাবে জানতে চেষ্টা করবেন এবং সামান্য ভয়ের কারণ খুঁজে পেলেই তা যাতে আর না বাড়ে এবং রোগী যাতে পুরোপুরি মানসিক সুস্থিরতা ফিরে পায় তার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করবেন।

অপারেশন থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম, বিরাট বিরাট আলো, নানারকম যন্ত্রপাতি, বিচিত্র পোশাকে ডাক্তার-নার্স দেখে অনেক রোগীই বেশ ঘাবড়ে যান। সে ভয় কাটানোর জন্য যদি রোগীর আগের থেকে অপারেশন থিয়েটার সম্বন্ধে, অ্যানেস্থিসিয়া এবং আনুষঙ্গিক পারম্পর্য সম্বন্ধে একটু-আধটু জানা থাকে, তাহলে রোগীকে হঠাৎ অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকে পড়তে হয় না—তার মনও বেশ শান্ত সুস্থির থাকে।

ওষুধ প্রয়োগের দ্বারা ভীতিজনিত শারীরিক কুফল অবশ্যই অনেক কমানো যায়, কিন্তু anaesthetist এবং রোগীর হৃদ্য-সম্পর্ক রোগীর মনে অনেক সাহস জোগাতে পারে। এই pre-anaesthetic visit অবশ্যই উপযুক্ত নিরাপদ অ্যানেস্থিসিয়ার সহায়তা করে। উপরন্তু রোগীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস, গভীর প্রত্যয়, নিরাপত্তা বোধ এবং সাহস সঞ্চার করে এবং এতে ডাক্তার-রোগীর সম্পর্কও দৃঢ় হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

অ্যানেস্থিসিয়ায় সম্মোহন বিদ্যা

সে আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগেকার কথা। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনার ফ্রেডারিক অ্যান্টন মেসমার (Mesmer) একটি অদ্ভুত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা দিয়ে মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে সম্পূর্ণ বশ বা আয়ত্তাধীন করা যায়। এটি জাগরিত মানব মনের এক পরিবর্তিত অবস্থা। এটি এক কৃত্রিম উপায়ে মোহনিদ্রা উৎপাদন। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষ তখন একমাত্র তার hypnotist-এর কথামত কাজ করে। এটিই সাধারণভাবে মেসমেরিজ্‌ম্ নামে বহুল প্রচারিত। অবশ্য Mesmer এটিকে animal magnetism বা জীবদেহের চুম্বক-শক্তি নামে প্রচার করেছিলেন। Anton Mesmer তাঁর এই পদ্ধতি প্রয়োগে নানা রকমের অসুখ সারাতে পারতেন—ব্যথা-বেদনার উপশমও করাতে পারতেন। হিষ্টিরিয়াজনিত অন্ধত্বও সাফল্যের সংগে তিনি চিকিৎসা করেছিলেন।

ফ্রান্সের ষোড়শ লুই-এর অনুরোধে, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে French Academy of Science-এর তত্ত্বাবধানে একটি কমিশন নিযুক্ত হয় এই সম্মোহন বিদ্যার যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য। এই কমিশন কিন্তু এই animal magnetism-এর বিরূপ সমালোচনা করেন। তবুও পরবর্তী কালে এই মেসমেরিজ্‌ম্ অনেক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করে।

Maxime Puysegur ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বলেন যে এই mesmerism-এর সাহায্যে অপারেশনজনিত কষ্ট লাঘব করা যায়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে Cloquet এই mesmerism-এর সাহায্যে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে তার mastectomy অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে John Elliotson নামে এক ইংরাজ শল্যচিকিৎসাবিদ mesmerism অ্যানেস্থিসিয়ার সাহায্যে বেশ কিছু শল্যচিকিৎসা করেন। কিন্তু সাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে University College Hospital থেকে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অবশ্য ১৮৪৬ সালে Elliotson তাঁর Harverian Oration-এ এই শল্যচিকিৎসায় hypnosis সম্বন্ধেই বক্তৃতা করেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে James Esdaile নামে এক ইংরাজ চিকিৎসক Bengal

Medical Service-এ যোগ দিয়ে হুগলীর এক হাসপাতালে আসেন। Elliotson-এর mesmerism সম্বন্ধে তিনি শুনেছিলেন এবং নিজে উৎসাহিত হয়ে প্রায় ২৬১টি শল্যচিকিৎসা করেছিলেন সম্পূর্ণ ব্যথাহীন অবস্থায়, এই মেসমেরিজ্‌মের সাহায্যে। এই চিকিৎসায় মৃত্যুহারও ছিল অতি নগণ্য, মাত্র ৫.৫%। এই সব তথ্য তিনি Mesmerism in India নামে বইয়ে প্রকাশ করেন।

James Braid ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মেসমেরিজ্‌ম্ নিয়ে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন এবং এর প্রথম নামকরণ করেন hypnosis।

কিন্তু ১৮৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানেস্থিসিয়ার অনেক ভালো ওষুধ, যেমন ইথার, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদির প্রচলন হওয়ার পর এই hypnosis অ্যানেস্থিসিয়ার ব্যবহার প্রায় পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য আধুনিক কালে এই পদ্ধতি আবার বেশ চালু হচ্ছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এই hypnosis-এর অ্যানেস্থিসিয়ায় ব্যবহার স্বীকার করে নেয় এবং ব্যাপক ব্যবহার এবং শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহিত করে। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনও অনুরূপ ভাবে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতির স্বীকৃতি দেয়।

Hypnosis এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে তার hypnotist-এর কাছে বশীভূত হয়। প্রথমাবস্থায় রোগী শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ শিথিল এবং শান্ত থাকে—ঘুম ঘুম মনে হয়। রোগীকে সাধারণ ভাবে চোখ বন্ধ রাখতে বলা হয়, তার পরে চোখ বন্ধ অবস্থায় কপালের ঠিক মাঝখানে একটি কাল্পনিক বিন্দুর দিকে দৃষ্টি ও মনকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করতে বলা হয়। পরে রোগী hypnotist-এর ব্যক্তিত্বে নির্ভর করে এবং তাঁর কথা বা suggestion মত চলে। অবশেষে শরীরে ব্যথা অনুভূতিহীন হয়—মন পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়। স্মৃতিশক্তির বিলুপ্তি ঘটে। সর্বশেষে পরিপূর্ণ অ্যানেস্থিসিয়া হয়—রোগী প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় থাকে।

এই পদ্ধতি বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী। শিক্ষিত রোগীরা তাড়াতাড়ি বশীভূত হয়। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এবং মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের hypnosis না করাই ভালো।

এই পদ্ধতিতে রোগী অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে বা শুধু ঘুমিয়ে থাকতে পারে। কোন ওষুধই লাগে না, তাই ওষুধজনিত কোন কুফলে রোগীকে ভুগতে হয় না। এটি সাধারণভাবে অপারেশনের আগে এমন কি পরেও, hypnosis-

এর রোগীর পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং রোগীর শারীরিক ও মানসিক কষ্টের উপশম করা যায়।

কিন্তু এ পদ্ধতি সম্পর্কে সকল anaesthetistই বেশ ওয়াকিবহাল নয়। এটার প্রয়োগ বেশ সময়সাপেক্ষও বটে। সব রোগীর ক্ষেত্রেই পূর্ণ সাফল্য পাওয়া যায় না। সুতরাং এই পদ্ধতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে—যেমন ছোটখাট অপারেশনে—যেখানে অ্যানেস্থিসিয়ার অন্য সব পদ্ধতি বেশ নিরাপদ নয়, শিশুদের ক্ষেত্রে যেখানে বারবার অ্যানেস্থিসিয়ার দরকার হয় এবং অপারেশনের পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য।

অনিচ্ছুক রোগীকে কখনোই সম্মোহিত করা যায় না। যারা সব সময়েই নানারকম ভয়-ভাবনায় ভোগেন তাদেরও সম্মোহিত করা শক্ত। ইচ্ছুক রোগীদের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগকে মোটামুটি সম্মোহিত করা যায়, বাকী ২০ ভাগ কিন্তু ভালোভাবে সম্মোহিত হয় না।

যদি hypnosis শাস্ত্রসম্মতভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা করানো হয় তবে কখনোই রোগীর ক্ষতি করে না। এ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে রোগীর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং তার hypnotist-এর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর। রোগী এবং hypnotist-এর ভাল সম্পর্ক এবং তাঁদের ব্যক্তিত্বেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে সম্মোহনের সাফল্যের ক্ষেত্রে।

আজকাল ব্যথাহীন প্রসবের জন্য এই সম্মোহন বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এতে মায়ের প্রসববেদনায় কোন কষ্ট হয় না—রোগী সম্পূর্ণ জেগে থাকে—ডাক্তারের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং কোন ওষুধও লাগে না। যদি আগে থেকেই রোগীকে antenatal clinic-এ সম্মোহনের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া যায় তা কার্যকালে প্রসবের সময় অধিকতর কার্যকরী হয়। অনেকে আবার নিজেনিজেই সম্মোহনের পক্ষপাতী (autohypnosis)—এতে অপর কোন hypnotist-এর প্রয়োজন হয় না—রোগী নিজের ইচ্ছামত সম্মোহিত হয়।

যাই হোক, আমাদের দেশে এখনও খুব কম চিকিৎসকই এই hypnosis অ্যানেস্থিসিয়ার ব্যবহার করেন। কিন্তু সন্দেহ নেই, চিকিৎসাশাস্ত্রে এই সম্মোহন-বিদ্যার ব্যাপক গবেষণা ও প্রসার বাঞ্ছনীয়। যে সম্মোহন বিদ্যা প্রাচীন কালে বহুল প্রচারিত ছিল—মুনি-ঋষিরা এই বিদ্যার সাহায্যে দৈহিক পীড়ার চিকিৎসা করতেন, অরণ্যের হিংস্র প্রাণীদের বশ করে রাখতেন—সেই সম্মোহন বিদ্যার আধুনিক কালে সম্যক প্রচলন হওয়া উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

অক্সিজেন ও তার ব্যবহার

বাতাস ছাড়া মানুষের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব—এ কথা সাধারণ লোকও জানে। বাতাসে থাকে অক্সিজেন—শতকরা প্রায় ২১ ভাগ। মানুষ শ্বাসকার্যের জন্য নাক ও মুখ দিয়ে বাতাস ফুসফুসে নেয়; সেখান থেকে অক্সিজেন রক্তের মধ্যে যায়। সেই অক্সিজেন-পুষ্ট রক্ত থেকে দেহের প্রতিটি জীবকোষ অক্সিজেন আহরণ করে। অক্সিজেনের অভাব হলে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

অক্সফোর্ডের John Mayow ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লক্ষ্য করেন যে আগুন এবং শ্বাসকার্যের জন্য বাতাস একান্ত দরকার। এও লক্ষ্য করেন যে একটি বন্ধ জায়গায় এক-পঞ্চমাংশ বাতাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্বাসকার্য চলতে পারে। Mayowর এই কাজ তখনকার দিনে বেশী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি এবং এর প্রচারও বিশেষ হয়নি। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে Priestley প্রথম অক্সিজেন আবিষ্কার করেন কিন্তু তখন এর নাম অক্সিজেন ছিল না। Priestley এর নাম দেন dephlogisticated air। পরের বছর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে Scheeleও এই অক্সিজেন তৈরী করেন। Lavoisier প্রথম এর নাম দেন অক্সিজেন। তখনও কিন্তু মানব দেহের উপর অক্সিজেনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ছিল না। মানুষের উপর অক্সিজেনের ব্যাপক ব্যবহার করেন Beddoes ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি অক্সিজেনকে সর্বরোগহর বলে মনে করতেন। তিনি একটি ক্লিনিক খুলেছিলেন এবং অক্সিজেনের সাহায্যে নানারকম রোগের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু তখনকার দিনে অক্সিজেনের ঠিকমত গুণাগুণ এবং প্রয়োগবিধি জানা ছিল না। সে সব না জানার জন্য অনেক অসুখই এই অক্সিজেনে ভাল হওয়া সম্ভব ছিল না। Beddoes কুষ্ঠ এবং পঙ্গু লোকেরও এই অক্সিজেন দিয়ে চিকিৎসা করতেন, কিন্তু বলাই বাহুল্য এ সব রোগ কখনোই এতে সারতো না। ফলে তাঁর দুর্নাম হতে থাকে এবং অক্সিজেনের ব্যবহার অত্যন্ত কমে যায়। বর্তমানে অক্সিজেনের ব্যাপক চর্চা হয়েছে। এর ফলে অক্সিজেনের গুণাগুণ ও চরিত্র নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। অক্সিজেন ঠিক কোন কোন অসুখে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োগ

করা উচিত, কি ভাবে অক্সিজেন দিলে ভাল হয়—তা বোঝা সম্ভব হয়েছে। এই সব গবেষণার জন্য **Haldane, Barcroft** এবং **Henderson**-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অক্সিজেন এক স্বাদহীন, বর্ণহীন এবং গন্ধহীন বায়বীয় পদার্থ। এর specific gravity ১˙১০৫, যেখানে বাতাসের specific gravity ১। কিছু পরিমাণে এটি জলে দ্রবীভূত হয়। যদিও এটি নিজে দাহ্য নয়, তবে এটি দহনে সাহায্য করে। এই অক্সিজেন কল-কারখানায় (commercial) এবং ওষুধ হিসাবে (medicinal) ব্যবহার হয়। এই অক্সিজেন উচ্চচাপে সিলিণ্ডারে ভর্তি করে রাখা হয়। এই অক্সিজেনের সিলিণ্ডারগুলি পুরোটাই কালো রঙের হয় এবং মাথার দিকে সাদা রঙের বর্ডার দেওয়া থাকে। ফলে সহজেই এটি চেনা যায় এবং ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা কম থাকে। চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত (medicinal) অক্সিজেন অন্তত পক্ষে শতকরা ৯৯˙৫ ভাগ খাঁটি হওয়া উচিত।

আমাদের জীবনধারণের জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হয়। এই শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার সময় বাতাসের সংগে অক্সিজেন আমাদের ফুসফুসে যায়। সেই ফুসফুস থেকে একটি জটিল প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন আমাদের রক্তের লোহিত কণিকার হিমাগ্লোবিনে যায়। এটি অল্প পরিমাণে রক্তের প্লাজমাতে দ্রবীভূত অবস্থায়ও থাকে। এই রক্ত রক্তনালী দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের প্রত্যেক পেশী ও কোষগুলিতে যায়। সাধারণভাবে তার থেকেই সমস্ত জীবকোষ অক্সিজেন পায়। জীবকোষে নানারকম ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে কারবন-ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং তা venous blood হয়ে ফুসফুসে আসে। সেখান থেকে কারবন-ডাইঅক্সাইড নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

শরীরে অক্সিজেনের অভাব নানা কারণেই ঘটতে পারে। প্রথমতঃ বাতাসেই যদি অক্সিজেনের ভাগ অত্যন্ত কম থাকে—যেমন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে পার্বত্য দেশে। জ্বলন্ত গৃহে মানুষ আটকা পড়ে গেলেও এই অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে। আমাদের শ্বাসনালী বা কণ্ঠনালীতে যদি কোন বাধা সৃষ্টি হয় তার ফলে বাতাস ফুসফুস পর্যন্ত অবাধে যেতে পারে না। অজ্ঞান অবস্থায় রোগীর জিভ নীচের দিকে ঝুলে পড়ে শ্বাসনালী অবরোধ করতে পারে। বমি বা অন্য জিনিস শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়েও শ্বাসকার্য ব্যাহত করতে পারে। ফুসফুসের নানারকম অসুখে, যেমন হাঁপানি, নিউমোনিয়া, pulmonary oedema ইত্যাদিতে শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক narcotic

ওষুধের প্রভাবে মস্তিষ্কের মধ্যে respiratory centre অবদমিত করার ফলে রোগীর শ্বাসকার্য ভালোভাবে চলতে পারে না—ফলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। অত্যধিক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এবং muscle relaxant-এর ব্যবহারেও শ্বাসকার্য ব্যাহত হয়। এগুলিকে সাধারণভাবে hypoxic hypoxia বলে। আবার কোন কারণে রোগী যদি রক্তাল্পতায় ভোগে তাহলে তাদের রক্তকণিকা এবং হিমোগ্লোবিন শরীরে কম থাকে—ফলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন শরীরে বাহিত হতে পারে না। একে anaemic hypoxia বলে। আবার অত্যধিক রক্তক্ষরণে অথবা অন্য কারণে যদি রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়, রোগীর যদি shock হয়, রক্ত-চাপ অত্যন্ত কমে যায় তখন অক্সিজেন জীবকোষ পর্যন্ত যেতে পারে না। একে বলে stagnant hypoxia। আবার এমনও হতে পারে যে সবই ঠিক আছে কিন্তু জীবকোষ বা tissue ঠিকমত অক্সিজেন নিতে পারছে না—যেমন cyanide বিষক্রিয়ায় এবং অত্যধিক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ব্যবহারে। এসব ক্ষেত্রেও দেহে অক্সিজেনের অভাব ঘটে—একে বলে histotoxic hypoxia।

আমাদের শরীর বেশীক্ষণ অক্সিজেনের অভাব সহ্য করতে পারে না, কেন না আমাদের শরীরে অক্সিজেন বেশী সঞ্চিত থাকতে পারে না। হঠাৎ শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বা হৃৎস্পন্দন থেমে গেলে—তিন মিনিটের মধ্যে কৃত্রিমভাবে যদি অক্সিজেন না দেওয়া হয় তাহলে রোগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। আর বাঁচানো গেলেও তার মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শরীরে অক্সিজেনের অভাব যদি ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে—যেমন পর্বতারোহণের সময়—তখন শরীরে নানারকম উপসর্গ দেখা যায়। রোগী প্রথমদিকে অত্যধিক কথা বলে—আবোল-তাবোল কথা বলে। মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়। শরীর ম্যাজম্যাজ করে। বমি বমি ভাব হয়—বমি হতেও পারে। মাথা ধরে। শরীরের মাংসপেশীতে শিথিলতা আসে, খিঁচুনিও হতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রথমদিকে বেশী হতে থাকে—পরে কমে যায়। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। বেশী অক্সিজেনের অভাবে নখের ডগা, জিভ ইত্যাদি নীল হতে থাকে। রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যায়। সবশেষে রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে—মস্তিষ্কে oedema হয়। হৃৎপিণ্ডও তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না—মৃত্যু হয়।

অক্সিজেনের অভাবে ফুসফুসেও oedema হতে পারে। Kidney failure হয়। রক্তে পটাশিয়াম অত্যন্ত বেড়ে যায়। শরীরে অম্লতা (metabolic

acidosis) বেড়ে যায়। লিভারের কাজও ব্যাহত হয়। রোগীর মানসিক বৈকল্য ঘটতে পারে। এমন কি অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং সাধারণভাবে শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটলেই অক্সিজেন দিয়ে তার চিকিৎসা করতে হবে। সব রকমের hypoxiaতেই অক্সিজেনের ব্যবহার অত্যন্ত দরকারী এবং অনেক সময়েই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রোগীকে বাঁচায়। একমাত্র histotoxic hypoxiaতে অক্সিজেন তেমন কোন কাজে লাগে না। যে কোন রোগীর cyanosis হলেই বুঝতে হবে রোগীর অক্সিজেনের অভাব ঘটছে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে অক্সিজেন দিতে হবে। এ সব ছাড়াও নানারকম ফুসফুসের অসুখে—নিউমোনিয়া, pulmonary oedema, atelectasis, pulmonary embolism ইত্যাদিতে, myocardial infarction-এ, shock-এ অক্সিজেনের ব্যবহার অপরিহার্য। মস্তিষ্কে বা বুকে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীর অনেক সময়েই অক্সিজেনের দরকার হয়। খুব বেশী জ্বর হলেও অক্সিজেন দেওয়া উচিত। অজ্ঞান করে শল্যচিকিৎসার পরে রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। অজ্ঞান করার সময়ও অক্সিজেন লাগে। পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে অধিক উচ্চতায় অক্সিজেন ব্যবহার করা উচিত। কারবন-মনোক্সাইড বিষক্রিয়ায় অক্সিজেন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

আধুনিককালে অক্সিজেন দেওয়ার পদ্ধতিও বিভিন্ন রকমের। এ সবের মধ্যে নাকে ক্যাথেটার দিয়ে, মুখে মাস্ক চাপা দিয়ে, অক্সিজেন tent ব্যবহার করে এবং অক্সিজেন apparatus দিয়ে অক্সিজেন প্রয়োগের পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। নাকের মধ্য দিয়ে একটি পলিথিন ক্যাথেটার nasophrarynx পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং এভাবে রোগী শ্বাসের সংগে অক্সিজেন নেয়। এটি বেশ সোজা পদ্ধতি এবং বহুল ব্যবহৃত। এর দ্বারা ৩০% থেকে ৪০% অক্সিজেন রোগীকে দেওয়া যেতে পারে। ছোট ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন tent-এর ব্যবহার হয়। এতে বাচ্চাটিকে পুরোটাই ঐ tentএ রাখা থাকে এবং tent-এ প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন দেওয়া থাকে। হাসপাতালে এবং অপারেশন থিয়েটারে Boyle apparatus দিয়ে ভালোভাবে অক্সিজেন দেওয়া যেতে পারে। তবে অনেকদিন ধরে এবং কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন দিতে হলে automatic ventilator-এর সাহায্য নেওয়া হয়।

অত্যধিক অক্সিজেন দেওয়ার ফলে সাধারণভাবে মানুষের শরীরে খুব একটা কুফল দেখা যায় না, তবে শতকরা ৭০ ভাগ বা তারও বেশী অক্সিজেন দীর্ঘ সময় দিলে অক্সিজেন জনিত বিষক্রিয়া হতে পারে। এতে বুকে ব্যথা হয়, মাথা ধরে, মাথা

ঝিমঝিম করে, নাক বন্ধ হয়ে যায়, চোখ লাল হয়, কানে অস্বস্তি হয়। কণ্ঠনালী এবং শ্বাসনালীতে প্রদাহ ঘটে। ফুসফুসও আক্রান্ত হয়। Tracheobronchitis, pulmonary congestion, এমনকি ফুসফুসে oedema পর্যন্ত হতে পারে। রোগী ভাল নিঃশ্বাস নিতে পারে না। হাতে পায়ে সাড় কমে যায়, ঝিনঝিন করে। মাংসপেশীতে ব্যথা হয়। রোগীর মানসিক পরিবর্তনও হতে পারে। Erythropoesis কমে যায়। সদ্যজাত শিশুকে ১০০% অক্সিজেন অনেকটা সময় ধরে দিলে retrolental fibroplasia হতে পারে। এ অসুখে চোখের lens-এর পেছনে রক্তক্ষরণ হয় এবং পরে সাদা পর্দার সৃষ্টি হয়। ফলে শিশুটি অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই সব শিশুকে অক্সিজেন দিতে হলে ঠিক যতক্ষণ লাগবে ততক্ষণই ১০০% অক্সিজেন দেওয়া উচিত—তার বেশী নয়। নতুবা শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ অক্সিজেন অনেকক্ষণ ধরে দেওয়া যেতে পারে।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যখন কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দিয়ে শ্বাসকার্য চালানো হয় তখন রোগী সাধারণতঃ অনেক সময় ধরে বেশী concentration-এ অক্সিজেন পায়। এদের বুকের X-ray করলে বুকের দুদিকেই patchy opacities দেখা যায়। সুতরাং এদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কেননা বেশী অক্সিজেন দিলেও এদের শরীরে অক্সিজেনের অভাব থেকে যেতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই oxygen therapy সুচিন্তিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এদের inspired oxygen tension এবং arterial oxygen tension বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা (monitor) করা উচিত।

অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় বেশীর ভাগ রোগীই ৩০% থেকে ৪০% অক্সিজেন পায়। অবশ্য রোগীর যদি hypoxia বা hypotension থাকে তবে এর থেকে বেশী পরিমাণে অক্সিজেন দেওয়া হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার অব্যবহিত পরে রোগীর সাধারণতঃ অল্প hypoxemia থাকে। সেজন্য অপারেশনের পরে immediate post-anaesthetic period-এ রোগীকে অন্ততঃ নাকে ক্যাথেটার দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া উচিত।

কলকারখানায় ব্যবহারের জন্য যে commercial অক্সিজেন পাওয়া যায় সেটিও প্রয়োজনে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজে সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা যায়। তবে oxygen therapyতে যে বিশেষ fire hazard আছে তা সর্বদাই মনে রাখা উচিত।

Hyperbaric অক্সিজেন

সাধারণভাবে বাতাস নিঃশ্বাসের সংগে নিলে ১০০ মি. লি. প্লাজমায় ০'৩ মি. লি. অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে। ১০০% অক্সিজেন দিয়ে শ্বাস নিলে এটি বেড়ে ২'১ মি. লি. হয়। আবার ২ atmospheric pressure-এ ১০০% অক্সিজেন নিলে ১০০ মি. লি. প্লাজমায় ৪'২ মি. লি. অক্সিজেন থাকে এবং ৩ atmospheric pressure-এ তা বেড়ে ৬'৫ মি. লি. পর্যন্ত হয়। সুতরাং hyperbaric অক্সিজেন রোগীকে দিলে বেশ কার্যকরীভাবে রোগীর cellular oxygenation হওয়া সম্ভব। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে এইভাবে রোগীকে অক্সিজেন দিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। অবশ্য মস্তিষ্কে এবং ফুসফুসে রক্তপ্রবাহের ক্ষেত্রে এইভাবে অক্সিজেন প্রয়োগে যথেষ্ট vascular resistance বেড়ে যায়।

সাধারণতঃ দুইভাবে রোগীকে hyperbaric অক্সিজেন দেওয়া যায়। একটি বড় pressure chamber-এর মধ্যে রোগী এবং তার medical attendant-দের রাখা হয়। এখানে শুধু রোগীকেই face mask বা endotracheal tube দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হয়। এইভাবে অক্সিজেন দেওয়ার সময় রোগীর প্রতি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার। এই পদ্ধতি heart operation বা organ (kidney) transplantation-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

অন্যভাবে, শুধু রোগীকেই একটি প্রেশার চেম্বারে রাখা হয়। এই প্রেশার চেম্বার অক্সিজেন বা বাতাস দিয়ে compression করা হয়, তবে অক্সিজেনের ব্যবহারই অধিক। অক্সিজেন ব্যবহার করলে রোগীর inspired অক্সিজেন concentration ভালোভাবে বেড়ে যায়। উপরন্তু রোগীর দেহও এই বেশী অক্সিজেন প্রেশারে থাকার জন্য কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কয়েকটি Infection-এ প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। এই one-man pressure chamber অপেক্ষাকৃত কম দামী, তবে এতে চিকিৎসকের পক্ষে সব সময় রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অসুবিধা থাকে। সাধারণতঃ ২ atmospheric pressure-এ অক্সিজেন দেওয়া হয়।

Hyperbaric অক্সিজেন প্রয়োগ কয়েকটি অসুখের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফলপ্রদ।

১। কার্বন-মনোক্সাইড বিষক্রিয়া।

২। Cardiac arrest-এর পর অথবা acute hypoxia-তে cerebral oedemaর চিকিৎসায়।

৩। গ্যাস গ্যাংগ্রীন অথবা যে কোন anaerobic organism infection-এ।

৪। Myocardial infarction-এর acute বা সংকটজনক অবস্থায়।

৫। রক্তক্ষরণজনিত shock-এ।

৬। Air embolism এবং decompression sickness-এ।

৭। Head injury অথবা সাংঘাতিক chest injury হলে।

এছাড়াও কয়েকটি chronic infection-এ, যেমন chronic osteomylitis, otitis media ইত্যাদিতে, সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যাওয়া রোগীর ক্ষেত্রে, কিছু কিছু cancer বা কর্কট রোগীর ক্ষেত্রে hyperbaric অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়।

Hyperbaric অক্সিজেন দেওয়ার জন্য কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। রোগী অস্বস্তি অনুভব করে, শরীরে ব্যথা হয়, কানে অস্বস্তি হয়, চোখ লাল হয়ে ওঠে, joint-এ ব্যথা হয়, বমিবমি ভাব হয়, হাত-পা ঝিমঝিম করে। নানাধরনের lung complicationও হতে পারে। Muscle twitching এবং খিঁচুনি বা convulsionও হতে পারে। এ সব oxygen toxicityর জন্য হয়।

Hyperbaric অক্সিজেনে স্বাভাবিক কারণেই fire hazard অত্যন্ত বেড়ে যায়। Hyperbaric প্রেশার চেম্বারে রোগী ছাড়াও যে সব লোক থাকে, তাদেরও decompression sickness, avascular bone necrosis এবং nitrogen narcosis হতে পারে। সুতরাং খুব সতর্কতার সংগে এই সব চেম্বারে কাজ করা উচিত। রোগীকেও একেবারে অনেক বেশী সময় রাখা উচিত নয়। সাধারণতঃ ২ থেকে ৩ ঘণ্টার বেশী রাখা হয় না।

রোগী অনেক সময় এই প্রেশার চেম্বারে খুব restless হয়ে পড়ে। সে সময় diazepam-এর মত tranquillizer ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

আকুপাংচার

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসা আকুপাংচার আধুনিক চিকিৎসক সমাজে বিশেষ-ভাবে সাড়া জাগাচ্ছে এবং বহুল পরিমাণে প্রচারিত হচ্ছে। যদিও আমাদের দেশে এই আকুপাংচার সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যাপক ধারণা নেই, তবুও সন্দেহ নেই যে এ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

আকুপাংচার পদ্ধতির আবিষ্কার বেশ মজার। যুদ্ধকালে সৈনিকের এক অংগে তীরবিদ্ধ হলে যে শারীরিক অসুখ সারে, প্রাচীন কালে তাই দেখেই এর উৎপত্তি। Acus মানে সূচ বা needle আর puncture মানে বিদ্ধ করা। সূচ বিদ্ধ করে চিকিৎসার নামই আকুপাংচার চিকিৎসা।

সাধারণভাবে বলা হয়, এই চৈনিক চিকিৎসাপদ্ধতি প্রায় ৪০০০ থেকে ৫০০০ বছরের পুরনো। একটি বা তার চেয়ে বেশী সরু সূচ শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিদ্ধ করে অনেক ধরনের অসুখ সারানো যায়, ব্যথা-বেদনা উপশম করা যায়, এমন কি আধুনিক কালে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজনে বিশিষ্ট অংগকে অনুভূতিহীন করাও হয়। এই আকুপাংচার চিকিৎসা সাফল্যের সংগে চীনদেশে নানারকমের অসুখ, যেমন হাঁপানি, রক্তচাপজনিত রোগ, অনিদ্রা, দাঁত ব্যথা, কোমরে ব্যথা, sciatica, অ্যাপেনডিসাইটিস ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। এর খরচও কত কম! চিকিৎসার জন্য বিশেষ কিছুই লাগে না, মাত্র কয়েকটি স্টেনলেস স্টিল-এর সূচ আর ত্বক পরিষ্কার করার জন্য কিছু তুলা, অ্যালকোহল আর টিংচার আয়োডিন থাকলেই যে কোন জায়গায় এই চিকিৎসা করা সম্ভব। এই চিকিৎসা নিরাপদও বটে। চিকিৎসাজনিত শারীরিক কুফল প্রায় নেই বললেই হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য আকুপাংচারের ব্যবহার কিন্তু বেশী দিনের নয়, সম্ভবতঃ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই শুরু। যদি সত্যিই অপারেশনের জায়গা আকুপাংচারের সাহায্যে অনুভূতিহীন করা যায় তা হবে আমাদের মত দেশে বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ। গ্রামে-গঞ্জে, ছোট ছোট হাসপাতালে অ্যানেস্থিসিয়ার আর কোন সমস্যাই থাকবে না, দামী দামী অ্যানেস্থিসিয়ার যন্ত্রপাতি, গ্যাস

সিলিণ্ডার ইত্যাদিও লাগবে না। অপারেশনের পরে অ্যানেস্থিসিয়াজনিত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াও রোগীকে সহ্য করতে হবে না।

আগেই বলা হয়েছে, আকুপাংচার এমন একটি প্রাচীন চৈনিক পদ্ধতি যেটি শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে সূচ বিদ্ধ করে চিকিৎসা করা হয়। প্রাচীন চীনা চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের শরীরের জীবনীশক্তি (vital force of life-energy—'chee'), বিভিন্ন প্রধান channel বা meridian (chingmai) দিয়ে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় সারা শরীরে। এই meridian শরীরের চামড়ার নীচে, এমন কি শরীরের আরও অভ্যন্তর দিয়ে মস্তিষ্ক, লিভার ইত্যাদি সমস্ত অংগের সংগে সংযোজিত হয়। এগুলি lung meridian, liver meridian, heart meridian, spleen meridian, kidney meridian ইত্যাদি নামে পরিচিত। এছাড়াও এই বিশিষ্ট meridian থেকে নানা দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত আছে, যেগুলি অন্য meridian-কে এবং শরীরের অন্য অংশের সংগে যুক্ত করে—এদের বলা হয় chingluo।

১২টি meridian শরীরের বাম অর্ধভাগে, আরও ১২টি শরীরের ডান অর্ধভাগে, ২টি শরীরের মধ্যভাগে—তার একটি সামনে আর একটি পিছনে—এই মোট ২৬টি meridian শরীরকে ঘিরে আছে।

আকুপাংচার পয়েণ্টগুলি সঠিকভাবে নিজস্ব জায়গায় এই meridian-এর উপরে চিহ্নিত করা হয়। এই পয়েণ্টগুলি ১০০০-এর উপরে, তবে এদের ২৫০ থেকে ৩০০টি পয়েণ্ট বিশেষ ভাবে এই চিকিৎসায় লাগে।

প্রাচীন চৈনিকরা আরও বিশ্বাস করতেন যে মানুষের শরীর ভালো রাখার জন্য 'chee'র স্বচ্ছন্দ গতিতে শরীরে প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন কারণে কোন ভাবে এই প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে শরীরের একদিকে যেমন chee-প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, অন্য দিকে তা পর্যাপ্ত কমে যাবে এবং শরীরের দুদিকে কোন সমতা থাকবে না। এই অসমতাই সমস্ত রোগের—ব্যথা-বেদনার কারণ। এখন কোনভাবে যদি chee-প্রবাহ ঠিক করা যায়, তবেই রোগ নিরাময় সম্ভব। আকুপাংচার পয়েণ্টে সূচ বিদ্ধ করে বার বার stimulate করলে chee-প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, এগুলিকে tonification point বলে। আর যেগুলি দিয়ে chee-প্রবাহ কমানো হয় তাদের sedation point বলে।

প্রাচীন চৈনিক প্রবক্তারা আরও বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অগ্নি, মাটি, ধাতু, জল আর কাঠ দিয়ে তৈরী। এর সব উপাদানই কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে।

তাছাড়াও তার মধ্যে আছে দুই বিপরীত শক্তি—positive ও negative বা yang ও yin। মানুষের মধ্যে এই দুই বিপরীতধর্মী শক্তি সাধারণতঃ সমভাবে থাকে। মানুষের solid organগুলি, যেমন liver, heart, kidney ইত্যাদিতে negative (yin) শক্তি আরোপিত আছে। আর hollow organগুলিতে, যেমন stomach, gall bladder ইত্যাদিতে positive (yang) শক্তি আছে। এই দুই শক্তির অসাম্যও রোগের কারণ। আকুপাংচার মোটামুটিভাবে যেমন chee-প্রবাহ অব্যাহত রাখে, তেমনই positive (yang) এবং negative (yin)-এর সমতা রক্ষা করে।

এই আকুপাংচার চিকিৎসাপদ্ধতি রোগ নিরাময়ের জন্য এবং অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য যথেষ্ট সাফল্যের সংগে ব্যবহৃত হচ্ছে চীনে এবং জাপানে। এ নিয়ে পৃথিবীতে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। নতুন নতুন অসুখে এর ব্যবহার হচ্ছে। আকুপাংচার অ্যানেস্থিসিয়ার ব্যবহার মাত্র ২০-২৫ বৎসরের ঘটনা, যদিও শল্যচিকিৎসার পরে ব্যথা কমানোর জন্য (post-operative pain relief)-এর ব্যবহার করা হোত অনেক আগে থেকেই। আকুপাংচার অ্যানেস্থিসিয়া কিন্তু সত্যিই বিস্ময়কর। এতে রোগীকে অজ্ঞানই করতে হয় না এবং কোন ওষুধও লাগে না। আকুপাংচার needle বা সূচ আগেকার দিনে হাড়, সোনা, রূপা, তামা বা লোহা দিয়ে তৈরী হত, কিন্তু আজকাল stainless steel-এর সূচ প্রচুর ব্যবহার করা হয়। এই সূচ আগে হাত দিয়ে movement করা হোত, কিন্তু এখন low voltage electricityর সাহায্য নেওয়া হয়।

আকুপাংচার কিভাবে ব্যথা-বেদনা উপশম করে তা এখনও নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি। তবে আকুপাংচার মোটের উপর large fibre pain inhibiting system—ascending এবং descending উভয় syestem-এর উপরই কাজ করে ব্যথার অনুভূতি কমায়। আগে থেকে রোগীকে বোঝালে, সহানুভূতি সমবেদনা জানালে, সাহস জোগালে, এমন কি সম্মোহন বা hypnosis করলে আকুপাংচারের কাজ ভাল ভাবে পাওয়া যায়। এমনও বলা হয়, আকুপাংচার সূচ ফোটানোর ফলে ত্বকের নীচের nerve plexus থেকে encephalin এবং endomorphan নামক দুটি জিনিস নির্গত হয় এবং এদের জন্যই ব্যথা-বেদনার উপশম হয়।

অবশ্য আকুপাংচার চিকিৎসাপদ্ধতি সত্যিই কতটা উপযোগী, কতটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এমনও বলা হয়, এটা

একটা প্রাচীন গ্রাম্য-চিকিৎসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর শতকরা ৯৫ ভাগই অবৈজ্ঞানিক; কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, বাকী ৫ ভাগই বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসক-সমাজ এখন এ নিয়ে যথেষ্ট ভাবতে শুরু করেছেন এবং আমাদের দেশেও এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ও গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। গুণগত মান বিচার করে এবং প্রয়োজনবোধে অ্যানেস্থিসিয়া এবং অন্য চিকিৎসায় এই আকুপাংচার পদ্ধতির প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অ্যানেস্থিসিয়ার যন্ত্রপাতি

অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য যে বিশেষ machineটি ব্যবহার করা হয়, তার নাম Boyle apparatus অথবা Boyle anaesthetic machine (চিত্র-১)। এই machineটিতে দুটি অক্সিজেন সিলিণ্ডার, দুটি নাইট্রাস অক্সাইড সিলিণ্ডার, একটি কারবন-ডাইঅক্সাইড এবং একটি সাইক্লোপ্রোপেন সিলিণ্ডার লাগানোর ব্যবস্থা আছে। এই সিলিণ্ডারগুলি সাধারণতঃ molybdenum steel দিয়ে তৈরী। এগুলি আপাত হাল্কা কিন্তু অত্যন্ত মজবুত, নতুবা ফেটে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় একটি অক্সিজেন সিলিণ্ডার এবং একটি নাইট্রাস অক্সাইড সিলিণ্ডার চালু বা খোলা থাকে এবং এদের একটি সিলিণ্ডার সবসময় ভর্তি থাকে। প্রথমটি শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র দ্বিতীয়টি খোলা হয় এবং শূন্য সিলিণ্ডারটি পরিবর্তন করা হয়। এই সিলিণ্ডারগুলি সহজে চেনার জন্য প্রত্যেক গ্যাসের জন্য বিশেষ বিশেষ রঙ করা থাকে যাতে কখনও ভুল না হয়। এই colour code সারা পৃথিবীতে একই রকমের। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের পুরোটা কালো রঙের এবং মাথার দিকে সাদা রঙের বর্ডার দেওয়া থাকে। নাইট্রাস অক্সাইড সিলিণ্ডারের রঙ নীল রঙের, কারবন-ডাইঅক্সাইড ধূসর রঙের এবং সাইক্লোপ্রোপেন কমলা রঙের সিলিণ্ডারে থাকে।

এই সিলিণ্ডারগুলি Boyle apparatus-এ yoke assemblyতে লাগানো থাকে। এই yoke-এ (চিত্র-২) দুটি পিন থাকে এবং সিলিণ্ডারের ভাল্‌ভে দুটি ছিদ্র থাকে। এর ফলে ঐ পিন দুটি ঠিক মত সিলিণ্ডারের ছিদ্রে আটকানো যায়। প্রত্যেক গ্যাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট pin code থাকে—দুইটি পিনের দূরত্ব নির্দিষ্ট। ফলে কোন গ্যাস সিলিণ্ডার ভুলক্রমে অন্য yoke-এ লাগানো সম্ভব নয়।

একটি নাইট্রাস অক্সাইড সিলিণ্ডারে ৭৫০ পাউণ্ড/ইঞ্চি^{২} চাপে নাইট্রাস অক্সাইড থাকে এবং সেই চাপে ঐ গ্যাস তরল অবস্থায় ঐ সিলিণ্ডারে থাকে। অক্সিজেন সিলিণ্ডারে অক্সিজেন থাকে প্রায় ২০০০ পাউণ্ড/ইঞ্চি^{২} চাপে এবং
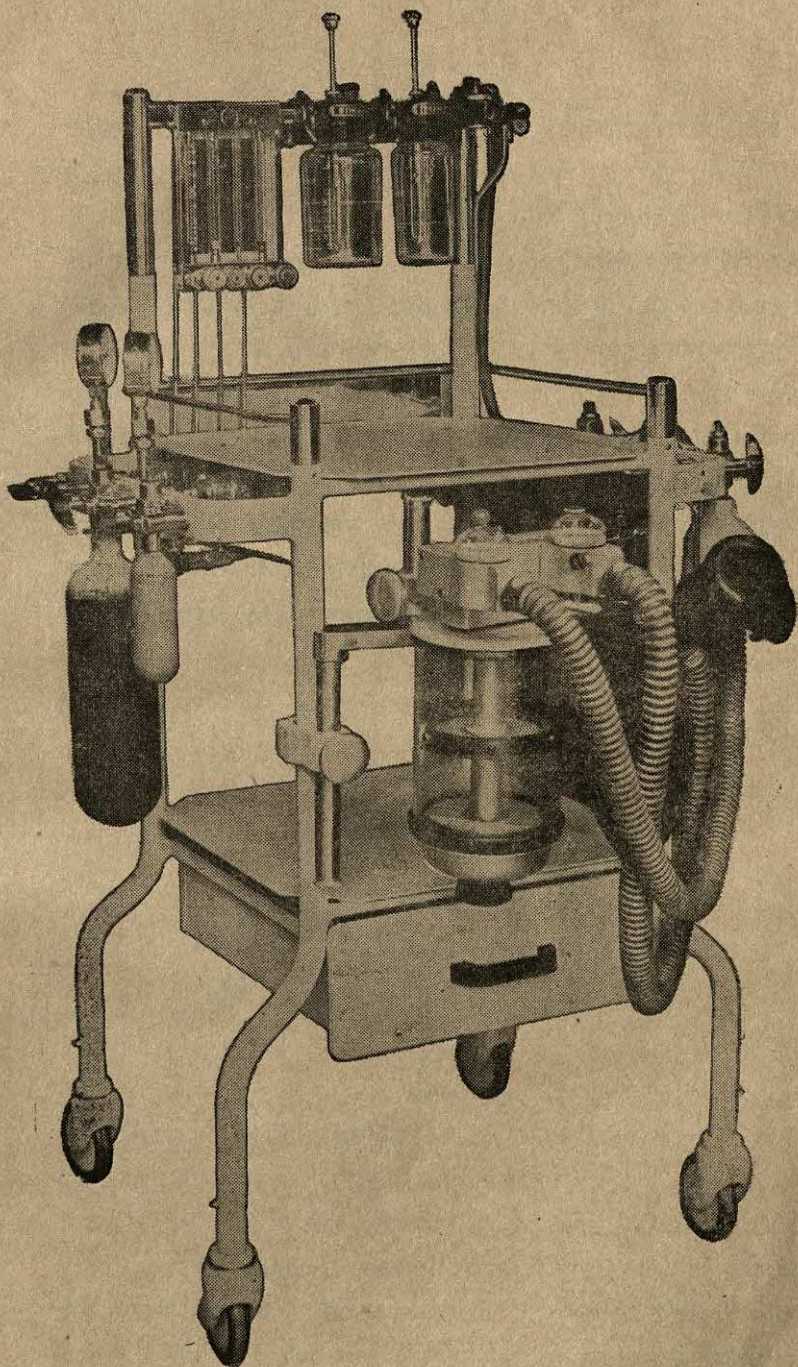
চিত্র ১ : Boyle Anaesthetic Machine
(ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)
পৃষ্ঠা : ২৪-২৫

অক্সিজেন গ্যাস অবস্থাতেই থাকে। সিলিণ্ডারে সাইক্লোপ্রোপেন তরল অবস্থায় থাকে এবং এর চাপ প্রায় ৭৫ পাউণ্ড/ইঞ্চি^{2}।

অক্সিজেন সিলিণ্ডারের সংগে থাকে একটি pressure gauge। এটি দিয়ে সিলিণ্ডারে কতটা অক্সিজেন আছে তা বোঝা যায়। নাইট্রাস অক্সাইড তরল অবস্থায় থাকার জন্য এর কোন pressure gauge থাকে না—এর দরকারও হয় না, কেননা এতে কতটা নাইট্রাস অক্সাইড সিলিণ্ডারে আছে তা প্রকাশ করে না। প্রত্যেকটি নাইট্রাস অক্সাইড সিলিণ্ডারের মাথার দিকে লেখা থাকে খালি অবস্থায় এর কত ওজন এবং ভর্তি অবস্থায় এর কত ওজন। সুতরাং ওজন করেই বোঝা যায়, ঐ সিলিণ্ডারে কতটা গ্যাস আছে। ঠিক মত বোঝার জন্য প্রত্যেক ভর্তি সিলিণ্ডারে লাল রঙের cellophene band লাগানো থাকে। যখন মেশিনে সিলিণ্ডার লাগানো হয় তখনই ঐ ব্যাণ্ড খুলে রাখা হয়। সাইক্লোপ্রোপেনও তরল অবস্থায় সিলিণ্ডারে থাকে বলে pressure gauge লাগে না।
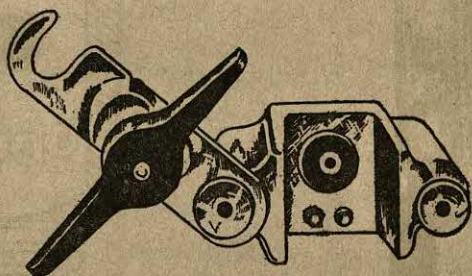
চিত্র-২
Yoke

অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড এত বেশী চাপে সিলিণ্ডারে থাকে যে তা থেকে যদি মেসিন মারফত রোগীকে দেওয়া যায় তা রোগী এমনকি মেশিনও সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং সিলিণ্ডার থেকে মেশিনে যাওয়ার আগে ঐ গ্যাসকে একটি reducing valve-এর মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে গ্যাসের চাপ অনেক কমে যায়। Boyle apparatus-এ সাধারণতঃ Adam's valve এবং অধুনা preset valve দেওয়া থাকে। এতে গ্যাসের চাপ সব সময়েই ১০ থেকে ১৫ পাউণ্ড/ইঞ্চি^{2} থাকে। সাধারণ ভাবে এই reducing valve প্রতিটি

গ্যাসের জন্য আলাদাভাবে তৈরী। একের জন্য তৈরী reducing ভাল্‌ভ অন্য গ্যাসের জন্য ব্যবহার করা যায় না। সাইক্লোপ্রোপেন এত কম চাপে থাকে যে তার জন্য কোন reducing valve লাগে না।

কোন সিলিণ্ডার যাতে ভুল করে অন্য yoke-এ লাগানো না হয় তার জন্য pin index safety system ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক yoke-এ (চিত্র-২) দুটি ছোট পিন এমনভাবে থাকে যাতে ঠিক মত সিলিণ্ডারের ভাল্‌ভের দুটি গর্তে (চিত্র-৩) ঠিকভাবে লাগানো যায়। একটি নির্দিষ্ট গ্যাসের জন্য pin index নির্দিষ্ট। যেমন position অনুযায়ী অক্সিজেন=২ : ৫ ; নাইট্রাস অক্সাইড= ৩ : ৫ ; সাইক্লোপ্রোপেন=৩ : ৬ ; কারবন-ডাইঅক্সাইড=১ : ৬ (চিত্র-৪) ; এই জন্য ভুল সিলিণ্ডার লাগানোর কোন সুযোগই থাকে না।
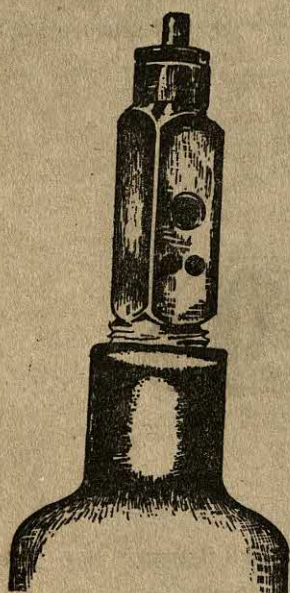
চিত্র-৩
সিলিণ্ডার ভাল্‌ভ
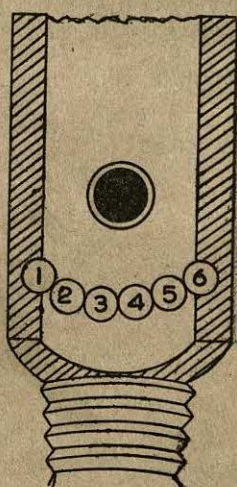
চিত্র-৪
Pin index system

অক্সিজেন ২ : ৫
নাইট্রাস অক্সাইড ৩ : ৫
সাইক্লোপ্রোপেন ৩ : ৬
কারবন-ডাইঅক্সাইড ১ : ৬

অক্সিজেন বা নাইট্রাস অক্সাইড reducing valve দিয়ে যাওয়ার পর সরু metal tube দিয়ে rotameter-এ যায়। এই রোটামিটারে ৪টি flowmeter থাকে—এগুলি অক্সিজেন, কারবন-ডাইঅক্সাইড, সাইক্লোপ্রোপেন আর নাইট্রাস

অক্সাইড গ্যাসের জন্য। Flowmeter-এর সাহায্যে ঠিক কতটা গ্যাস এক মিনিটে যাবে তা ঠিক করে দেওয়া হয়। এই flowmeterগুলি এক-একটি গ্যাসের জন্য আলাদাভাবে তৈরী। এটিও একে অন্যের জন্য ব্যবহার করা যায় না। এগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তৈরী। সব সময়ই ঠিকমত মাপ দেয়। এর মধ্যে মিলিলিটার বা লিটারের মাপ দেওয়া থাকে। প্রত্যেক flowmeter-এর জন্য আলাদা needle valve থাকে ; তা দিয়েই মাপমত গ্যাস কতটা যাবে তা ঠিক করা হয়।

Flowmeter একটি লম্বা টিউব, ওরই মধ্যে থাকে একটি bobbin। এই ববিন অত্যন্ত হাল্কা অ্যালুমিনিয়ামে তৈরী এবং খাঁজকাটা। ব্যবহারের সময় গ্যাসের চাপে এই ববিন ঐ টিউবের মধ্যে ঘুরতে থাকে। ঘোরা বেশ বোঝা যায়, কেননা একটি সাদা dot চিহ্ন ঐ ববিনে দেওয়া থাকে। ববিনের নীচের দিকটা সূচালো কিন্তু উপরের দিকটা সরল—উপরের দিকই reading দেয়। ববিন ঠিক মাঝখানে ঘোরে। টিউবের গায়ে লাগলে ঠিক মত গ্যাসের মাপ বোঝা যাবে না, উপরন্তু static electricity হতে পারে। অবশ্য ববিন সব সময়ই antistatic material দিয়ে তৈরী হয়।

Boyle apparatus-এ দুটি vaporizing বোতল থাকে, তার প্রথমটি ইথারের জন্য এবং অপরটি ট্রাইক্লোরোইথিলিনের জন্য। এই দুটিই volatile anaesthetic liquid। রোটামিটার থেকে গ্যাস প্রথমে ইথারের জন্য নির্দিষ্ট vaporizing বোতলে যায়। একটি knob-এর সাহায্যে এটি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে 'off' position থেকে উপরের দিকে তুলে 'on' করা হয়। কয়েকটি markingও এতে দেওয়া থাকে যাতে ইথারের মাত্রা কম-বেশী করা যায়। একটি U tube-এর মধ্য দিয়ে গ্যাস ঐ বোতলে যায়। উপরের দিকে একটি hood থাকে। একটি plunger দিয়ে ঐ hoodকে নীচে বা উপরে নেওয়া যায়। সাধারণভাবে কতটা গ্যাস যাচ্ছে, কতটা liquid surface area, কতটা তাপমাত্রা, কি ভাবে গ্যাসটি ঐ তরল ওষুধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারই উপর vapour concentration নির্ভর করে। ব্যবহারের সময় প্রায়ই ঐ বোতলের তাপমাত্রা কমে যায়, ফলে vapour concentrationও কমে যায়।

এই ইথার এবং ট্রাইক্লোরোইথিলিনের vaporizer ছাড়াও আলাদাভাবে হ্যালোথেনের জন্য vaporizer হয়। এর নাম Goldman halothane
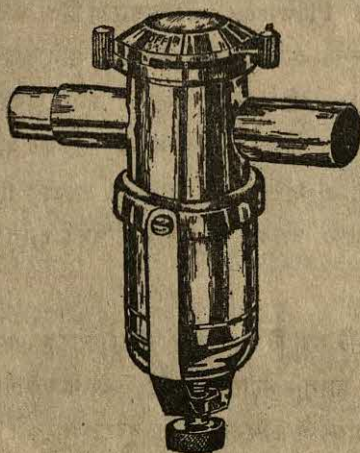
চিত্র-৫
Goldman Halothane Vaporizer
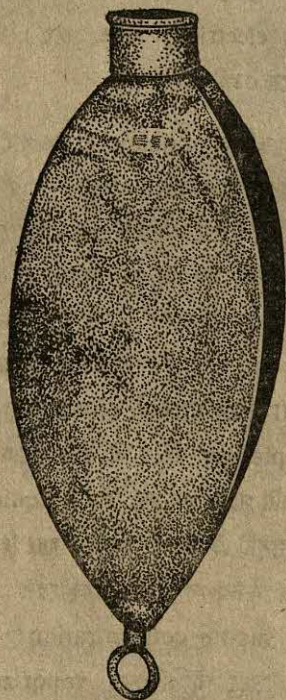
চিত্র-৬ : Rebreathing bag

vaporizer (চিত্র-৫)। এটি খুবই ব্যবহার করা হয়, তবে এতে কখনও শতকরা ৩ ভাগের বেশী vapour concentration হয় না।

এই সব vaporizer হয়ে অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস একটি রবারের তৈরী ব্যাগে আসে। এই ব্যাগকে rebreathing বা reservoir ব্যাগ বলে (চিত্র-৬)। এটিও
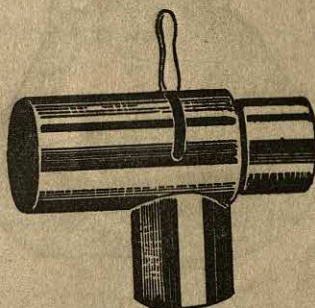
চিত্র-৭ : Bag mount

antistatic রবারে তৈরী। ব্যাগটি একটি মেটালে তৈরী bag mount-এ (চিত্র-৭) লাগানো থাকে। এই ব্যাগ বিভিন্ন সাইজের হয়—২ লিটার থেকে ৫ লিটার পর্যন্ত গ্যাস ধরতে পারে।
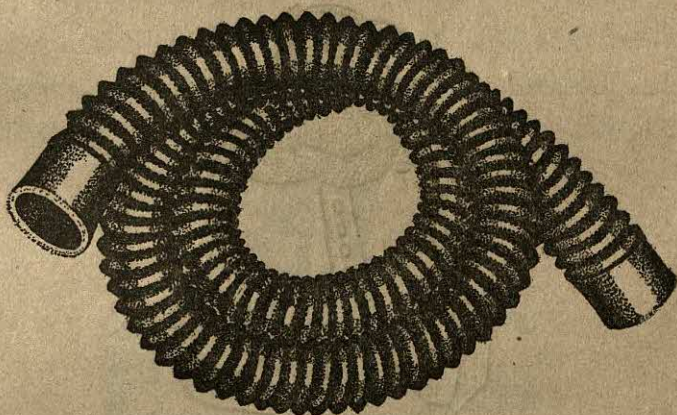
চিত্র-৮ : Corrugated rubber tube

তারপর অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস বা ভেপার একটি corrugated রবার টিউবের মধ্য দিয়ে যায় (চিত্র-৮)। এরই শেষদিকে থাকে expiratory valve। এই

ভাল্‌ভের মধ্যে একটি স্প্রিং থাকে। রোগীর expiration-এর খানিকটা গ্যাস এই ভাল্‌ভের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। যদি এই ভাল্‌ভ না থাকতো তাহলে সব exhaled গ্যাস rebreathing bagএ চলে আসতো এবং রোগী নিঃশ্বাসের
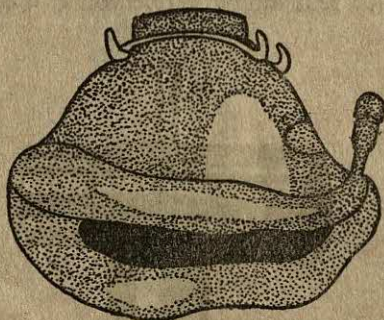
চিত্র-৯ : Face Mask

সংগে বেশী কারবন-ডাইঅক্সাইড নিতে বাধ্য হতো। এই ভাল্‌ভটি সাধারণতঃ খোলাই রাখা হয় এবং রোগীর কাছাকাছিই রাখা হয়, corrugated রবার টিউব এবং face mask-এর মধ্যে।

Face mask (চিত্র-৯) সাধারণতঃ রবারের তৈরী। এটিও antistatic হওয়া
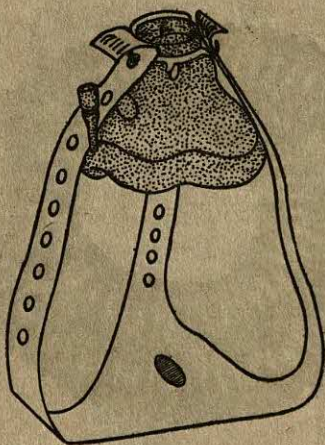
চিত্র-১০ : Ciausen's Harness

উচিত। এটি রোগীর মুখ ও নাকের উপর ঠিকমত চেপে রাখতে হয় যাতে রোগী ঠিকমত অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিতে পারে। Face mask নানা

মাপের হয়, বিভিন্ন বয়সের রোগীর জন্য। এর নীচের দিকে একটা airy cushion থাকে যাতে অত্যধিক চাপের ফলে রোগীর মুখের ত্বকে কোন ক্ষতি না হয়। Face mask একটি মেটালের তৈরী angle piece দিয়ে expiratory valve-এ লাগানো হয়।

Face mask ঠিকমত রোগীর মুখে রাখার জন্য Clausen's harness (চিত্র-১০) ব্যবহার করা হয়। এই হার্নেস একটি Y ধরনের রবারের স্ট্র্যাপ। এর

চিত্র-১১ : Connel's Harness

দুটি স্ট্র্যাপ রোগীর গালের পাশ দিয়ে যায় আর লম্বা স্ট্র্যাপটি মাথার উপর দিয়ে face mask-এ লাগানো হুকের মধ্যে লাগানো হয়। এছাড়া Connel's harnessও ব্যবহার করা হয়। এর দুদিকে দুটি রবারের loop বা ফাঁস থাকে (চিত্র-১১)।
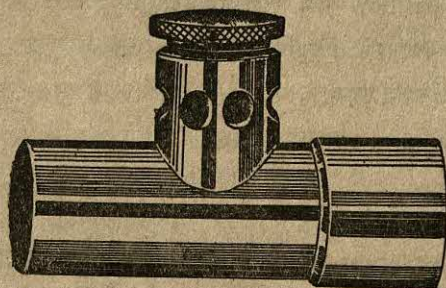
চিত্র-১২ : Expiratory Valve

Expiratory valve (চিত্র-১২) একটি spring loaded valve। এর মধ্যদিয়ে

breathing circuit-এর expired এবং অতিরিক্ত গ্যাস বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, তবে বাইরে থেকে বাতাস ভেতরে যেতে পারে না। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় এটি প্রায় খোলাই থাকে এবং এটি রোগীর যথাসম্ভব কাছে রাখা হয়।
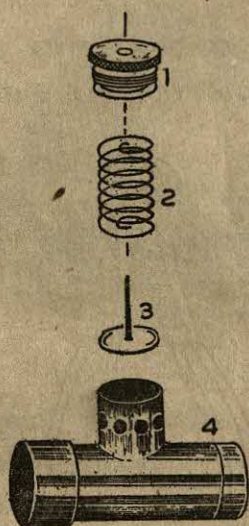
চিত্র-১৩: Heidbrink ভাল্‌ভের যন্ত্রাংশ

1 = ভাল্‌ভের ক্যাপ 2 = স্প্রিং
3 = ভাল্‌ভের পিন ও ডিস্ক 4 = ভাল্‌ভের বডি

Expiration-এর সময় এর খুব কম resistance থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি ঠিকমত কাজ না করলে বা gas flow কম দিলে rebreathing হতে পারে। Heidbrink valve এক ধরনের expiratory valve। এটি ব্যবহারের সময় ঠিক upright position-এ রাখা দরকার, নতুবা এটি আশানুরূপ কাজ দেয় না। ১৩নং চিত্রে এই ভাল্‌ভের যন্ত্রাংশ দেখানো হয়েছে।

Laryngoscope :

এটি প্রত্যক্ষভাবে larynx-এর vocal cord দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। Endotracheal intubation-এর সময় এটি একটি অপরিহার্য যন্ত্র। সাধারণভাবে এর তিনটি ভাগ আছে—handle, blade আর light। হ্যাণ্ডেলের মধ্যে দুটি dry cell ব্যাটারি (১.৫ ভোল্ট) দেওয়া থাকে। হ্যাণ্ডেল ও ব্লেড জোড়া

অবস্থায় থাকে। এটি ব্যবহারের সময় ব্লেডটি হ্যাণ্ডেলের সংগে সমকোণে আসে এবং দুয়ের জোড় মুখে সংযোগ ঘটার ফলে বাল্বটি জ্বলে ওঠে।

Magill laryngoscope-এর (চিত্র নং-১৪) ব্লেডটি সোজা এবং সরল। এটির ব্যবহারের সময় ব্লেড দিয়ে epiglottisটি ধরে তুলতে হয় এবং তবেই laryngeal opening ভালোভাবে দেখা যায়।
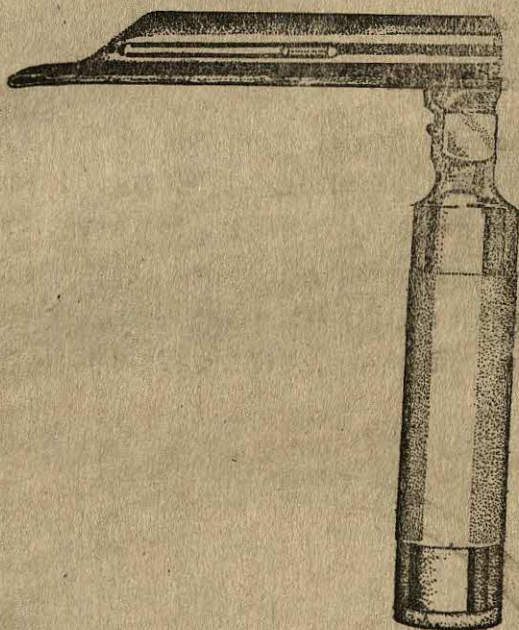
চিত্র-১৪ : Magill Laryngoscope

Macintosh laryngoscope-এর (চিত্র নং -১৫) ব্লেডটি বাঁকানো। এটি আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত। ব্লেডের concave দিকে জিভটি থাকে এবং এর শেষপ্রান্ত glossoepiglottic fold পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যাতে হ্যাণ্ডেল দিয়ে তোলার পর laryngeal opening ভালোভাবে দেখা যায়। ব্লেডগুলি সাধারণভাবে ছোট, মাঝারি এবং বড় সাইজের হয়—বিভিন্ন বয়সের রোগীর জন্য।

ব্যবহার করার আগে laryngoscope ঠিক জ্বলছে কিনা তা দেখা অবশ্য কর্তব্য। আলো খুব ভালো হওয়া দরকার। একটি ভালো দ্বিতীয় laryngoscope সব সময় রাখা উচিত। হঠাৎ প্রথমটি খারাপ হলে সেই বিশেষ সময়েই দ্বিতীয়টি ব্যবহার করা হয়।

Magill intubating forceps (চিত্র নং ১৬) ঃ

এটি একটি বাঁকানো ধরনের forceps যাতে দূর থেকে চোখের আড়াল না করে endotracheal tube ঠিক মত এই forceps দিয়ে ধরে laryngeal opening-এ দেওয়া যায়। এটি গলায় gauge দিয়ে pack করার সময়ও লাগে। Gauge দিয়ে মুখ পরিষ্কার করার সময়, কোন foreign body মুখ থেকে বের করার সময়ও এই forceps-এর দরকার হয়।

Endotracheal tubes ঃ

Endotracheal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় এই টিউব বা ক্যাথেটার দরকার হয়। এটি laryngeal opening দিয়ে ঢুকিয়ে larynx-এর মধ্যে দেওয়া হয়। আসলে এটি দিয়ে রোগীর কণ্ঠনালীকে কৃত্রিমভাবে বড় করা হয়। অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস এবং ভেপার এই টিউব দিয়েই রোগীর ফুসফুসে যায়। রোগীর নিঃশ্বাস নেওয়া ও ছাড়া দুইই এই টিউব দিয়ে যাতায়াত করে। এটি লাল রবার, পোর্টেক্স, প্লাস্টিক বা পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হয়।
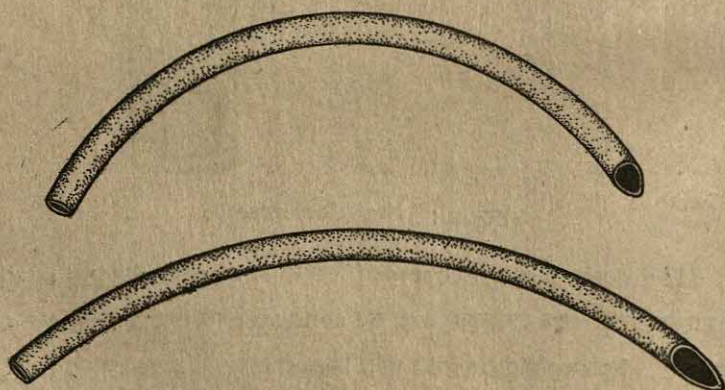
চিত্র-১৭ : Plain endotracheal tube
উপরে—oral নীচে—nasal

এই endotracheal টিউব একেবারে plain (চিত্র নং-১৭) হতে পারে আবার কয়েকটিতে cuff দেওয়া থাকে। cuff থাকার দরুন এটি larynxকে air-tight রাখে। বাইরে থেকে কোন secretion, বমি, বাতাস ইত্যাদি ঐ টিউব ছাড়া
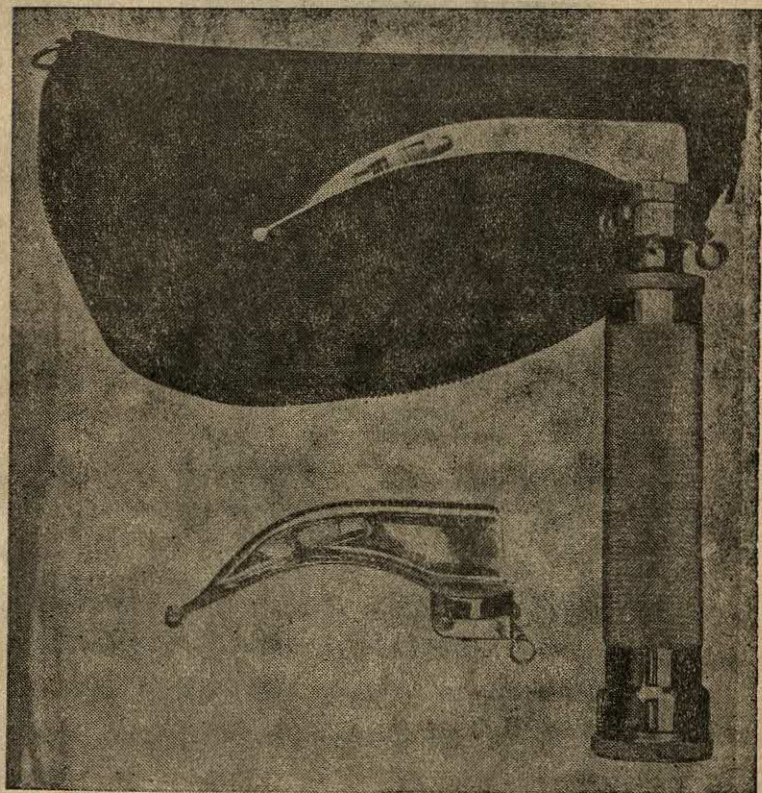
চিত্র ১৫ : Macintosh Laryngoscope
(ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)
পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫
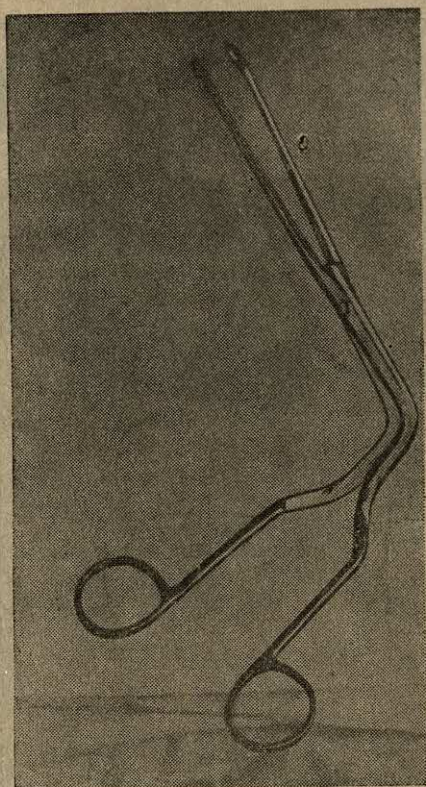
চিত্র ১৬ :   Magill intubating forceps

(ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

অন্য কোনভাবে যেতে পারে না। Cuffed endotracheal tube-এ (চিত্র নং-১৮) একটি পাইলট বেলুন থাকে—এটির মধ্য দিয়ে ৫ থেকে ৮ মি. লি. বাতাস সিরিঞ্জ দিয়ে দিলে cuffটি ফুলে যায়। মুখের বাইরে ঐ বেলুনটি থাকে। ঐটিতে বাতাস ভর্তি থাকলেই বোঝা যায় টিউবের cuff ঠিক আছে কি না।
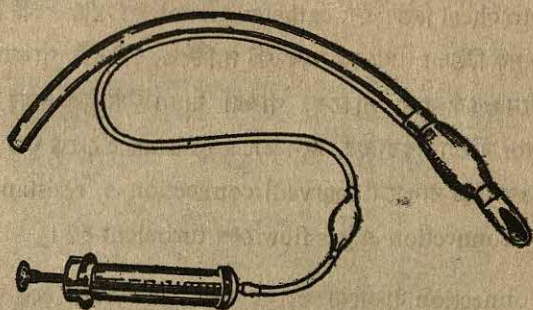
চিত্র-১৮ : Cuffed endotracheal tube

Endotracheal টিউব নানাভাবে দেওয়া যেতে পারে। মুখের মধ্য দিয়ে tracheaতে যে টিউব দেওয়া হয় তাকে বলে oral বা orotracheal টিউব। আবার নাকের মধ্য দিয়ে যে টিউব tracheaতে দেওয়া হয় তাকে বলে nasal বা nasotracheal টিউব। Oral টিউব তুলনামূলকভাবে ছোট, বেশী বাঁকানো বা half-curved হয়, এর bevelটিও ছোট হয়। অন্যদিকে nasal টিউব একটু বেশী লম্বা, এবং bevelটি বড় হয়। সাধারণভাবে nasal টিউব একটু সরু হয়।

সাধারণতঃ রোগীর কান থেকে নাক পর্যন্ত যে দূরত্ব তার দ্বিগুণ লম্বা হওয়া দরকার একটি endotracheal টিউবের। একটি প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে একটি ২৪ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা endotracheal টিউবই যথেষ্ট। Endotracheal টিউব নানান সাইজের হয়। প্রত্যেকের ভেতরের ব্যাস (diameter) এই endotracheal টিউবের গায়ে লেখা থাকে। বিভিন্ন সাইজের টিউব বিভিন্ন বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। Magill টিউব ০ থেকে ১১ নম্বর পর্যন্ত মোট ১২ সাইজের হয় এবং এদের ভেতরের ব্যাস বা diameter ৩ মি. মি. থেকে ৯ মি. মি. পর্যন্ত হয়।

এই সব টিউব ব্যবহারের পরে ভালোভাবে পরিষ্কার এবং বীজাণুমুক্ত করা উচিত। ব্যবহারের আগে ভালোভাবে টিউব পরীক্ষা করা উচিত। বেশী নরম

এবং বেশী শক্ত টিউব ব্যবহার করা উচিত নয়। টিউবের cuffও আগে থেকে ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করা উচিত।

Endotracheal connections :

এটি endotracheal টিউব এবং catheter mount-এর মধ্যে একটি মেটালের তৈরী বাঁকানো সরু টিউব। অনেক সময় এটি প্লাস্টিকেরও তৈরী পাওয়া যায়। এগুলি নানা ধরনের এবং নানা সাইজের পাওয়া যায়। অনেক সময় টিউবের সংগে connector ব্যবহার করা হয়, তবে তাতে resistance বেড়ে যায়। সরল connection-এর চেয়ে বাঁকানো (curved) connection-এ resistance বেশী হয়। বাঁকানো connection-এ gas flow বেশ turbulent হয়।

Magill connection বাঁকানো ধরনের হয়। এর একটি দিকে অল্প খাঁজ কাটা থাকে, endotracheal টিউব পরানোর জন্য। অপর দিকটি একটু মোটা, এখানেই catheter mount লাগানো হয়। এটি দু রকমের হয়—একটি nasal টিউবের জন্য, অপরটি oral টিউবের জন্য। Nasal connection (চিত্র নং-১৯) একটু বেশী বাঁকা আর oral connection (চিত্র নং-২০) অল্প বাঁকা এবং একটু বেশী লম্বা।
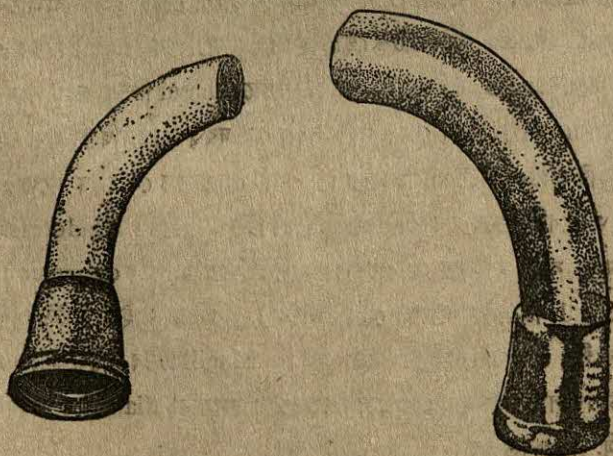
চিত্র-১৯ : Magill Nasal Connection

চিত্র-২০ : Magill Oral Connection
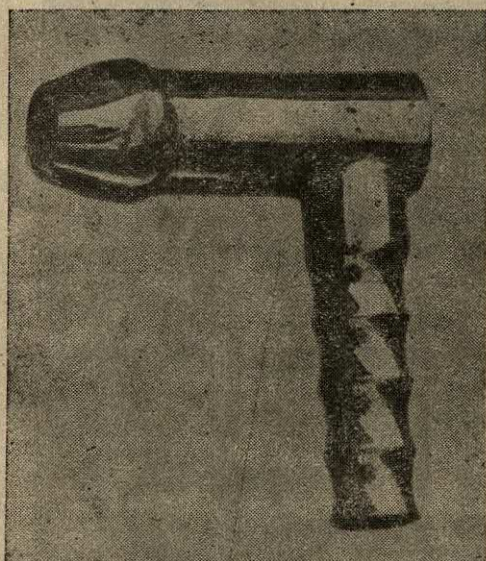
চিত্র ২১ : Rowbotham Connection
(ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭
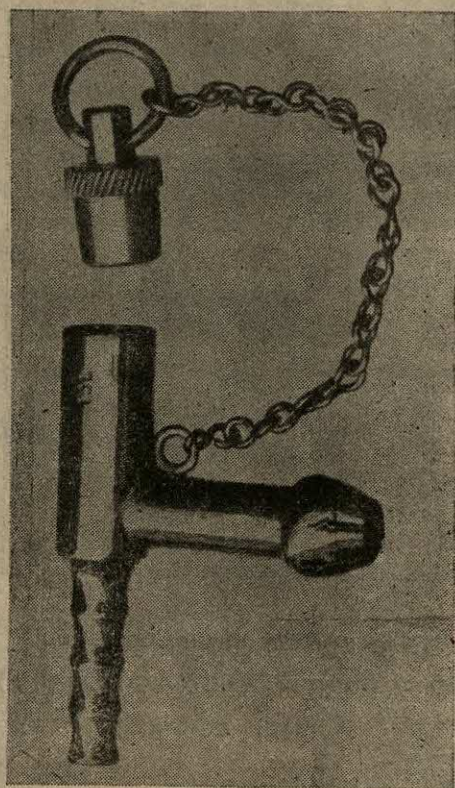
চিত্র ২২ ঃ Cobb Connection
(ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

Rowbotham connection (চিত্র নং-২১) সাধারণত: সমকোণী হয়। সরু হয়ে আসা খাঁজকাটা দিকটি endotracheal টিউবের সংগে যুক্ত হয় এবং অন্য দিকটি একটু মোটা—এটি catheter mount-এর সংগে লাগানো হয়। এই connection-এ বেশী resistance হয় এবং gas flow বেশী turbulent হয়।
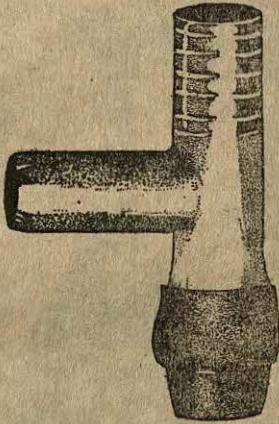
চিত্র-২৩ : Magill Suction Union
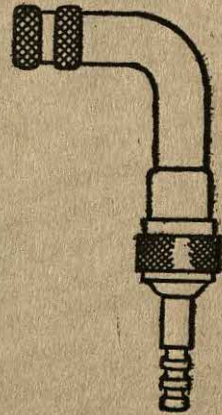
চিত্র-২৪ : Noseworthy Connection

Cobb connection (চিত্র নং-২২) বা suction union সরল সমকোণী টিউব। কিন্তু এতে right angled-এর দিকটি বেশী লম্বা করা থাকে। এতে মেটালের তৈরী ক্যাপ লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। সেই ক্যাপ দরকার মত খুলে suction করার জন্য ক্যাথেটার দেওয়া যায়। এই ধরনের Magill suction union-ও (চিত্র নং-২৩) ব্যবহার করা হয়। এর ক্যাপটি সাধারণতঃ রবারের তৈরী।

এছাড়াও Noseworthy connection পাওয়া যায়। এতে দুটি component থাকে আলাদা অবস্থায়। দরকার মত এক সংগে লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়। এর endotracheal adaptor-এর যে দিকটি endotracheal টিউবের সংগে লাগানো হয় সেটি নানান সাইজের হয়, কিন্তু এর অন্য দিকটি standard size-এর হয় যাতে standard অন্য component-এর সংগে ব্যবহার করা যায় (চিত্র নং-২৪)।

Catheter mount (চিত্র নং ২৫) ঃ

এটি expiratory valve এবং endotracheal connectionকে সংযোগ করে। এর expiratory valve-এর দিকটি মেটালে তৈরী এবং সংগের রবারের
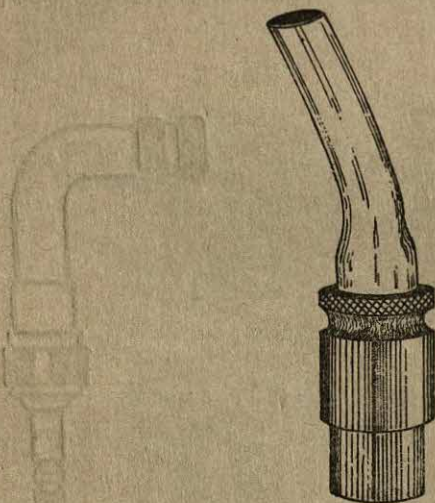
চিত্র-২৫ : Catheter mount

টিউব endotracheal connectionকে যুক্ত করে। এটিও standard সাইজের হয়।

Magill semi-closed circuit (চিত্র নং ২৬) ঃ

এই circuit-এ অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস এবং ভেপার rebreathing অথবা reservoir bag হয়ে corrugated রবারের টিউব দিয়ে অবশেষে রোগীর কাছে যায়। রোগীর expiration-এর সময় খানিক গ্যাস বাইরে atmosphere-এ বেরিয়ে আসে expiratory valve দিয়ে। অবশ্য খানিকটা গ্যাস rebreathing ব্যাগ পর্যন্ত যায়। এটিকেই Magill-এর নামে নামকরণ করে Magill semi-closed circuit বলে।

সাধারণ ভাবে semi-closed পদ্ধতিতে রোগীর কিছু rebreathing হয়। তবে ঠিক ভাবে পর্যাপ্ত কারবন ডাই-অক্সাইড বের করে দিতে হলে কয়েকটি দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। রোগী নিজে থেকে ভালোভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেবে।

Expiratory valve-এ যতটা সম্ভব কম resistance থাকবে। Total gas flow সব সময়েই রোগীর minute volume-এর সমান বা কিছু বেশী হবে।
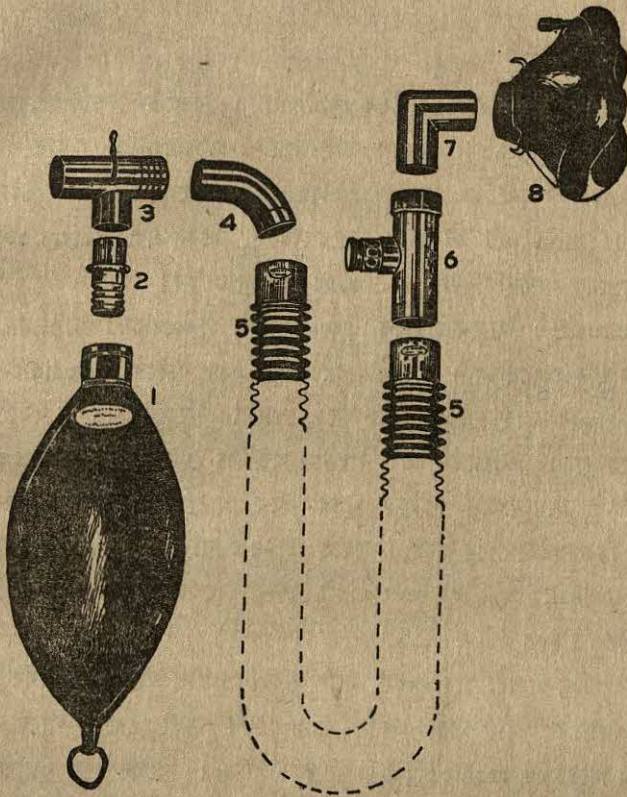
চিত্র-২৬ : Magill Semi-closed Circuit

1—rebreathing bag
2—bag mount adaptor
3—bag mount
4—adaptor plug in hose
5—corrugated tube
6—expiratory valve
7—face mask angle mount
8—face mask

এখনও পর্যন্ত পূর্ণবয়স্কদের অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার জন্য এই পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। এতে total gas flow খুব একটা বেশী দরকার

হয় না, উপরন্তু রোগীর rebreathingকেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

Closed circuit ঃ

এই circuit-এ আসলে রোগীকে rebreathing করতে দেওয়া হয়, তবে তার exhaled gas-এর কারবন ডাই-অক্সাইড absorption করার পর। John Snow ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির কথা বলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে Dennis Jackson এটি জীবজন্তুর উপরে পরীক্ষা করেন এবং Waters ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মানুষের অ্যানেস্থিসিয়ায় এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

এই circuit-এ অ্যানেস্থিসিয়ার এবং রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের গ্যাস মোটেই বাইরে বেরিয়ে আসে না। রোগীর expired gas বাইরে soda lime-এর সাহায্যে কারবন ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে, রোগীকে আবার তার শ্বাসকার্যের জন্য দেওয়া হয়। অক্সিজেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড যেটুকু দেহে ব্যবহৃত হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে সেটুকুই নতুন করে আবার দেওয়া হয়। অবশ্য কার্যকালে ঠিক কতটা দেহে ব্যবহার হয়েছে তা না জানার জন্য circuit-এ ইচ্ছা করে একটু leak রাখা হয় এবং একটু বেশীর দিকেই অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতিতে বার বার একই গ্যাস ব্যবহার করার জন্য খরচ অনেক কম পড়ে। শরীরের তাপ এবং জলীয় ভাগ বেশী বাইরে যেতে পারে না। অপারেশন থিয়েটারে exhaled gas-এ বায়ুদূষণ হয় না। বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম থাকে।

অবশ্য কিছু অসুবিধাও আছে। এই closed circuit অবশ্যই leak proof হওয়া দরকার। শরীরে সোডা লাইম থেকে বেশী তাপ এবং alkaline dust যেতে পারে। বিশেষ ধরনের ভারী যন্ত্রপাতি লাগে।

Closed circuit দু রকমের হতে পারে—Waters to-and-fro system এবং Circle system.

Waters to-and-fro system (চিত্র নং ২৭) ঃ

এই পদ্ধতিতে সোডা লাইম ভর্তি ক্যানিস্টারটি থাকে ঠিক rebreathing ব্যাগ এবং মুখের মাস্কের মাঝখানে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া এবং ছাড়া দুটোই এই

ক্যানিস্টারের মধ্য দিয়ে হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস এবং ভেপার Boyle apparatus থেকে সরু রবারের টিউব দিয়ে মুখের মাস্কের খুব কাছে দেওয়া হয়।

ক্যানিস্টারটি সাধারণতঃ লম্বায় ১৩ সে. মি. হয় এবং ব্যাস বা diameter হয় ৮ সে. মি.। এটি পূর্ণবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। শিশুদের জন্য অবশ্য ছোট সাইজেরও পাওয়া যায়। এটিতে ১ পাউণ্ড সোডা লাইম ধরে। সোডা লাইমের
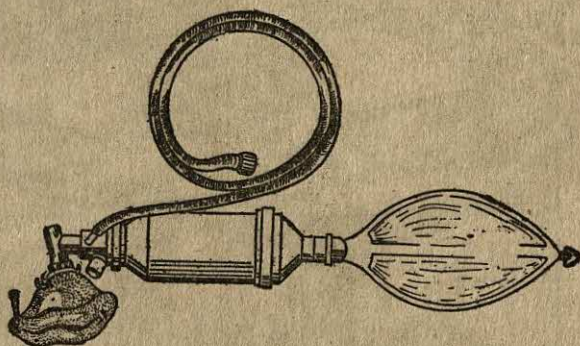
চিত্র-২৭ : Waters to-and-fro system

intergranular space সাধারণভাবে রোগীর tidal volume-এর সমান হওয়া উচিত। এর বেশী বা কম হলে কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ ভালোভাবে হয় না। ক্যানিস্টারটি যদি ঠিকমত ভর্তি করা না থাকে বা যদি আড়াআড়িভাবে রাখা হয় তবে অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস ক্যানিস্টারের মধ্যে উপর দিক দিয়ে যেতে থাকে এবং এতেও কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ ব্যাহত হয়।

Circle System ঃ

এই ব্যবস্থায় একটি বড় প্লাষ্টিকের সোডা লাইম ক্যানিস্টার থাকে। এতে মোটামুটি ১৮০০ গ্রাম সোডা লাইম ধরে। এটির ঠিক মাঝখানে ধাতুর তৈরী একটি baffle থাকে। এটি একদিকে ব্যবহার করার পর উল্টোদিকে লাগিয়ে আবার ব্যবহার করা যায়। এই ক্যানিস্টারে (চিত্র নং ২৮) একটি inlet এবং একটি outlet দ্বার থাকে ; দুটি একমুখী ভাল্‌ভ থাকে ; rebreathing ব্যাগের জন্য একটি ব্যাগ mount থাকে ; নূতন গ্যাস দেওয়ার জন্য একটি inlet থাকে এবং off/on নিয়ন্ত্রন করার ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়াও জরুরী অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং আলাদা একটি expiratory ভাল্‌ভও দেওয়া থাকে।
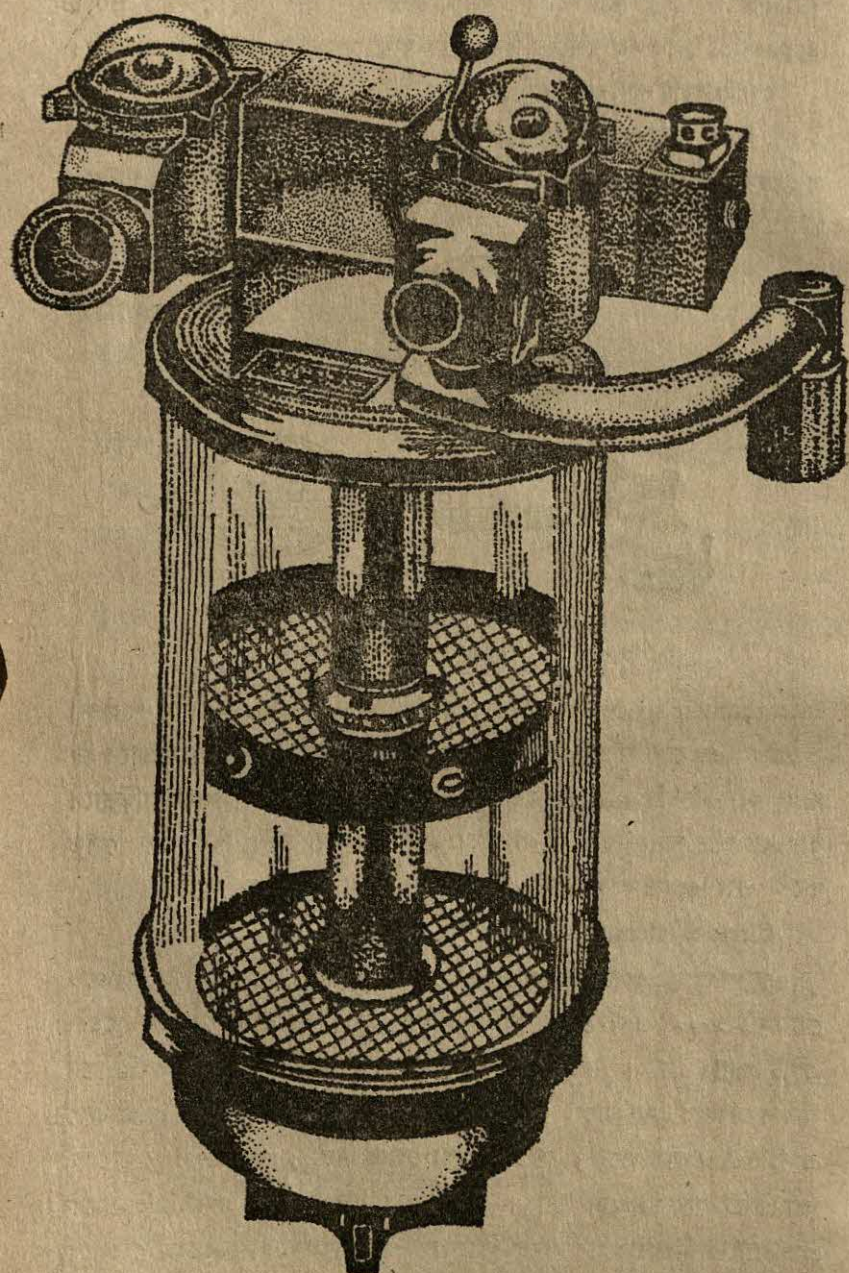
চিত্র-২৮ : Circle carbon-dioxide absorber

এই পদ্ধতিতে দুটি corrugated রবার টিউব ব্যবহার করা হয়—একটি inspiration-এর জন্য এবং অপরটি expiration-এর জন্য। এতে এমন দুটি ভাল্‌ভ ব্যবহার করা হয় যাতে গ্যাসপ্রবাহ একই দিকে বইতে পারে। রোগীর expired gas একটি টিউব দিয়ে সোডা লাইম ক্যানিস্টারে যায়—সেখানে কারবন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয়ে অন্য টিউব দিয়ে রোগীর inspiration-এ ফিরে আসে। এই inspiratory টিউব দিয়ে নতুন অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাসও নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেও fresh gas flow একটু বেশী দেওয়া হয় এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে circuit-এর expiratory valve-এ একটু leak রাখা হয়। মোটের উপর inspiratory এবং expiratory গ্যাস একটি গোলাকার বৃত্তের মধ্যেই বাহিত হয় এবং এরা কখনই এক সংগে মিশে যায় না।

সোডা লাইম (Soda lime) ঃ

ভালোভাবে কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ (absorption) করার জন্য soda lime-এর ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। সোডা লাইমে ৯৫% ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ৫% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে। এর মধ্যে একটু silicate দেওয়া থাকে, তা না হলে সোডা লাইম বেশী পাউডার হয়ে যায়। এতে শতকরা ১৪ থেকে ১৯ ভাগ আর্দ্রতা থাকাও আবশ্যক।

সোডা লাইমের granule-এর সাইজ ঠিকমত হওয়া দরকার (সাধারণভাবে ৪—৮ mesh) কেননা ভালোভাবে কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ ঐ granule-এর surface area-র উপরই নির্ভর করে।

Baralymeও কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। এতে শতকরা ৮০ ভাগ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ২০ ভাগ বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে। এতে সিলিকার দরকার হয় না। সোডা লাইমের চেয়ে এতে কম তাপ উৎপন্ন হয়। এতে ক্ষারও কম।

অনেক সময় সোডা লাইম গোলাপী বা pink রঙের হয় এবং ব্যবহারের শেষে যখন এর কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায় তখন সাদা রঙের হয়ে যায়। ১ গ্রাম সোডা লাইম প্রায় ৮৮ মি. লি. কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। এতে ক্যানিস্টারের মধ্যে প্রায় ৬০° সেলসিয়াস তাপ বাড়াতে পারে।

যখন এই কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তখন রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। যদি

হঠাৎ নাড়ী এবং রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং অপারেশনের জায়গা থেকে অত্যধিক রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে তখন সোডা লাইম নিঃশেষিত হয়ে গেছে বলেই সন্দেহ করতে হবে এবং তখনই নতুন করে সোডা লাইম ক্যানিস্টারে ভরে নেওয়া দরকার।

রোগীর expired gas যখন ক্যানিস্টারের সোডা লাইমের মধ্য দিয়ে যায় তখন তার কারবন ডাই-অক্সাইড সোডা লাইমের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংগে মিলিত হয়ে সোডিয়াম কার্বোনেট এবং জল উৎপাদন করে। এই বিক্রিয়ায় যে কিছু আর্দ্রতা (moisture) লাগে তা রোগীর expiration থেকেই আসে। এখানে কিছু তাপও উৎপন্ন হয়। সোডা লাইমের কার্যকারিতা শেষ হলে তার ওজন প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ বেড়ে যায়। কিছু কারবন ডাই-অক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংগে মিলিত হয়ে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং জল উৎপন্ন করে এবং এখানেও কিছু তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপকে heat of neutralisation বলা হয়। একটি ক্যানিস্টারে ব্যবহারের সময় ৬০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। ব্যবহারের সময় কেমিক্যাল প্রক্রিয়া এই ভাবেই সংঘটিত হয়ঃ

$$CO_2+2NaoH \rightarrow H_2O+Na_2CO_3+\text{তাপ}$$
$$Na_2CO_3+Ca(OH)_2 \rightarrow 2NaOH+CaCO_3$$
$$CO_2+Ca(OH)_2 \rightarrow H_2O+CaCO_3+\text{তাপ}$$
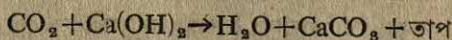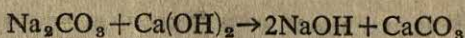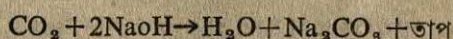
সোডা লাইমের কার্যকারিতা শেষ হওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম দিলে সোডা লাইম আবার কিছুটা কার্যক্ষম হয়। সেই জন্য অনেক সময় দুইটি ক্যানিস্টার ব্যবহার করা হয়—একটি ব্যবহার করার জন্য, অন্যটিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। এই regeneration নির্ভর করে সোডা লাইমের granule-এর pore-এর উপর। প্রথম দিকে বহির্ভাগে কারবন ডাই-অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংগে মিশে সোডিয়াম কার্বোনেট তৈরী করে। এটি খুব দ্রবণীয় হওয়ার জন্য ভিতরের দিকে চলে যায় এবং সেখানে অপেক্ষাকৃত অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরী করে। এরপর সেখানকার তৈরী সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বাইরের দিকে diffuse করে বহির্ভাগে আসে এবং এই ভাবে আবার তার কার্যকারিতা ফিরে পায়। এখনকার উন্নত ধরনের সোডা লাইমে এই ভাবে খুবই কম regeneration হয়। এই উন্নত সোডা লাইমে খুব কম সিলিকা থাকার
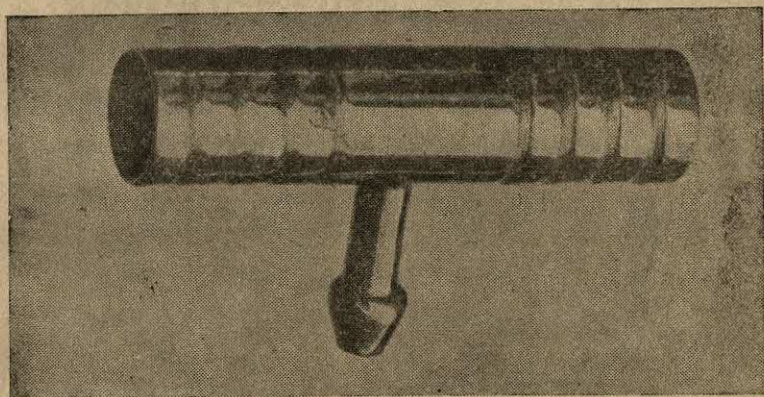
চিত্র ২৯ : Ayre's T-Piece

(ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫
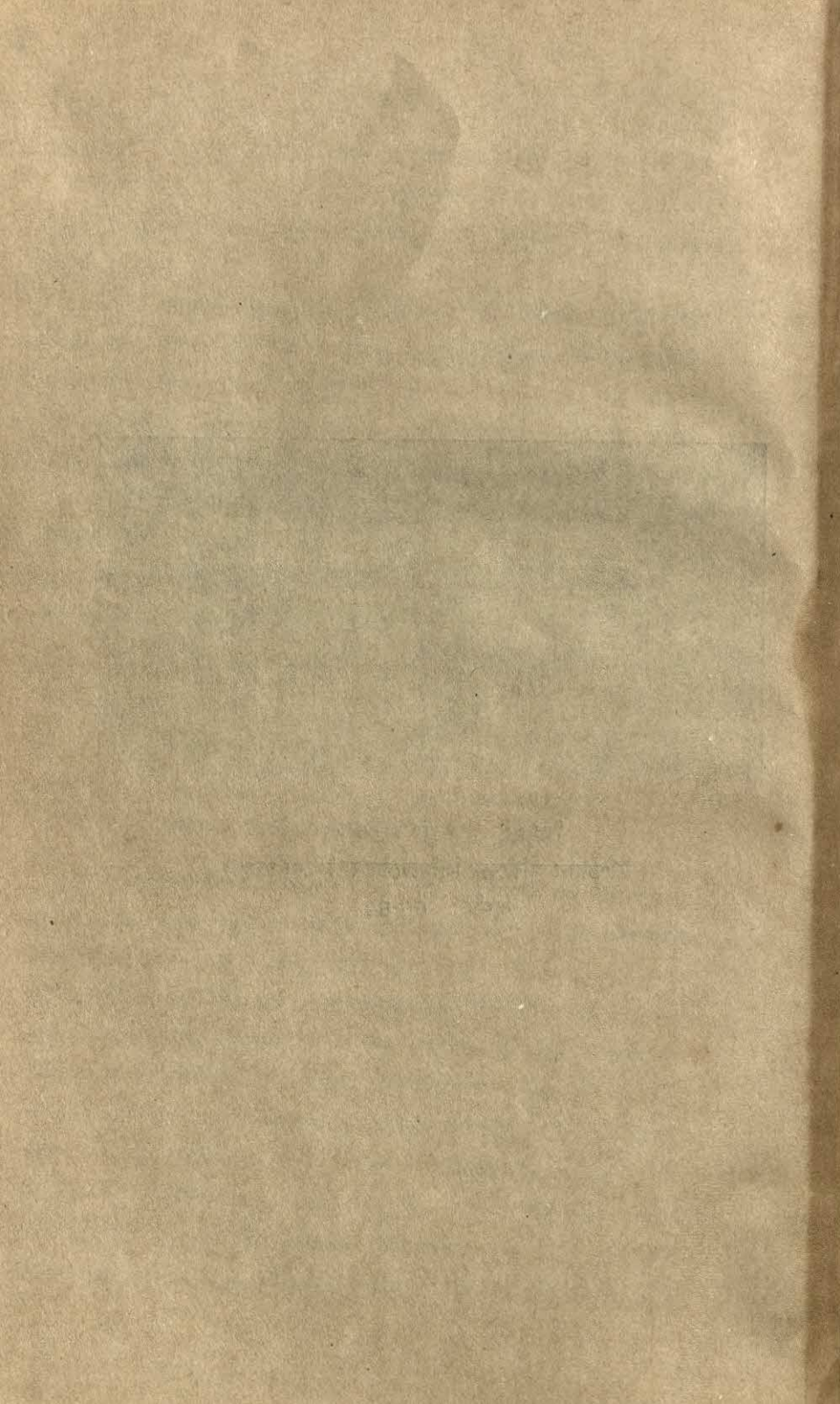
জন্য, ভালো uniform moisture থাকার জন্য এবং ১% পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকার জন্য regeneration প্রায় হয়ই না।

অ্যানেস্থিসিয়া সংক্রান্ত আরও কিছু দরকারী যন্ত্রপাতি

Ayre's T-piece (চিত্র নং ২৯) :

এটি ইংরেজি T-এর মত আকৃতিবিশিষ্ট টিউব। এর horizontal দিক দুটি একটু মোটা এবং লম্বা। এর একটি দিক endotracheal টিউবের-এর সংগে যুক্ত হয় এবং অন্য দিকটি একটি আলাদা ছোট রবার টিউবের সংগে যোগ করা হয়।
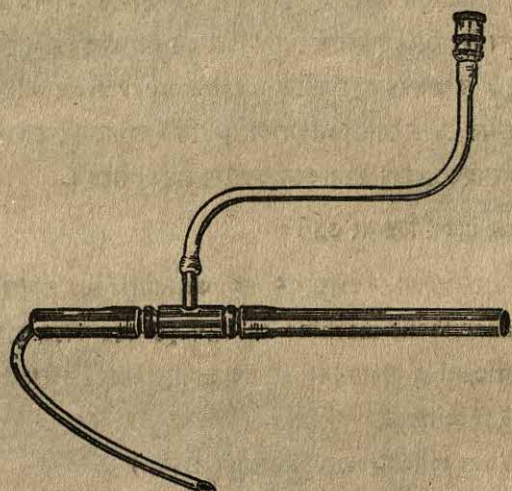
চিত্র-৩০ : Ayre's T-piece-এর ব্যবহার পদ্ধতি

এই ছোট টিউবটি reservoir হিসাবে কাজ করে এবং একটি মুখ একেবারে খোলা থাকে। T-piece-এর লম্বভাবে অবস্থিত (vertical) দিকটি দিয়ে fresh gas supply করা হয়। (চিত্র নং ৩০)

এটি নবজাতদের ক্ষেত্রে ও শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে অ্যানেস্থিসিয়া দিলে খুবই কম

respiratory resistance হয় এবং রোগীর rebreathing প্রায় হয়ই না। এই rebreathing যাতে না হয় তার জন্য রোগীর minute volume-এর অন্তত ২½ গুণ fresh gas volume দেওয়া উচিত। Reservoir টিউবটির volume কম করেও অন্তত রোগীর tidal volume-এর এক-তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত। এটি খুব বড় এবং বেশী volume-এর হলে rebreathing হতে পারে, আবার ছোট এবং কম volume-এর হলে circuit-এর মধ্যে বাতাস ঢুকে পড়ে fresh gasকে dilute করে দিতে পারে। আঙুল দিয়ে এই reservoir টিউবটি মাঝে মাঝে বন্ধ করে রোগীকে positive pressure-এ শ্বাসকার্য চালানো করা যায়।

আজকাল এই T-piece system-এর নানা ধরনের রূপান্তর হয়েছে। এটি এখন Y আকৃতিতে পাওয়া যায়। Jackson Ree এর reservoir টিউবটির শেষ দিকে একটি ছোট reservoir bag জুড়ে দেন। এর ফলে রোগীকে controlled বা assisted ventilation করার সুবিধে হয়। এই ব্যাগটি আবার rat tailed হয় এবং এর শেষ দিকটিতে ইচ্ছামত খোলা এবং বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকে।

পরে আরও রূপান্তর করে এতে expiratory valveও লাগানো হয়। আবার দরকার মত ছোট সোডা লাইম ক্যানিস্টারও লাগানো যেতে পারে যাতে কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ প্রয়োজনে করানো যেতে পারে।

Paediatric set (চিত্র নং ৩১) :

শিশুদের অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার জন্য এই paediatric set একান্ত দরকার। এটি Boyle anaesthetic machine-এর সংগে যুক্ত করে কাজে লাগানো হয়। একটি paediatric set-এ সাধারণতঃ এই সব যন্ত্রপাতি একত্রিত থাকে :

১। ছোট face mask
২। ছোট rat tailed reservoir ব্যাগ (১ লি.)
৩। face mask-এর adaptor
৪। modified Ayre's T-piece
৫। reservoir ব্যাগের adaptor
৬। ছোট corrugated রবার টিউব
৭। Boyle machine থেকে fresh gas দেওয়ার জন্য ছোট টিউব এবং তার adaptor
৮। ছোট soda lime canister
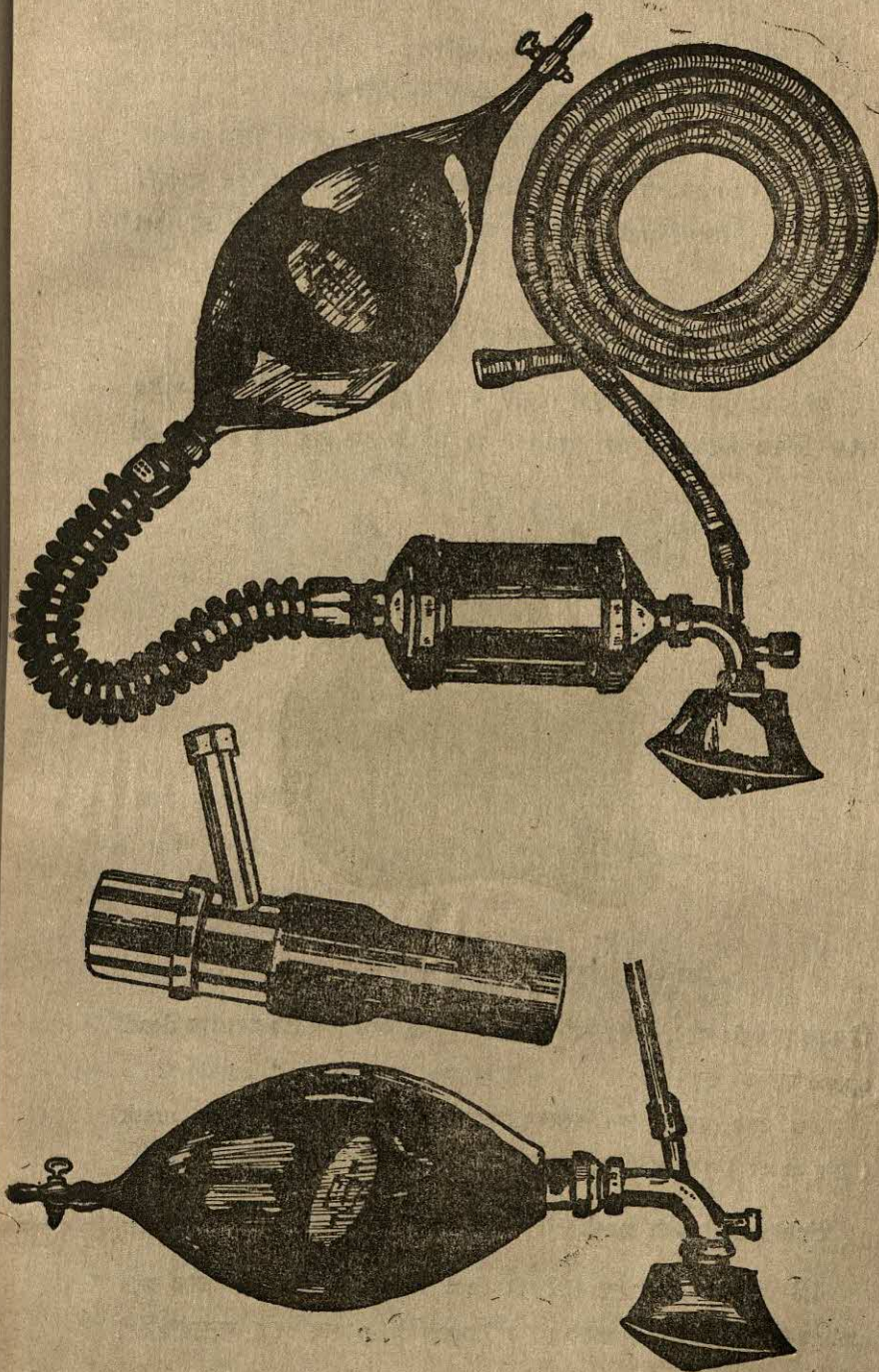
চিত্র-৩১ : Paediatric Set

৯। endotracheal tubes—বিভিন্ন সাইজের

১০। endotracheal connections—বিভিন্ন সাইজের

এই set দিয়ে semi-open পদ্ধতিতে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যায়। আবার প্রয়োজনবোধে to-and-fro carbon di-oxide absorption পদ্ধতিও ব্যবহার করা যায়। শিশুদের endotracheal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার জন্য এই set অপরিহার্য।

Paediatric face mask (চিত্র নং ৩২) ঃ

এই face maskগুলি খুবই ছোট মাপের হয়। এটি ০ থেকে ৩ সাইজ পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের পাওয়া যায়। সব সময়ই লক্ষ রাখা উচিত যাতে এটি
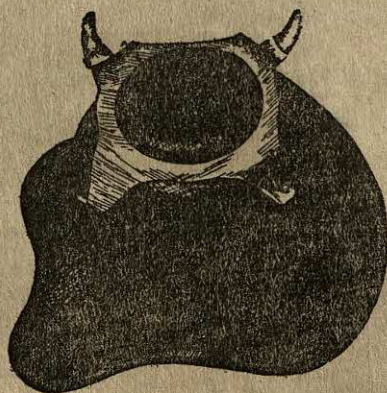
চিত্র-৩২ : শিশুদের (Paediatric) face mask

ঠিকমত মুখে fit করে, মুখের ত্বকে কোন ক্ষতি না করে এবং এর মধ্যকার dead space যত কম হয়।

এক বছর বয়সের কম শিশুদের ক্ষেত্রে Rendell-Baker Soucek mask (চিত্র নং ৩২) খুবই প্রচলিত, কেননা এর dead space অত্যন্ত কম।

Schimmelbusch mask (চিত্র নং ৩৩) ঃ

এটি একটি তারের ফ্রেমে তৈরী face mask। এই ফ্রেমে কয়েক স্তরে gauge অথবা lint দেওয়া থাকে। এটি open drop পদ্ধতিতে অ্যানেস্থিসিয়া

দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইথার, ক্লোরোফর্ম, ইথাইল ক্লোরাইড, এমন কি হ্যালোথেন দিয়েও এই পদ্ধতিতে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যায়।

একটি বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা তরল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এই gauge বা lint-এর উপর ফেলা হয়। মাস্কের মধ্যে anaesthetic vapour তৈরী হয় এবং রোগী নিঃশ্বাসের সঙ্গে তা নিতে থাকে। শ্বাসনালী যাতে বাধামুক্ত থাকে তার জন্য অনেক সময় pharyngeal airway দেওয়ার দরকার হয়।
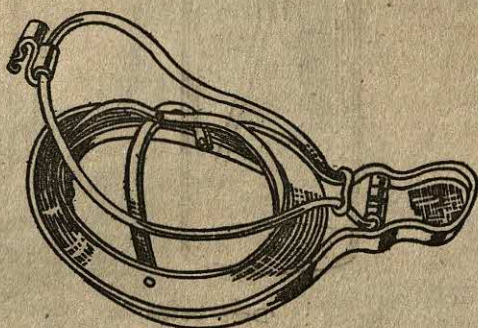
চিত্র-৩৩ : Schimmelbusch Mask

এই মাস্ক কয়েকটি বিভিন্ন সাইজে পাওয়া যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে সব থেকে ছোট মাপের মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। Schimmelbusch মাস্ক রোগীর মুখের উপর রাখার আগে একটি 'gamgee' pad ব্যবহার করা হয়। এটি একটি চৌকো গজ এবং তুলো দিয়ে তৈরি প্যাড, মাঝখানে কাটা থাকে—রোগীর নাক এবং মুখ খুলে রাখার জন্য। এটি ব্যবহারের ফলে রোগীর চোখ ঢাকা থাকে—অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের ভেপার চোখ নষ্ট করতে পারে না। তাছাড়া মাস্ক এবং মুখের মাঝে airtight seal-এর কাজ করে।

'Drop' bottle (চিত্র নং ৩৪) :

এটি একটি ছোট বোতল—এর মধ্যে তরল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ থাকে। এর মুখে একটি ছিপি থাকে, তাতে দুটি মেটালের তৈরী টিউব ঢোকানো থাকে। এই টিউব দুটির একটি বড় এবং অন্যটি ছোট। ফলে বোতলটি উপুড় করলে—ছোট

টিউব দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা তরল ওষুধ পড়তে থাকে। অন্য টিউব দিয়ে বাইরে থেকে হাওয়া বোতলের মধ্যে গিয়ে পরিত্যক্ত তরল ওষুধের স্থান পূরণ করে।
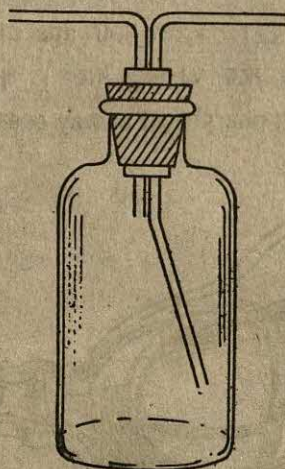
চিত্র-৩৪ : 'Drop' bottle

Ambu Resuscitator (চিত্র নং ৩৫) ঃ

এটি এমন একটি ব্যাগ যেটি আপনা থেকেই সব সময় বাতাসে ফুলে থাকে। এর একদিকে বাতাস যাওয়ার জন্য একটি inlet valve থাকে, অন্য দিকে একটি মুখের
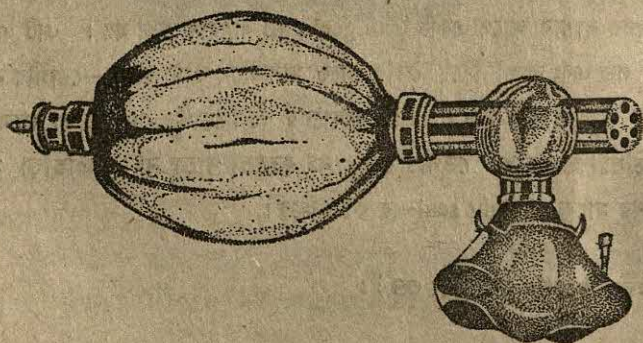
চিত্র-৩৫ : Ambu Resuscitator

মাস্ক এবং Ruben valve থাকে। Ruben non-rebreathing valve (ছবি নং ৩৬)-এর বিশেষত্ব এই যে এটি শ্বাস নেওয়ার সময় বাতাস ব্যাগ থেকে রোগীর

দিকে যায় কিন্তু শ্বাস ছাড়ার সময় এই ভাল্‌ভ দিয়ে বাতাস একেবারে বাইরে বেরিয়ে যায়। এর ফলে রোগীর rebreathing হওয়ার কোন আশংকা থাকে
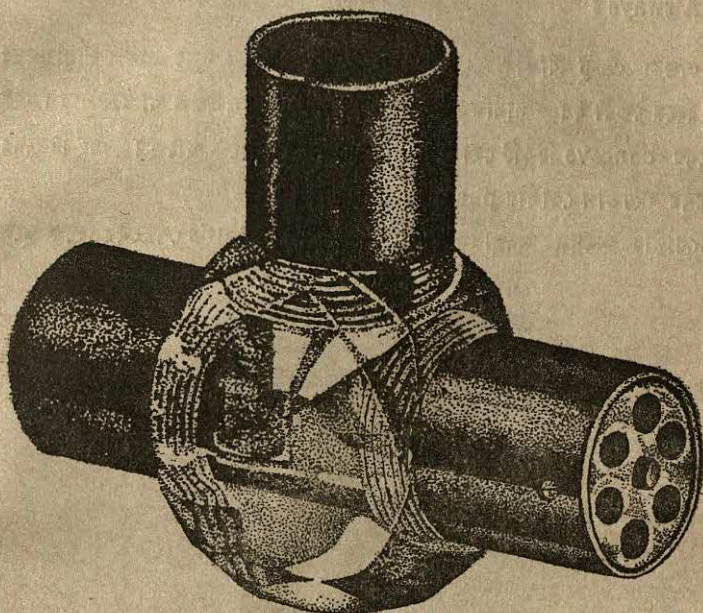
চিত্র-৩৬ : Ruben non-rebreathing valve

না। এটি সাধারণতঃ হাল্কা এবং বেশ স্বচ্ছ হয়। এর একটি দিক রোগীর দিকে থাকে, অন্যটি gas supply-এর দিকে থাকে।

Ambu ব্যাগ ব্যবহারের সময় যখন ব্যাগটি squeeze করা হয় তখন এর মধ্যকার বাতাস Ruben valve হয়ে মুখের মাস্ক দিয়ে গিয়ে রোগীর ফুসফুসে প্রসারণ ঘটায়। রোগীর শ্বাস ছাড়ার সময় expired বাতাস Ruben valve দিয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে যায়। ইতিমধ্যে নতুন বাতাস inlet valve দিয়ে গিয়ে self-inflating ব্যাগে ভরে যায়।

Ambu ব্যাগের সাহায্যে সাধারণ বাতাস দিয়ে রোগীর কৃত্রিম ভাবে শ্বাস-কার্য চালানো যায়। অবশ্য এতে একটি আলাদা অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থাও সেক্ষেত্রে রোগীকে বেশী অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বাতাস দেওয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক ভাবে রোগীকে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানোর জন্য এই Ambu Resuscitator-এর ব্যাপক ব্যবহার হয়।

Airways :

এগুলি একটু বাঁকা ধরনের বিশেষ টিউব। অনেক সময় এগুলি সাধারণতঃ ধাতু দিয়ে তৈরী হয়—আবার লাল রবার, প্লাস্টিক ইত্যাদিরও পাওয়া যায়। এই টিউবের concave দিকটি রোগীর জিভের সামনের দিকে থাকে। এই টিউবের সামনের অগ্রভাগ রোগীর pharynx পর্যন্ত যায়।

রোগীর অজ্ঞান অবস্থায় তার জিভ এবং epiglottis পেছনের দিকে ঝুলে

চিত্র-৩৭ : Philips Airway

পড়ে এবং তার ফলে রোগীর শ্বাসনালীতে শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় রোগীর ঠিকমত যত্ন না নিলে শ্বাস বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত
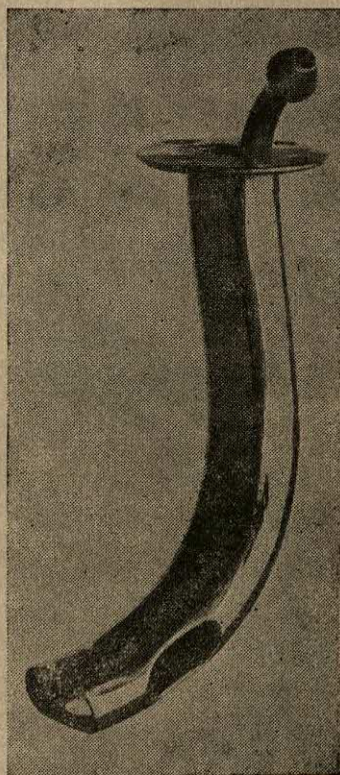
চিত্র ৩৮ : Waters airway tube
(ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের সৌজন্যে প্রাপ্ত)
পৃষ্ঠা : ৫২-৫৩

ঘটতে পারে। এই সময় ঠিকভাবে একটি airway টিউব রোগীর মুখে পরিয়ে দিলে অনেক সময়েই রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগী যখন অর্ধ-অচেতন থাকে তখনও রোগীর airway টিউবের দরকার হয়। এই টিউব কখনই ডাক্তার বা নার্স রোগীর মুখ থেকে খুলে দেয় না। রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে নিজে থেকেই রোগী এটি বাইরে বের করে দেয়।

সাধারণভাবে দুই রকমের airway টিউব হয়। একটি মুখ দিয়ে পরানো হয়—তার নাম oropharyngeal airway। অপরটি নাক দিয়ে পরানো হয়—এর নাম nasopharyngeal airway।

চিত্র-৩৯ : Guedel Airway

Oropharyngeal airwayর মধ্যে Philip airway (চিত্র নং ৩৭) খুব বেশী ব্যবহার হয়। এটি রবারের তৈরী এবং এতে একটি metal mount দেওয়া থাকে, যাতে রোগী অজ্ঞান অবস্থাতে কামড়ালেও টিউব বন্ধ হয় না। Waters airway (চিত্র নং ৩৮) পুরোটাই metal-এর তৈরী। Pharyngeal end-এর দুদিকে দুটি গর্ত করা থাকে। অন্যদিকে—ডান বা বামদিকে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। Guedel airway সাধারণভাবে পুরোটাই রবারের তৈরী (চিত্র নং ৩৯)।

Airway টিউব পরানোর একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। রোগীর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রোগীর মুখটি খুলে airway টিউবটি মুখের মধ্যে দিতে হবে— টিউবের concavity ঠিক তালুর দিকে রেখে। টিউবের শেষ দিকটি uvula পর্যন্ত গেলে ১৮০° ঘুরিয়ে ঠিক position-এ আনতে হবে এবং তখন টিউবের concavity জিভের সামনে থাকবে। অবশ্য আগে থেকে laryngoscope বা tongue depressor ব্যবহার করলে airway টিউবের concavity জিভের দিকে রেখেই তা পরানো যেতে পারে।

যখন oropharyngeal airway টিউব দিয়ে ভালো কাজ হয় না বা রোগীর মুখ খোলা যায় না তখন সেক্ষেত্রে nasopharyngeal airway টিউব ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগী এই airway টিউব ভালোভাবে সহ্য করতে পারে। এই টিউব নাক দিয়ে পরানো হয় এবং epiglottis-এর উপরে এবং জিভের base পর্যন্ত যায়। একটি nasopharyngeal টিউবের মাপ সাধারণতঃ সেই রোগীর নাকের অগ্রভাগ থেকে কানের দূরত্বের মাপের সমান হয়।

Polymask (চিত্র নং ৪০) ঃ

এটির সাহায্যে ওয়ার্ডে সাধারণভাবে অক্সিজেন দেওয়া যায়। এটি poly-

চিত্র-৪০ : Polymask

thene-এর তৈরী। এটির মধ্যে দুইটি communicating compartment থাকে। একটি শ্বাস নেওয়ার জন্য এবং অন্যটি শ্বাস বের করে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত

হয়। মিনিটে ৮ লিটার হিসাবে অক্সিজেন দিলে রোগীর alveolar concentration ৫০% থেকে ৬০% পর্যন্ত হতে পারে। অবশ্য এই polymask-এ dead space অত্যন্ত বেশী এবং এর ফলে রোগীর শরীরে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য ঘটতে পারে।

Stylet (চিত্র নং ৪১ ক এবং ৪১ খ) ঃ

এটি একটি সরু মেটালের তৈরী লম্বা তার। এটি দরকার মত সহজেই বাঁকানো যায় (malleable)। Endotracheal intubation-এর সময় এই
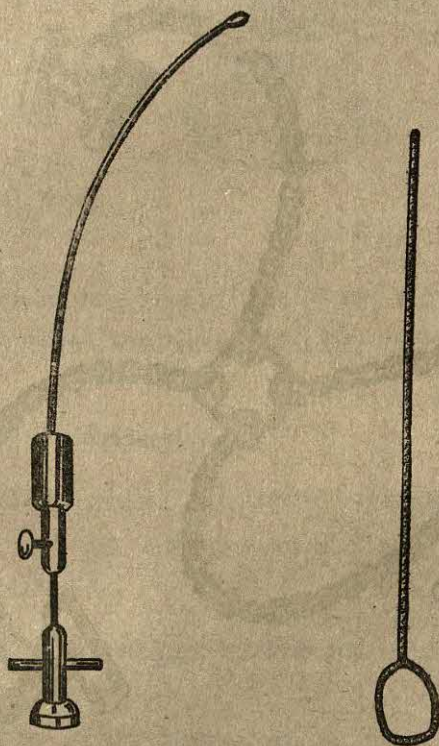
চিত্র-৪১ ক : Stylet   চিত্র-৪১ খ : Stylet

stylet-এর প্রয়োজন হতে পারে। এটি endotracheal টিউবের মধ্যে fit করা হয়। ফলে endotracheal টিউব বেশ শক্ত হয় এবং দরকার মত বাঁকিয়ে যে কোন আকারে আনা যায়—ভালোভাবে endotracheal intubation-এর প্রয়োজনে। ব্যবহারের সময় এর অগ্রভাগ কখনই টিউবের বাইরে যেন না থাকে

নতুবা মুখের মধ্যে আঘাত সৃষ্টি করতে পারে। Intubation-এর পর এটি আস্তে আস্তে বের করে নেওয়া হয়।

Mouth prop (চিত্র নং ৪২):

এগুলি সাধারণতঃ মেটালের তৈরী, অবশ্য প্লাস্টিক বা রবারের তৈরীও পাওয়া যায়। এগুলি গোলাকার বা চৌকো মাপের হয়। রোগীর মুখের চোয়াল ফাঁক
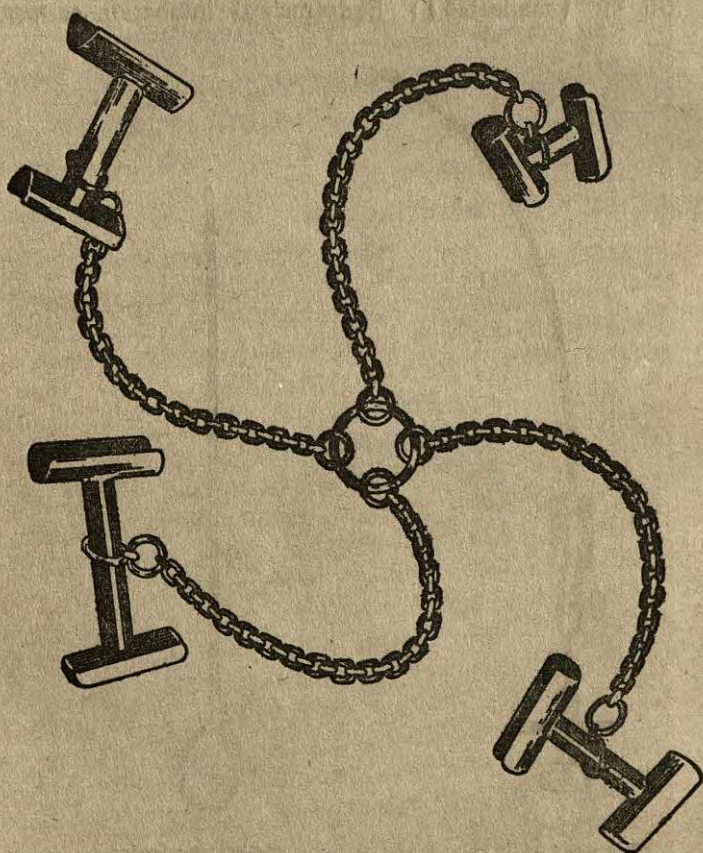
চিত্র-৪২ : Mouth Props

করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ৩ বা ৪ সাইজের পাওয়া যায় এবং একত্রে সরু শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। ব্যবহারের সময় একটি মুখের মধ্যে দেওয়া হয়—অন্যগুলি বাইরে থাকে। এগুলিকে dental prop'ও বলে।

Airway prop (চিত্র নং ৪৩) ঃ

এগুলিও গোলাকার, মেটালের তৈরী, মাঝখানে ফাঁপা। এই ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়েই endotracheal টিউব পরানো হয়। Endotracheal
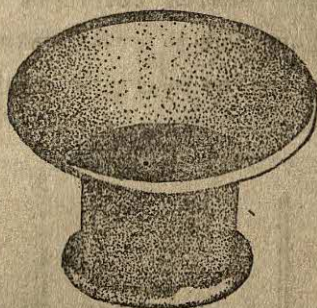
চিত্র-৪৩ : Airway Prop

intubation-এর পর এই prop মুখের দুই পাটি দাঁতের মাঝখানে রাখা হয়। ফলে রোগী কখনও কামড়ে endotracheal টিউব বন্ধ করে দিতে পারে না।

Spinal এবং Epidural Set :

Spinal বা epidural অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার জন্য কতকগুলি জিনিস একেবারে প্যাক করা বীজাণুমুক্ত (sterilised) অবস্থায় রাখা হয়। এই জিনিসগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। একটি ছোট stainless steel-এর পাত্র। এতে antiseptic ওষুধ রাখা হয়।
২। ছোট তোয়ালে, swab, তুলা, towel clip, sponge forceps,—এগুলি spinal puncture-এর জায়গা পরিষ্কার করতে এবং draping করতে লাগে।
৩। কয়েকটি সিরিঞ্জ (২ মি. লি. ; ৫ মি. লি. ; ১০ মি. লি.) এবং তার সংগে hypodermic needles।
৪। Local analgesiaর ওষুধ—অ্যাম্পুল বা ভায়াল।

৫। Spinal বা epidural needle।

৬। Continuous epidural analgesiaর জন্য সরু নাইলন ক্যাথেটার।

Spinal needle (চিত্র নং ৪৪) ঃ

এগুলি লম্বা stainless steel-এর তৈরী। ৭.৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এটি নানান bore-এর হয়—সাধারণভাবে ২০-২২ s. w. g. ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে সরু stylet থাকে needle-এর bevel পর্যন্ত।
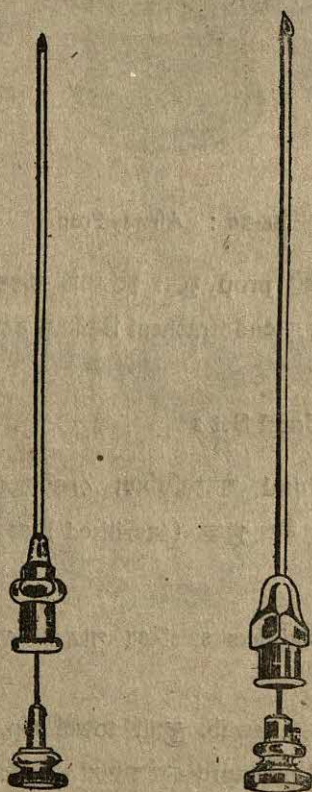
চিত্র-৪৪ : Spinal needle চিত্র-৪৫ : Tuohy needle

Lumber puncture হওয়ার পর এই stylet আস্তে আস্তে বের করে নেওয়া হয় এবং তখন needle দিয়ে cerebrospinal fluid পড়তে থাকে। ব্যবহারের

পর ভালো করে spinal needle পরিষ্কার করে autoclave করা উচিত। Boilingও করা যেতে পারে, তবে styletটি ঠিক জায়গায় রেখেই করা উচিত, নতুবা needle point নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

Epidural puncture-এর জন্য spinal needle একটু বড় bore-এর নিতে হয়। এগুলি প্রায় spinal needle-এর মতই লম্বা হয়। সাধারণ spinal needle দিয়েও epidural puncture করা যায়। অবশ্য অনেক সূচে calibration করাও থাকে।

Continuous বা ধারাবাহিক epidural analgesia দিতে গেলে Tuohy needle (চিত্র নং ৪৫)-এর প্রয়োজন হয়। এই সূচের bevel point একদিকে একটু বাঁকানো থাকে, ফলে নাইলন ক্যাথেটার একটি বিশেষ দিকে পাঠাতে সুবিধা হয়।

Air-ether anaesthetic apparatus (চিত্র নং ৪৬) ঃ

এই অ্যানেস্থিসিয়ার পদ্ধতিতে সাধারণ বাতাসকে carrier gas হিসাবে কাজে লাগানো হয়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাস তরল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধকে
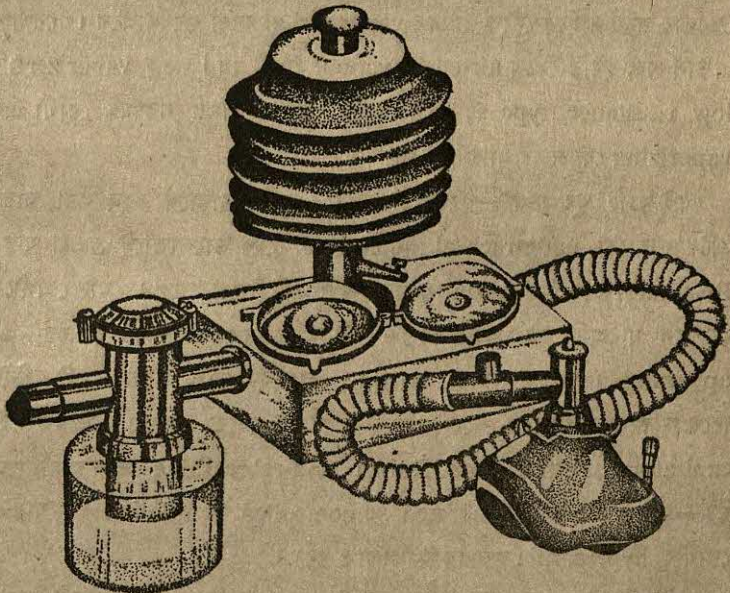
চিত্র-৪৬ : Air-ether anaesthetic apparatus

volatilize করতে সাহায্য করে। এইসব তরল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলির মধ্যে ইথার সর্বোৎকৃষ্ট, কেন না এটিই সব থেকে নিরাপদ ওষুধ এবং নির্ভয়ে শুধুমাত্র বাতাসের সংগে ব্যবহার করা যায়। অন্য সব তরল অ্যানেস্থিসিয়া ওষুধ, যেমন ট্রাইক্লোরোইথিলিন বা হ্যালোথেন ব্যবহার করলে আলাদাভাবে অক্সিজেন বাতাসের সঙ্গেও দেওয়া দরকার।

এই অ্যানেস্থিসিয়ার apparatus খুবই সহজ এবং সরল। এর মধ্যে কয়েকটি অংশ পর পর থাকে, যেমন একটি vaporizing বোতল, bellows বা হাপর, corrugated রবার টিউব, expiratory ভাল্‌ভ, angle piece, এবং মুখের মাস্ক। এছাড়াও endotracheal টিউব, তার connections এবং catheter mount থাকে। এটি draw-over type anaesthetic apparatus। রোগী যখন শ্বাস নেয়—বাতাস vaporizer হয়ে এবং expiratory ভাল্‌ভ হয়ে রোগীর দিকে যায়। রোগী যখন শ্বাস ছাড়ে তখন তার বেশীটাই expiratory ভাল্‌ভ দিয়ে বাইরে চলে যায়।

Bellowsকে একবার একটু উপরে তুলে নীচের দিকে compress করলে positive pressure ventilation করা যায়। Bellows বা হাপর উপরে তোলার সময় বাইরে থেকে বাতাস vaporizer-এর মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে বাতাস এবং ইথার মিশে air-ether vapour তৈরী হয়। এই vaporizerগুলি low resistance type-এর হলে ভালো হয়। হাপর সবসময় রোগী এবং vaporizing বোতলের মাঝখানে থাকে।

এই যন্ত্রটি খুব ছোট—ইচ্ছেমত যেখানে খুশী অনায়াসে বহন করা যায়। এটির সাহায্যে endotracheal অ্যানেস্থিসিয়া বেশ ভালোভাবেই দেওয়া যায়। Respiratory resuscitation করার জন্যও এটি কাজে লাগে। যদি রোগীকে বাতাসে যা অক্সিজেন আছে তারও বেশী অক্সিজেন দেওয়ার দরকার হয়—এই apparatus-এ তারও ব্যবস্থা আছে। হাপরের ঠিক নীচে একটি টিউব দিয়ে অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে অক্সিজেন দেওয়া যেতে পারে। অনেক সময় expiratory ভাল্‌ভের বদলে Ruben non-rebreathing ভাল্‌ভ লাগানো হয়—এতে ভালোভাবে assisted বা controlled ventilation করা যায়—রোগীর hypercarpia হওয়ার আশংকাও কমে।

এই air-ether apparatus অপেক্ষাকৃত কম দামী। এটিতে বেশী দামের কোন যন্ত্রপাতি থাকে না, compressed gas cylinderও লাগে না। সুতরাং

যে সব জায়গায় gas supply হয় না বা হলেও অনিশ্চিত, সেখানে এই apparatus-এর ব্যবহার হওয়া উচিত। মোটের উপর বেশীর ভাগ অপারেশনেই এই অ্যানেস্থিসিয়ার পদ্ধতি ভালোভাবে প্রয়োগ করা যায়। তাছাড়া প্রাথমিক ভাবে respiratory resuscitation-এর জন্যও এই apparatus অপরিহার্য।

এই পদ্ধতিতে অ্যানেস্থিসিয়া দিতে হলে রোগীকে বিধিমত premedication দেওয়া দরকার। শিরাপথে থায়োপেণ্টোন সোডিয়াম এবং গ্যালামিন (gallamine) বা টিউবোকিউরেরিন (tubocurarine) দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করা হয়। Endotracheal intubation করে এটি air-ether apparatus-এর সংগে যুক্ত করা হয়। ইথারের vapour concentration আস্তে আস্তে বাড়ানো হয়। হাত দিয়ে bellows বা হাপরের সাহায্যে controlled ventilation করা হয়। অক্সিজেনও দরকার মত দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে বার বার relaxant ওষুধ দরকার হতে পারে। অপারেশনের পরে বিধিমত decurarisation করা অবশ্য-কর্তব্য।

Mouth gag :

এই gag মুখে লাগানো হয় মুখটি খুলে রাখার জন্য। আবার যখন যে কোন কারণে মুখ খোলে না, জোর করে খোলানোর জন্যও এটি ব্যবহার হয়। অনেক-সময় airway টিউব দেওয়ার জন্য এর সাহায্য নেওয়া হয়। অনেক রকমের mouth gag পাওয়া যায়।
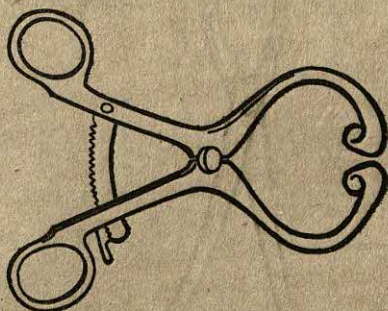
চিত্র ৪৭ : Doyen mouth gag

Doyen gag (চিত্র নং-৪৭) সাধারণতঃ মুখ খুলে রাখতে সাহায্য করে। এর দুটি অর্ধগোলাকার ব্লেড থাকে এবং gagটি খুলে রাখার জন্য locking device আছে। এটি dental surgeryতে, জিভের বা মুখের মধ্যে অপারেশনের সময় বিশেষ ভাবে কাজে লাগে।

Ferguson's gag (চিত্র নং-৪৮) সাধারণতঃ বন্ধ মুখ জোর করে খুলতে সাহায্য করে। এটি বন্ধ মুখে airway টিউব দেবার আগে, suction করার প্রয়োজনে অথবা জিভ-এ tongue forceps দিয়ে ধরার আগে ব্যবহার করা হয়। এর পাতলা ব্লেড দুটি molar teeth-এর মাঝখানে দেওয়া হয়। বন্ধ অবস্থায় ব্লেড দুটি কাছাকাছি থাকে। ব্যবহারের সময় যখন খোলা হয়, ব্লেড দুটি ফাঁক হয়ে পড়ে।
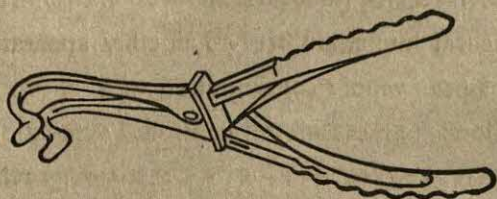
চিত্র-৪৮ : Ferguson's gag.

Tongue forceps (চিত্র নং ৪৯ এবং ৫০) ঃ

এটি জিভ ধরতে ব্যবহার করা হয়। এটি জিভের অপারেশনের সময় লাগে।
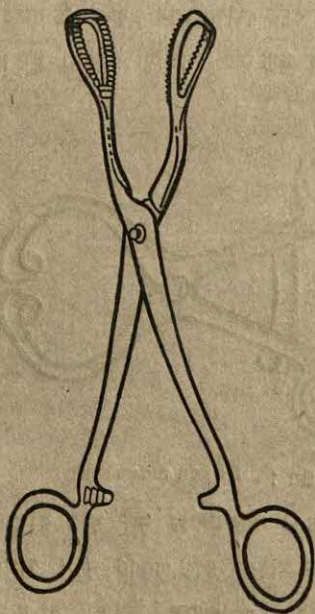
চিত্র-৪৯ : Guy's tongue forceps

মুখের মধ্যে অপারেশনের সময়, বিশেষ ক্ষেত্রে জিভটি tongue forceps দিয়ে ধরে রাখতে হয়। অজ্ঞান অবস্থায় রোগীর জিভ নীচের দিকে ঝুলে পড়ে এবং শ্বাসনালীতে বাধাসৃষ্টি করে। সে সময় tongue forceps দিয়ে জিভটি সামনের দিকে টেনে ধরলে শ্বাসনালী বাধামুক্ত হয়।

সাধারণতঃ Guy's টাইপের tongue forceps (চিত্র নং-৪৯) একটি লম্বা forceps এবং এর হ্যাণ্ডেলে 'catch' থাকে। ব্লেডের শেষ দিকটি flat এবং serrated হয়, ফলে জিভটি ভালোভাবে ধরতে পারা যায়। কিন্তু এর ব্যবহারে জিভের ক্ষতি হতে পারে, এমনকি জিভের রক্ত চলাচলও ব্যাহত হতে পারে।
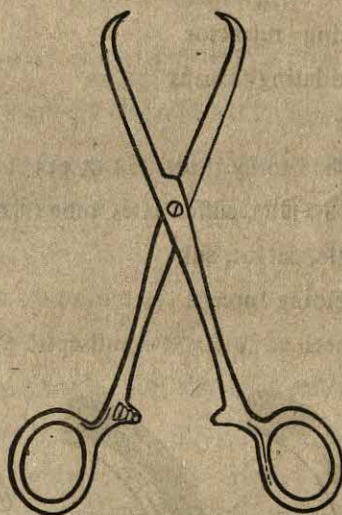
চিত্র-৫০ : Moynihan's tongue forceps

তাই এর ব্যবহার এখন বিশেষ হয় না। অবশ্য Moynihan's tongue forceps-এর অগ্রভাগ খুবই সূচালো থাকায় জিভের বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং এর ব্যপক ব্যবহার আছে (চিত্র নং-৫০)।

Tracheostomy Set

Tracheostomy বেশীর ভাগ সময়েই অত্যন্ত জরুরী এবং প্রাণদায়ী চিকিৎসা। সুতরাং যে কোন সময় হঠাৎ এই tracheostomy করার দরকার হতে পারে। তাই tracheostomy set একেবারে বীজাণুমুক্ত অবস্থায় প্যাক

করে রাখা হয় যাতে হঠাৎ প্রয়োজনে অযথা দেরী না হয়। এই tracheostomy set-এ সাধারণতঃ নিম্নোক্ত জিনিসগুলি থাকে :

১। দুইটি ব্লেড সমেত scalpel
২। দুইটি dissecting forceps
৩। দুইটি কাঁচি
৪। অন্ততঃ ১০টি mosquito forceps
৫। চারটি artery forceps
৬। দুইটি single hook retractor
৭। দুইটি double hook retractor
৮। Self-retaining retractor
৯। Tracheal dilating forceps
১০। Introducer
১১। Metal tracheostomy tubes (চিত্র নং-৫১)
১২। রবার বা প্লাস্টিক টিউব, cuffed latex tube (চিত্র-৫২)
১৩। ফিতে, needle, catgut, silk
১৪। Sponge holding forceps
১৫। Stainless steel-এর ছোট পাত্র—antiseptic ওষুধ রাখার জন্য।
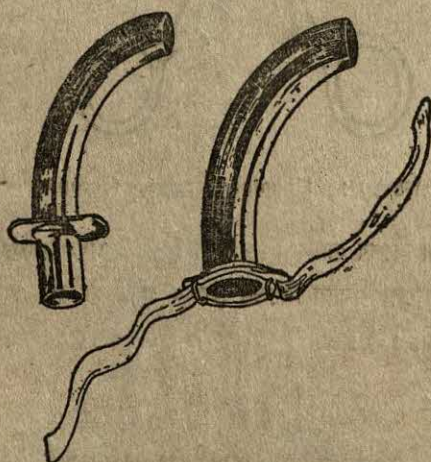
চিত্র-৫১ : Metal tracheostomy tubes
বাম দিকে—ভিতরের টিউব ডান দিকে—বাইরের টিউব
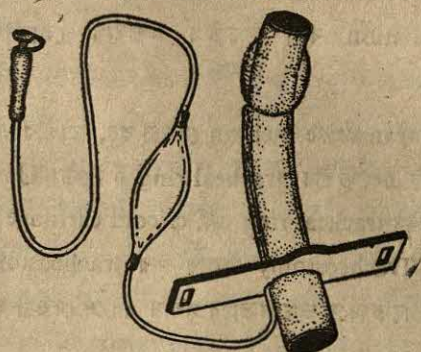
চিত্র-৫২ : Latex tracheostomy tube

Tracheostomy সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে করা হয় ঃ

১। Upper respiratory tract-এ যদি কোন কারণে বাধাসৃষ্টি হয় এবং অন্যভাবে যখন সেই বাধামুক্ত না করা যায়।

২। রোগী যদি তার respiratory tract-এর secretion কেশে বের করে দিতে সক্ষম না হয়,তখন tracheostomy করে ভালোভাবে শোষণ বা suction করা যায়।

৩। রোগীর যদি swallowing এবং laryngeal reflex না থাকে, তবে যে কোন সময়ে aspiration হতে পারে। এদেরও tracheostomy করা উচিত।

৪। বহুদিন ধরে কৃত্রিমভাবে রোগীর শ্বাসকার্য চালাতে হলে tracheostomy করা দরকার। বহুদিন endotracheal intubation করে রোগীকে রাখা নিরাপদ নয়।

Tracheostomy করলে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ রোগীর upper respiratory tract-এ কোন বাধা থাকলে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। রোগীর dead space অনেক কমিয়ে দেয়। ভালোভাবে respiratory tract শোষণ করা যায়। রোগীর aspiration হওয়ার আশংকা থাকে না। বহুদিন ধরে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালাতে অসুবিধা হয় না।

Tracheostomy অনেক সময় elective case হিসাবেও করা হয়। খুব ভালোভাবে position করে তবেই tracheostomy করা উচিত। রোগীকে চিৎ করে শোওয়ানো হয়। একটি বালিভর্তি ব্যাগ রোগীর কাঁধের নীচে দেওয়া হয় যাতে রোগীর মাথা extended থাকে। যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দিয়ে tracheostomy করতে হলে সর্বদাই endotracheal intubation করা উচিত। অন্যথায় লোকাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া ভালো।

প্রথমে একটি transverse incision দেওয়া হয়, রোগীর গলার ঠিক crease-এ। পরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় tracheal ring-এ উল্টো U-এর মত incision দেওয়া হয়। প্রথম tracheal ring এবং cricoid cartilage সব সময়েই অক্ষত রাখা উচিত। Tracheostomy করার পর tracheostomy টিউব পরিয়ে দেওয়া হয় এবং ফিতে দিয়ে ভালোভাবে গলায় বেঁধে দেওয়া হয় যাতে টিউবটি সরে না যায়।

মেটালের তৈরী tracheostomy টিউব (চিত্র নং-৫১): এর দুটি অংশ থাকে। একটি বাইরের টিউব—এর দুদিকে ফিতে পরানোর ব্যবস্থা থাকে। বাইরের টিউব প্রথমে পরানো হয় এবং পরে ভিতরের টিউব পরানো হয়। ভেতরের টিউব মাঝে মাঝে খুলে পরিষ্কার করা হয় এবং নতুন টিউব দেওয়া হয়। বাইরের টিউব অন্ততঃ ৭ দিন খোলা হয় না এবং এরই মধ্যে একটা ভালো track বা রাস্তা তৈরী হয়।

কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালানোর জন্য প্লাস্টিক টিউব ব্যবহার করা হয়। এই টিউবে inflatable cuff দেওয়া থাকে। Portex disposable টিউবও পাওয়া যায়।

Tracheostomy করা রোগীর কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা হয়। যেমন, রোগী কথা বলতে পারে না। রোগী জোরে কাশতে পারে না। শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় বাতাস নাক দিয়ে যায় না বলে ভালো humidification হয় না।

Tracheostomy করার বিপদও অনেক আছে। এর নিজস্ব mortality এবং morbidity আছে। অপারেশনের ক্ষত থেকে অধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। নানারকমের বীজাণু সংক্রমণ হতে পারে। Tracheal dilatation, tracheal stenosis এবং এমন কি tracheo-oesophageal fistulaও হতে পারে।

সুতরাং tracheostomy অনাবশ্যক ভাবে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া করা উচিত নয়। Tracheostomy করার পরে রোগীর বিশেষ ভাবে যত্ন-পরিচর্যা করা দরকার।

Automatic ventilator :

এই ventilator এমন একটি মেশিন যেটি positive pressure দিয়ে ফুসফুসে প্রসারণ ঘটাতে পারে। এই প্রেশার রোগীর endotracheal টিউব বা tracheostomy টিউব দিয়ে গিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালায়। আগেকার দিনে 'iron lungs' বা 'tank respirator' ব্যবহার করা হোত, বিশেষতঃ বহুদিন ধরে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানোর জন্য। এই পদ্ধতিতে রোগীকে একটি বড় ট্যাংকের মধ্যে রাখা হয়—অবশ্য রোগীর মুখ এবং ঘাড় বাইরে বেরিয়ে থাকে। সেই ট্যাংকে একটি rhythmic negative pressure-এর সাহায্যে রোগীর শ্বাস-কার্য চলে। এই পদ্ধতিতে শ্বাসকার্য চালানোর জন্য রোগী ট্যাংকের মধ্যে থাকে বলে সব সময় রোগীকে পরিচর্যা করা সম্ভব হয় না। বারবার ট্যাংক খুললে শ্বাসকার্যের অসুবিধা ঘটে।

এরপর positive pressure ventilator তৈরী হওয়ায় আগেকার অসুবিধা অনেকাংশ কমে গেছে। এখন এই সব ventilator খুবই ব্যবহার হয়—যে কোন respiratory failure-এ কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালানোর জন্য। এমন কি অ্যানেস্থিসিয়ার সময় সাময়িক ভাবে যখন respiratory paralysis করা হয় তখনও এই ventilator-এর সাহায্য নিয়ে রোগীর শ্বাসকার্য চালানো হয়। প্রথম দিকের ventilatorগুলি যদিও সহজ এবং সরল ছিল, এখন এগুলি অত্যন্ত জটিল এবং sophisticated হচ্ছে। তবে এ দিয়ে আরও সুচারু ভাবে স্বাভাবিক শ্বাসকার্যের মতই কাজ হচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত কম উপসর্গে দীর্ঘকালব্যাপী কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানো যাচ্ছে।

একটি ভালো automatic ventilator-এর কিছু বিশেষত্ব থাকা দরকার। সেটি খুব নির্ভুল ভাবে স্বাভাবিক শ্বাসকার্যের মত pulmonary ventilation করবে। এটিতে respiratory cycle কম-বেশী করে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। Expiration-এর পর নেগেটিভ প্রেশার তৈরী করতে পারবে। রোগীর শ্বাসকার্যে সহায়তা করার জন্য trigger mechanism থাকবে। এটি বাতাস অথবা বেশী অক্সিজেন সম্পৃক্ত বাতাস দিয়ে চালানো যাবে। এটিতে humidification করার ব্যবস্থা থাকবে। এটির কোন গণ্ডগোল হলে warning device থাকবে। এগুলি সাধারণতঃ বিদ্যুতে চলে, তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে ব্যাটারিতে চালানো চলে। প্রয়োজন বোধে manual ventilation করার ব্যবস্থাও থাকা চাই।

সাধারণভাবে দুই রকমের ventilator পাওয়া যায়। একটি volume-cycled এবং অপরটি pressure cycled।

Volume cycled ventilator এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে রোগীকে প্রতিটি শ্বাসকার্যের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস ফুসফুসে দেওয়া যায় এবং সেই গ্যাসেই ফুসফুস প্রসারিত হয়। এই inflation-এ যতই resistance হোক না কেন সেই পূর্বনির্ধারিত গ্যাসের পরিমাণ রোগীর ফুসফুসে যাবেই, অবশ্য circuit-এ যদি কোন ছিদ্র বা leak না থাকে। একটি electric motor-এর সাহায্যে একটি ব্যাগ বা হাপর compression করেই এই শ্বাসকার্য চালানো হয়। নিরাপত্তার খাতিরে একটি safety blow-off এতে দরকার, সাধারণতঃ ৩০ সে. মি. H_2O প্রেশারে। এতে একটি pressure gauge থাকে যার দ্বারা রোগী বা circuit-এ inflation-এর resistance কত এবং কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি না বোঝা যায়। কোন ছিদ্র থাকলে inflation pressure কমে যায়।

এই volume cycled ventilator সাধারণতঃ দীর্ঘকালব্যাপী কৃত্রিম শ্বাস-কার্যের জন্য ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। যে সব রোগীর ফুসফুস সংক্রান্ত অসুখে-inflation resistance বেশী থাকে তাদের পক্ষে এই মেশিন ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। এই ventilator কিন্তু অত্যন্ত দামী এবং বড় ধরনের তৈরী বলে অনেক জায়গা নেয়। Cape ventilator, Beaver ventilator, East Radcliffe ventilator এই ধরনের volume cycled ventilator। অবশ্য Barnet ventilator এবং Blease ventilator দুইভাবেই—pressure এবং volume cycled machine হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

Pressure cycled ventilator সাধারণতঃ compressed অক্সিজেন বা বাতাস দিয়ে চলে। এই মেশিন পূর্বনির্ধারিত একটি প্রেশার তৈরী হয় এবং সেই প্রেশার দিয়েই রোগীর ফুসফুস প্রসারিত হয়। এই inflation বা প্রসারণের পরেই গ্যাস সরবরাহ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন একটি আলাদা expiratory ভাল্‌ভ দিয়ে passive deflation-এর বাতাস বেরিয়ে যায়। ইতিমধ্যে মেশিনে আবার সেই পূর্বনির্ধারিত প্রেশার তৈরী হয় এবং inflation ঘটায়। এভাবেই কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের ছন্দ চলতে থাকে।

এই pressure cycled ventilator-এ অপেক্ষাকৃত বেশী compressed বাতাস বা অক্সিজেন লাগে। এই পদ্ধতিতে একমাত্র প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করেই রোগীর শ্বাসকার্য চালানো হয়। যেহেতু inflation pressure সব সময়েই এক

এবং পূর্বনির্ধারিত সুতরাং এতে pressure guage-এর দরকার হয় না। একটি gas meter যদি expiratory side-এ লাগানো যায় তবে তা দিয়ে প্রতিটি inflation-এর পরিমাণ মাপা যেতে পারে। এই পদ্ধতির সব থেকে বড় অসুবিধা, যে circuit বা airwayতে যদি resistance হয় তবে শ্বাসকার্য পর্যাপ্ত নাও হতে পারে, কেননা এতে পূর্বনির্ধারিত প্রেসার হলেই গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়—তা দিয়ে শ্বাসকার্য ঠিকমত হোক বা না হোক। Circuit-এ অল্প ছিদ্র থাকলে এই পদ্ধতিতে শ্বাসকার্যে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, তবে বেশী leak থাকলে ventilator একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। Bird ventilator, Manley ventilator—এই ধরনের pressure cycled ventilator। অবশ্য Manley ventilator কখনও কখনও volume cycled ventilator হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

এই সব positive pressure ventilator ইদানীং খুবই ব্যবহার করা হয়, বিশেষতঃ দীর্ঘকালব্যাপী কৃত্রিম শ্বাসকার্যের জন্য। রোগীকে একটি cuffed endotracheal টিউব পরিয়ে অথবা tracheostomy টিউব দিয়ে এই positive pressure ventilation চালানো হয়। রোগী যদি নিজে থেকে অল্প শ্বাস নেয় এবং তা যদি মেশিনের rhythm-এর সঙ্গে না মেলে—তা হলে রোগীর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির আশংকা থাকে।

রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার ঠিকমত নির্ধারণ করে দিতে হয়—মোটামুটি ১৫ থেকে ২০ বার প্রতি মিনিটের মধ্যে। অবশ্য শিশুদের ক্ষেত্রে এবং অন্য কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই হার বেশী হওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে একটি inflation-এ রোগীর ৫০০ থেকে ৭০০ মি. লি. গ্যাস লাগে এবং এর সঙ্গে respiratory rate গুণ করলে মিনিট প্রতি মোট গ্যাসের পরিমাণ পাওয়া যায়। সেই পরিমাণ প্রায় ৬ থেকে ১১ লিটার প্রতি মিনিটে লাগে। মোটের উপর রোগীকে একটু hyper-ventilated রাখতে হয়, কেননা রোগীর physiological dead space বেশী থাকে। তাছাড়া একটু hypocarbia অবস্থায় রোগী থাকলে রোগীর tran-quillity ভালোভাবে থাকে।

রোগীর inspiration এবং expiration-এর ছন্দ বা phasing ঠিক রাখার প্রয়োজন—সাধারণভাবে এদের অনুপাত ১ : ২। তবে প্রয়োজনমত এই অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কিছু কিছু ventilator-এ expiratory phase-এ নেগেটিভ বা sub-atmos-

pheric প্রেসার তৈরী করার ব্যবস্থা থাকে। এই নেগেটিভ প্রেসার কখনও ৫ সে.মি. H_2O-এর বেশী হওয়া উচিত নয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শতেই এটি ব্যবহার করা উচিত। কেননা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন chronic lung disease-এ, এই নেগেটিভ প্রেসার রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক।

অনেক ventilator-এ patient-triggering-এর ব্যবস্থা থাকে। রোগীকে যখন তার নিজের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে হয় তখন এই মেশিনে trigger mechanism-এর সাহায্যে নেওয়া হয়। রোগীর নিজস্ব respiratory effort-এর সংগে তখন মেশিন তাল মিলিয়ে চলে। একটি triggered machine ০·৫ মি. মি. H_2O প্রেসার তারতম্যে অথবা ৫ থেকে ১০ মি. লি. পরিমাণ তারতম্যেই sensitive হওয়া উচিত।

দীর্ঘস্থায়ী কৃত্রিম শ্বাসকার্যে endotracheal টিউব অথবা tracheostomy টিউব থাকায় রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাস ঠিক মত গরম এবং humidification হয় না। ফলে শ্বাসনালীর secretion শুকনো হয় এবং crust পড়ে যায়। এর জন্য প্রত্যেক ventilator-এ humidification-এর ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেক সময় একটি 'neubuliser' এই ventilator-এ যোগ করা থাকে। এই nebuiliser খুব সূক্ষ্ম 'mist' বা moisture তৈরী করে এবং ভালোভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্যাসকে humidify বা আর্দ্র করে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়া রোগীর মান নির্ণয়

একটি রোগী যখন তার অসুখের জন্য প্রথম surgical outpatient's department-এ যায় এবং শল্যচিকিৎসক যখন রোগ নির্ণয় করে রোগীকে অপারেশনের কথা বলেন, তখনই রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া ক্লিনিকে পাঠানো উচিত। অ্যানেস্থিসিয়া ক্লিনিকে রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং রোগী অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য উপযোগী কি না তা বিবেচনা করা হয়।

রোগীর যে কোন অপারেশনই হোক না কেন, রোগীকে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করা উচিত। যদি দরকার হয় চিকিৎসা করে রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়ার উপযুক্ত করে নেওয়া যায়। রোগীর অপারেশনের কোন বিপদ আছে কি না তা দেখা দরকার। সবশেষে রোগীকে ভালো এবং নিরাপদ অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য ভালো অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এবং পদ্ধতি আগে থেকেই মোটামুটি বেছে নেওয়া যায়।

রোগীকে ঠিকমত পরীক্ষা করে তা নথিভুক্ত করে রাখা উচিত।

নাম ঃ যে রোগীকে পাঠানো হয়েছে সে রোগীই এসেছে কি না তা দেখা দরকার। Identification-এর জন্য নামের খুবই দরকার।

বয়স ঃ রোগীর ওষুধের ঠিকমত হিসাব করার জন্য এর দরকার।

রোগীর ওজন ঃ এটিও ওষুধের মাত্রা নিরূপণে সাহায্য করে। অত্যধিক রোগা এবং অত্যধিক মোটা লোকের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত।

স্ত্রী অথবা পুরুষ ঃ সাধারণভাবে মেয়েরা অপারেশন, অ্যানেস্থিসিয়া এমন কি ইঞ্জেকশনেও ভয় করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে বমিভাব বেশী হয়। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে রোগীর সংগে গর্ভস্থ শিশুর কথাও ভাবতে হবে, যাতে তার কোন ক্ষতি না হয়।

রোগী মুখ খুলতে পারে কি না তা দেখা দরকার। দাঁতের অবস্থা বিবেচনা করা উচিত। নড়া দাঁত থাকলে আগে থেকে তুলে ফেলা ভালো। নতুবা অপারেশনের সময় সুতার সাহায্যে বেঁধে রাখা উচিত, যাতে হঠাৎ ভেঙে মুখে এমনকি শ্বাসনালীর মধ্যে চলে যেতে না পারে। বাঁধানো দাঁত, কৃত্রিম অংগপ্রত্যংগ,

contact lens অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে খুলে রাখতে হবে। রোগীর ঘাড় (neck) ঠিকমত বাঁকানো (extension) যাচ্ছে কি না তাও দেখতে হবে, নতুবা laryngoscopy করার সময় বেশ অসুবিধা হয়।

রোগীর মানসিক অবস্থা কেমন তা নির্ণয় করা উচিত। অত্যধিক ভয়-ভাবনা রোগীকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, রোগী তার চিকিৎসকের সংগে ঠিকমত সহযোগিতা করতে পারে না। রোগীর নাড়ীর গতি, শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়ে যায়। metabolic rate বেড়ে যায়, শরীরে অত্যধিক catecholamine নিঃসৃত হয়। সুতরাং রোগীকে অপারেশনের আগে থেকে ভয়মুক্ত রাখা একান্ত দরকার। এরজন্য ডাক্তার, নার্স এবং তার anaesthetist যদি সহানুভূতির সংগে কথা বলে, তাকে আশ্বাস দেয়, তাহলে অনেক পরিমাণে ভয় কমে যায়। রোগীকে কী করা হবে, কী রকম অপারেশন হবে, রোগী ভালো হয়ে যাবে কি না, এসব রোগীকে আগে থেকে ভালোভাবে বোঝানো উচিত। রোগী যেন তার ডাক্তারকে একান্তভাবে নির্ভর করতে পারে। এছাড়াও অবশ্য কিছু ওষুধের সাহায্যে রোগীর ভয়ভাবনা কমানো হয়ে থাকে।

রোগীর যদি আগে কোন অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়া হয়ে থাকে তার বিবরণ নেওয়া দরকার। রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া সম্বন্ধে যদি কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকে সেটাও শোনা দরকার। রোগীর আগের অ্যানেস্থিসিয়ার যদি কোন গোলমাল হয়ে থাকে সেটাকে এড়িয়ে অন্যভাবে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যেতে পারে।

রোগীর কোন নেশা আছে কি না জানা দরকার। অ্যালকোহল বা মদ্যপানে রোগীর লিভারে গণ্ডগোল হয়। রোগীর হার্টের অসুখ, রক্তাল্পতা ইত্যাদি হয়। এইসব রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া কঠিন—রোগী অজ্ঞান হতেই চায় না, অনেক পরিমাণ ওষুধ লাগে। আবার অ্যানেস্থিসিয়ার শেষে রোগীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনাও কঠিন হয়। যারা অনেকদিন ধরে মদ্যপানে আসক্ত তাদের হঠাৎ মদ্যপান বন্ধ করলে অনেক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় কোন দুর্ঘটনা হলে তৎক্ষণাৎ অপারেশনের দরকার হয়। তখন সেই মাতাল অবস্থাতেই হয়তো রোগীকে অজ্ঞান করার ব্যবস্থা করতে হয়।

ধূমপান সবদেশেই বেশ প্রচলিত। অত্যধিক ধূমপানের ফলে ফুসফুস এবং হার্টের অসুখ খুবই হয়। এদের মধ্যে ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা বেশী হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে ফুসফুস এবং শ্বাসনালীজনিত অসুখে এরা প্রায়ই ভোগে।

অত্যধিক ধূমপানের ফলে chronic nicotine poisoning এবং carbon mono-oxide poisoning হয়।

এছাড়াও অনেক সময় রোগী আফিম, মরফিন, বারবিচুরেট ইত্যাদি ওষুধে আসক্ত থাকে। আগে থেকে এসব আসক্তির কথা জানা থাকলে অপারেশন ও অ্যানেস্থিসিয়ার সময় দরকার মত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

আবার এমন কিছু অসুখ আছে যার জন্য রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শমতই বহুদিন ধরে ওষুধ খেতে হয়। এই সব ওষুধ খাওয়ার ফলে শরীরের বেশ কিছু তারতম্য ঘটতে পারে। এই সব ওষুধের মধ্যে নানা রকমের রক্তচাপ কমাবার ওষুধ, steroid, digitalis, oral contraceptive ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বহুদিন oral contraceptive ব্যবহারের ফলে অপারেশনের পরে thrombo-embolism হতে পারে। Monoamino oxidase inhibitor সাধারণতঃ মানসিক রোগে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই সব রোগী কিছু sympathomimetic ওষুধ, মরফিন, পেথিডিন, অ্যানেস্থিসিয়ার অন্য ওষুধ সহ্য করতে পারে না। অ্যানেস্থিসিয়ার সময় এই সব ক্ষেত্রে নানা উপসর্গ দেখা দেয়—এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

যে সব রোগী বহুদিন steroid পায় তারা সাধারণভাবে iatrogenic adrenocortical insufficiencyতে ভোগে। এদের অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার সময় হঠাৎ cardiovascular collapse, respiratory depression এমনকি অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে—মৃত্যুও ঘটতে পারে। যদি আগে থেকে steroid খাওয়ার কথা জানা থাকে, তাহলে রোগীকে আগে থেকে steroid দিয়ে তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

রোগী অত্যধিক রক্তচাপের জন্য অনেক সময় diuretics খায়। ফলে প্রস্রাবের সংগে অনেক পরিমাণ পটাশিয়াম বেরিয়ে যায়। এদের অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই পটাশিয়াম দেওয়া বিধেয়।

রোগীকে ভালোভাবে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া উচিত তার আগে কোন ভারী অসুখ করেছে কি না। আগে ন্যাবা বা jaundice-এ ভুগলে তার লিভারের দোষ থাকতে পারে। আগে করোনারী থ্রম্বোসিস, অ্যাজমা, ডায়াবেটিস, অত্যধিক রক্তচাপ ইত্যাদি কোন রোগ আছে কি না তাও জেনে নেওয়া উচিত।

রোগীর বর্তমান অসুখ সম্বন্ধেও জানা উচিত। কতদিন ধরে এই অসুখ হয়েছে, কী ভাবে চিকিৎসা হয়েছে তাও জানা উচিত।

এবার রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা দরকার। রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য কেমন তা দেখা দরকার।

রক্তাল্পতা :—একটি সাধারণ লোকের ১০০ মি. লি. রক্তে ১৫ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। যাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন লেভেল খুব কম, তাদের অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। এদের রক্তে অক্সিজেন ধরে রাখার ক্ষমতা খুব কম। এদের অপারেশনের আগে রক্তাল্পতার চিকিৎসা করা উচিত। দরকার হলে রক্তসঞ্চালনও করতে হতে পারে।

জণ্ডিস :—রোগীর জণ্ডিস থাকলে বুঝতে হবে রোগীর লিভারও বেশ কার্যক্ষম নয়। বেশীর ভাগ ওষুধই লিভারে বিপাক (metabolism) হয়। সুতরাং এই সব রোগীর ক্ষেত্রে অ্যানেস্থিসিয়া বিপজ্জনক হতে পারে।

হাত-পা ফোলা :—রোগীর হাত, পা অথবা মুখ ফুলে থাকলে বুঝতে হবে রোগীর কিডনী অথবা হার্টের অসুখ থাকতে পারে। রক্তাল্পতায় সারা শরীর ফুলে যেতে পারে।

Cyanosis :—এতে বুঝতে হবে রোগী অক্সিজেনের স্বল্পতায় ভুগছে। ঠিকমত শরীরে অক্সিজেন পৌঁছচ্ছে না। সাধারণতঃ ফুসফুসের অসুখে এবং জন্মগত হৃৎপিণ্ডের অসুখে বহুদিন থেকেই cyanosis থাকতে পারে। ব্যাহত শ্বাসক্রিয়াতেই cyanosis হয়।

Dehydration :—শরীরে জলের ভাগ অত্যধিক কমে গেলে dehydration হয়। নাড়ীর গতি বেড়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়। চোখ যেন বসে যায়। জিভ শুকনো হয়ে পড়ে। অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার আগে শিরাপথে infusion দিয়ে এ অবস্থার প্রতিকার করা একান্ত উচিত।

মানসিক অবস্থা :—রোগী অনেক সময় খুব ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে, ভয় পায়, নানারকম ভাবনা হয়। এগুলি আগে থেকে জেনে ভালোভাবে বুঝিয়ে, সহানুভূতি দেখিয়ে, আলাপ-আলোচনা করে অথবা ঠিকমত ওষুধ প্রয়োগ করে রোগী যাতে মানসিক শান্তিতে থাকে তার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

এসবের পর সাধারণভাবে রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ এবং দেহের তাপমাত্রা দেখে নেওয়া উচিত। রোগীর সবরকম systemই ভালোভাবে পরীক্ষা করা দরকার, বিশেষতঃ respiratory system এবং cardiovascular system।

Respiratory System ঃ

ফুসফুস এবং শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগীর নানাধরনের উপসর্গ থাকে, যেমন কাশি, কফ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। এদের অনেকের অত্যধিক ধূমপানের অভ্যাসও থাকে।

সাধারণ সর্দি থাকলে রোগীর সে সময় অ্যানেস্থিসিয়া না দেওয়াই ভালো। এতে পরে রোগীর বুকের কষ্ট হতে পারে। অবশ্য জরুরী অবস্থায় ভালোভাবে antibiotic cover করে অজ্ঞান করা যায়।

এই সব রোগীর ভালোভাবে বুক পরীক্ষা করা দরকার। রোগী ভালোভাবে শ্বাস নিচ্ছে কিনা, শ্বাসকষ্ট আছে কি না দেখা দরকার। স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে ফুসফুসে কোন rhonchi বা moist sound আছে কি না। এছাড়া দুটি bed side test করা দরকার।

Cough test ঃ রোগীকে কাশতে বলা হয়। পরে কাশি থামাতে বলা হয়। রোগীর ব্রংকাইটিস থাকলে কাশি তৎক্ষণাৎ থামাতে পারে না। রোগী কফ বাইরে ফেললে, দেখলেই বোঝা যায় এটি mucoid, mucopurulent অথবা purulent।

Match test ঃ রোগীর মুখ থেকে ৬ ইঞ্চি দূরে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি ধরা হয়। রোগীকে ঠোঁট এবং মুখ খুলে রেখে জোরে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ফেলতে বলা হয়। যদি না নিবোতে পারে, বুঝতে হবে রোগীর ফুসফুসজনিত অসুখ আছে।

Cardiovascular System ঃ

রোগীর আগে থেকে কোন অসুখ, যেমন রিউম্যাটিক জ্বর, অত্যধিক রক্তচাপ, করোনারী থ্রম্বোসিস ইত্যাদি আছে কিনা তা জানা দরকার। এই সব রোগীর শ্বাসকষ্ট, পা ফোলা, বুক ধড়ফড়, বুকে ব্যথা, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি উপসর্গ থাকতে পারে।

রোগীকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে ভালোভাবে হৃৎস্পন্দন (heart sound) শোনা উচিত। কোন murmur আছে কিনা দেখতে হবে। রোগীর নাড়ী, রক্তচাপ, পরীক্ষা করতে হবে।

Breath-holding test : এটিও একটি bed-side test। এতে রোগীর ফুসফুস এবং হার্টের কার্যকারিতা মোটামুটি বোঝা যায়। রোগীকে ভালোভাবে শ্বাস নিয়ে দমবন্ধ করে রাখতে বলা হয়। রোগী যদি ২৫ সেকেণ্ডের বেশী দমবন্ধ করে থাকতে পারে তাহলে ভালো বুঝতে হবে। যদি ১৫ সেকেণ্ডের কম সময় দম বন্ধ করে রাখতে পারে তবে বুঝতে হবে তার cardiorespiratory reserve অত্যন্ত কম।

এখন ল্যাবরেটরিতে কয়েকটি সাধারণ পরীক্ষা করে নিতে হবে।

১। প্রস্রাব পরীক্ষা : Specific gravity, অ্যালবুমিন, গ্লুকোস, ketone bodies আছে কি না দেখতে হবে।

২। রক্ত পরীক্ষা—হিমোগ্লোবিন, total এবং differential count, bleeding time, clotting time।

৩। রক্তের group আগে থেকে জেনে রাখা ভালো।

৪। রক্তের biochemistry—ইউরিয়া (urea); শর্করা (sugar)।

৫। বুকের একটি X-ray—এতে হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের একটি মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়।

৬। ৪৫ বছরের বেশী বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে একটি electrocardiogram করা উচিত।

এসবের পর রোগীর অপারেশন ও অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য কোন বিপদ আছে কি না তা জানা দরকার। Committee of American Society of Anaesthesiologists-কৃত এই গ্রেডগুলি পৃথিবীর সর্বত্র মান্য করা হয়।

গ্রেড ১—সাধারণ ভালো রোগী। কোন systemic disorder নেই। অবশ্য যে অসুখের জন্য অপারেশন সেটা তো আছেই।

গ্রেড ২—রোগীর moderate systemic disorder আছে—অপারেশনের অসুখে বা অন্য কারণে।

গ্রেড ৩—রোগীর severe systemic disorder আছে—অপারেশনের অসুখে বা অন্য কারণে।

গ্রেড ৪—রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার ধকল সহ্য করা রোগীর পক্ষে খুবই কঠিন।

গ্রেড ৫—রোগী মুমূর্ষু। অপারেশন হোক বা না হোক, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু প্রায় অবধারিত।

এই সব গ্রেডগুলি সাধারণভাবে রোগীর নিজস্ব কারণে operative risk বা বিপদের কথা বলে। তাছাড়াও কিন্তু অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য কিছু ঝুঁকি থাকতে পারে। অনেক সময় ধরে অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়া, অত্যধিক রক্তপাত, অকারণ tissue handling এদের মধ্যে অন্যতম। Surgeon এবং anaesthetist-এর ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার উপর অপারেশনের ঝুঁকি নির্ভর করে। ভালো যন্ত্রপাতি, ভালো রকমের সেবা এবং যত্ন—এসবও রোগীর ভালোমন্দকে প্রভাবিত করে।

যাই হোক, মোটের উপর আমাদের লক্ষ্য হবে রোগীর পূর্ণ নিরাপত্তা এবং তার স্বাচ্ছন্দ্যের উপর। এইসবকে ভিত্তি করে ঠিকমত অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এবং পদ্ধতি পছন্দ করে রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দিতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়া ঔষধ প্রয়োগ

অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার আগে রোগীকে ভালোভাবে তৈরী করে নিতে হয়—তার জন্য রোগীকে কিছু ওষুধ দিতে হয়। একেই premedication বলে। সাধারণভাবে রোগীকে ভালোভাবে অজ্ঞান করার জন্য এবং আবার নিরাপদে রোগীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনাই ঐ সব ওষুধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত কারণে অ্যানেস্থিসিয়ার আগে ওষুধ দেওয়া হয়:

১। অপারেশনের আগে রোগীর ভয়-ভাবনা কমানোর জন্য।
২। রোগীর metabolic rate কমানোর জন্য।
৩। রোগীর মুখে এবং শ্বাসনালীতে অত্যধিক secretion নিবারণের জন্য।
৪। অহেতুক vagal reflex activity কমানোর জন্য।
৫। ভালোভাবে রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার জন্য।
৬। অ্যানেস্থিসিয়াজনিত কোন ক্ষতি থেকে রোগীকে বাঁচানোর জন্য।
৭। অপারেশনের পরে যাতে কোন কুফল না হয় তার জন্য।
৮। অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ যাতে কম লাগে তার জন্য।

একটি ভালো আদর্শ প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হতে গেলে অবশ্যই তার ঐসব উপরোক্ত গুণগুলি থাকা আবশ্যক। এছাড়াও ওষুধটি anxiolytic, analgesic, sedative এবং amnesic হলে ভালো হয়। ওষুধটি অত্যন্ত নিরাপদ হবে, যাতে অহেতুক মস্তিষ্কে, শ্বাসক্রিয়ায় এবং হৃৎপিণ্ডে কোন কুফল সৃষ্টি না করে। ওষুধটি যেন সহজভাবে রোগীকে দেওয়া যায়।

আগে এমন সময় ছিল যখন premedication ছাড়া রোগীর অপারেশন হতোই না। কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত, premedication ছাড়াও অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যায়, আবার অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে premedication বর্জন করে চলা হয়।

এই সব ওষুধ প্রয়োগের আগে কয়েকটি জিনিস অবশ্যই দেখা দরকার।

১। রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। তার স্বাস্থ্য, মানসিক দিক ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। একেবারে শিশুদের ক্ষেত্রে এবং অতি-বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও আলাদাভাবে যত্ন নেওয়া উচিত। রোগীর ফুসফুসজনিত অসুখ, হৃৎপিণ্ডের অসুখ, মস্তিষ্কের অসুখ, ইত্যাদি আছে কি না তা দেখা উচিত। রোগীর কোন ওষুধে allergy আছে কি না তা আগেই নির্ণয় করা উচিত। যারা অনেকবার অ্যানেস্থিসিয়া পায় তাদের পৃথক যত্ন নেওয়া উচিত। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশুর দিকেও নজর দিতে হবে, যাতে উভয়েরই কোন ক্ষতি না হয়।

২। রোগীর কী ধরনের অপারেশন হবে, কতক্ষণ ধরে অপারেশন হবে, তার উপরও নির্ভর করে কী ওষুধ দেওয়া হবে এবং কখন দেওয়া হবে।

৩। অপারেশনের আগে বা পরে nursing care পর্যাপ্ত পাওয়া যাবে কি না তাও দেখা উচিত।

৪। কী ওষুধ দিয়ে এবং কী পদ্ধতিতে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হবে তার উপরও কী ওষুধ premedication-এ দেওয়া হবে তা নির্ভর করে।

মোটামুটি নিম্নলিখিত ওষুধগুলি অ্যানেস্থিসিয়ার আগে ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ

১। Narcotic analgesics : মরফিন, পেথিডিন, পেন্টাযোসিন
২। ডায়াজিপাম জাতীয় ওষুধ
৩। বারবিচুরেট জাতীয় ওষুধ
৪। Phenothiazine জাতীয় ওষুধ ঃ promethazine, trimeprazine, triflupromazine ইত্যাদি
৫। Anticholinergic drugs : atropine, hyoscine ইত্যাদি

আজ পর্যন্ত এমন একক ওষুধ নেই যেটি একটি আদর্শ premedicant ওষুধ। সুতরাং রোগীর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে একটি বা তারও বেশী ওষুধ একসংগে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে এই ওষুধগুলি ব্যবহার করা হয় ঃ

Morphine এবং Atropine ; Pethidine এবং Atropine ;
Pethidine এবং Promethazine ; Diazepam এবং Atropine ;
Pethidine এবং Hyoscine ইত্যাদি।

অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে narcotic analgesic ওষুধ বর্জন করে শুধু মাত্র atropine দেওয়া হয়, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে।

কখন এবং কি ভাবে এই সব ওষুধ দেওয়া হয়ঃ

১। **Parenteral ঃ**

ক) Subcutaneous অথবা intramuscular : এই ভাবে ওষুধ প্রয়োগে ৪৫-৬০ মিনিট লাগে ঠিকমত কাজ হতে। তাই অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করার ১ ঘণ্টা আগেই এই সব ওষুধ দেওয়া উচিত।

খ) শিরাপথে (intravenous) ঃ এতে সংগে সংগেই ওষুধের ফল পাওয়া যায়।

এইভাবে ওষুধ দিলে তাড়াতাড়ি এবং সুনির্দিষ্ট ওষুধটির ফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য এতে ব্যথা-বেদনা, প্রদাহ, রক্তপাত ইত্যাদি হতে পারে। ইঞ্জেকসন দেওয়ার সময় সূচ ভেঙ্গে বিপত্তিও ঘটতে পারে। ইঞ্জেকসন শিশুরা মোটেই পছন্দ করে না।

২। **Oral বা মুখ দিয়ে**

এইভাবে ওষুধ দিলে অন্ততপক্ষে ১½ ঘণ্টা সময় লাগে ওষুধের ঠিকমত ফল পেতে। এতে অবশ্য কোন ব্যথা-বেদনা হয় না। সুস্বাদু সিরাপের মতো করে দিলে কারুরই অপছন্দ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এতে নির্দিষ্ট ফল না পাওয়াও যেতে পারে। রোগী বমি করে ওষুধ বের করে দিতে পারে। এতে ওষুধের কার্যকারিতা অনেক পরে আসে বটে, তবে অনেকক্ষণ থাকেও।

কয়েকটি প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়ায় ব্যবহৃত ওষুধের গুণাবলি ঃ

মরফিন (Morphine) :

এটি আফিমের একটি alkaloid এবং এটি খুব ভালোভাবে ব্যথা-বেদনা উপশম করে। নতুন কোন ব্যথার ওষুধ আবিষ্কার হলে এর সংগেই তুলনা করা হয়। এটি ভয়-ভাবনা দূর করে, মনকে শান্ত করে। এটি ঘুমের ওষুধও বটে। মোটা-মুটিভাবে মস্তিষ্ককে অবদমিত করে।

শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যায়। কাশিও কমায়। শ্বাসনালীর muscle tone বাড়ায়। হৃৎস্পন্দন কমায়। রক্তচাপও কিছু কমে। Gastrointestinal tract-এর peristalsis কমায়, sphincter বন্ধ করে—ফলে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য (constipation) হয়। মরফিন দিলে বমিও হতে পারে। এটি chemoreceptor trigger zoneকে উত্তেজিত (stimulate) করে।

এটি placental barrier দিয়ে বেরুতে পারে, ফলে গর্ভস্থ শিশুর বিপদ হতে পারে। চোখের মণি ছোট হয়ে যায়। রক্তে শর্করার ভাগ বাড়াতে সাহায্য করে। এটি নেশায় পরিণত হতে পারে। মরফিন দেওয়ার পর রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়, antidiuretic hormone নিঃসৃত হওয়ার জন্য।

পেথিডিন (Pethidine) :

এটি কৃত্রিমভাবে তৈরী একটি ভালো ব্যথাবেদনানাশক ওষুধ। এটি মরফিনের তুলনায় ১/১০ ভাগ কার্যকরী। এর ব্যবহারের মাত্রা মোটামুটি ১ থেকে ২ মি. গ্রা./কে. জি.।

এটি ভয়ভাবনা দূর করে, মনকে শান্ত করে। ঘুম পাড়াতে সাহায্য করে। এটি শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি কমাতে পারে। মস্তিষ্ককে অবদমিত রাখে। নাড়ীর গতি কমে যায়, রক্তচাপও কমাতে সাহায্য করে। এটি নেশায় পরিণত হতে পারে। এটি কিন্তু constipation বা কোষ্ঠকাঠিন্য করে না। এটি smooth muscle-এর tone কমায়, যেমন bronchioles, intestine, ureters এবং arteries-এ। এটি এট্রোপিনের মত মুখে শুকনো ভাব তৈরী করে। এটি placental barrier দিয়ে বেরুতে পারে এবং গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করতে পারে।

পেথিডিন histamine release করতে পারে, ফলে urticaria হতে পারে। এর ব্যবহারে কিছু কিছু কুফল আছে, যেমন—বমি, মাথা ধরা, খিঁচুনী, ব্যাহত শ্বাসক্রিয়া এবং cardiovascular collapse।

মরফিন এবং পেথিডিন দেওয়ার আগে রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। রোগীর বয়স, ওজন জানা উচিত। রোগীর ফুসফুসজনিত অসুখ, হার্টের অসুখ, লিভার এবং কিডনির অসুখ আছে কি না দেখা দরকার। থাইরয়েড এবং পিটুইটারির অসুখ থাকলেও হিতে বিপরীত হতে পারে। রোগীর এই সব ওষুধের নেশা অথবা hypersensitivity আছে কি না জানা উচিত। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এসব ওষুধের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং যথেষ্ট ভেবে-চিন্তে এবং একান্ত দরকারেই এসব ওষুধের মাত্রামত ব্যবহার করা বিধেয়।

ডায়াজিপাম (Diazepam) :

এটি একটি benzodiazepine group-এর ওষুধ। এটি খুব ভালভাবে ভয়ভাবনা দূর করে, মনকে শান্ত করে। এটি ঘুম আসতে সাহায্য করে। এর প্রয়োগে রোগী সেসময়ের মত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে থাকে। এটি কিন্তু

ব্যথা বেদনা উপশম করতে পারে না। ডায়াজিপাম বমি করায় না। শ্বাসপ্রশ্বাসে কোন ব্যতিক্রম ঘটায় না, তবে অত্যধিক মাত্রায় শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে। সাধারণভাবে হৃৎপিণ্ডে বিশেষ কোন কুফল নেই। রক্তচাপ, নাড়ীর গতি ভালই থাকে। ডায়জিপাম মাংশপেশীতে শিথিলতা আনে, spasm কমায়। Nondepolarizing muscle relaxant গুলিকে প্রভাবিত করে। আজকাল premedication এবং inducing agent হিসেবে ডায়াজিপাম অ্যানেস্থিসিয়াতে ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া এটি eclampsia, টিটেনাশ, status epilepticus এবং muscular spsam এ বহুল ব্যবহার হয়।

এট্রোপিন (Atropine) ঃ

এটি একটি anticholinergic, parasympatholytic ওষুধ। এটি মস্তিষ্ককে শান্ত করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অল্প বাড়ায়। শ্বাসনালীর মাংশপেশীতে শিথিলতা আনে। শ্বাসনালীতে এবং মুখের secretion খুব ভালভাবে কমাতে সাহায্য করে। অবশ্য শ্বাসনালীর secretion খুব ঘন এবং চটচটে হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় রোগী ঠিকমত কেশে বের করতে পারে না।

রোগীর নাড়ীর গতি বেশ বেড়ে যায়। অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার পর রোগীর বমি কমাতে সাহায্য করে। Alimentory tract এ peristalsis কমায়। চোখের মনি বেশ প্রসারিত হয়। রোগীর শরীরের তাপ কিছু পরিমানে বাড়তে পারে বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে।

সাধারণ মাত্রায়০'৬৫ মি. গ্রা. মাংশপেশীতে (intermuscular) ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হয়। এটি মুখ দিয়ে খাওয়ালেও ভাল কাজ হয়।

হায়োসিন (Hyoscine) :

এটি একটি alkaloid। এর গুনাগুন অনেকাংশে এট্রোপিনের এর মতই তবে বেশ কিছু পার্থক্য এবং বিশেষত্ব আছে। Hyoscine ভালমত মস্তিষ্ককে শান্ত করে। এর প্রভাবে রোগী তখনকার মত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে যায়। কিন্তু বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ দিলে রোগী restless হয়ে পড়তে পারে, এমন কি ভুলও বকতে পারে। এট্রোপিনের থেকে অন্ততঃ ৩ গুন এর antisialogogue effect বেশী হয়। চোখের মনি প্রসারিত হয় তবে এট্রোপিনের চেয়ে কম সময় থাকে। এট্রোপিনের চেয়ে হায়োসিন রোগীর দেহের তাপমাত্রা অনেক বাড়ায়। তবে হৃৎপিণ্ড এবং অন্ত্রে হায়োসিনের প্রভাব অত্যন্ত কম।

এট্রোপিন এবং হায়োসিন কয়েকটি ক্ষেত্রে খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত এমন কি অনেক সময় ব্যবহার করাই উচিত নয়। Thyrotoxicosis অসুখে, অত্যধিক জ্বরে, হার্টের অসুখে, glaucomaতে এসব ব্যবহার না করাই ভালো। হায়োসিন বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রোমেথাজিন (Promethazine) :

এটি phenothiazine derivative। এটি মস্তিষ্কস্থিত reticular activating system এবং hypothalamusকে অবদমিত করে। এটি মনকে শান্ত করে, ভয় ভাবনা দূর করে। এটি ঘুমও আনে। এটি অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলিকে বেশ প্রভাবান্বিত করে। এটি বমি কমাতে খুব ভালভাবে কাজ করে। এটি chemoreceptor trigger zoneকে অবদমিত করে। এটি এট্রোপিনের মত মুখে শুকনো ভাব আনে। মাংসপেশীতে শিথিলতা আনে। দেহের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এটি একটি weak antihistaminic ও বটে। নাড়ির গতি মোটামুটি ঠিক থাকে। রক্তচাপ কমাতে পারে। সাধারণভাবে ২৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম intramuscular ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। বহুদিন ব্যবহারের ফলে কিছু কুফল ঘটতে পারে যেমন—Parkinsonian syndrome, লিভারের অসুখ, চামড়ার অসুখ, এমন কি agranulocytosis পর্যন্ত হতে পারে।

গ্লাইকোপাইরোলেট (Glycopyrrolate) ঃ

এটি এক synthetic quaternary ammonium compound। এরও এট্রোপিনের মত vagolytic effect আছে। এটি bradycardia, bronchospasm এবং intestinal motilityর মত muscarinic actionকে antagonize বা প্রতিহত করে। এটি salivary এবং bronchial secretion কমায়। এটি এট্রোপিনের চেয়ে ভালোভাবে হৃৎপিণ্ডের vagal blocking effect করে। এটি central nervous systemকে উত্তেজিত (stimulate) করে না। এটি blood-brain অথবা placentaর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। Glycopyrrolate অ্যানেস্থিসিয়ার আগে ০·১ থেকে ০·৩ মি. গ্রা. মাত্রায় ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

পেণ্টাযোসিন (Pentazocine) :

এটি একটি synthetic narcotic analgesic ওষুধ। এটি ব্যথাবেদনা দূর

করে এবং এর ৩০ মিলিগ্রামের কার্য্যকারিতা ৭৫থেকে ১০০ মিলিগ্রাম পেথিডিনের সমতুল্য বা ১০ মিলিগ্রাম মরফিনের সমতুল্য। সাধারণ মাত্রায় এটি শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত করে না, তবে বেশীমাত্রায় দিলে respiratory depression করতে পারে। সেই respiratory depression কখনও nalorphine বা ঐ জাতীয় ওষুধে ভাল হয় না। অবশ্য সেক্ষেত্রে nikethamide বা naloxone ওষুধে সুফল পাওয়া যায়।

Pentazocine প্রয়োগে রোগীর নেশা বা addiction হয় না। এটি pupil বা intraocular tension এর কোন পরিবর্তন ঘটায় না। এটি placenta দিয়ে খুবই কম পরিমাণে যেতে পারে। এটি প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে ৩০ মি. গ্রা. মাত্রায় ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

হ্যালোপেরিডল (Haloperidol) :

Haloperidol একটি butyrophenone group এর neuroleptic ওষুধ। এটিরও প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে ব্যবহার আছে। সাধারণতঃ ৫ মি. গ্রা. মাত্রায় ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

এই ওষুধ খুব ভালভাবে রোগীর বমি বন্ধ করতে বা তা প্রতিরোধ করতে পারে। এই ওষুধ প্রয়োগে রোগীর হৃৎপিণ্ড, নাড়ী বা রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে। এটি যদিও কাশি কমায় কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত করে না। ব্যথা-বেদনা উপশমের ওষুধ বা বারবিচুরেট ওষুধের কার্য্যকারিতাকে বাড়িয়ে তোলে। লিভারের উপরেও এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। কখনও কখনও মাংস-পেশীতে টান হতে পারে। এটি phenoperidine এর সংগে দিয়ে neuro-leptanalgesia করা যায়।

ড্রোপেরিডল (Droperidol) :

এটিও butyrophenone series এর neuroleptic ওষুধ। এটি মানসিক চিকিৎসায় খুব বেশী ব্যবহার হয় বিশেষতঃ antipsychotic হিসাবে। এটির প্রয়োগে রোগীর sedation হয়। এটিও বমি এবং বমিভাবকে দমন করে। এটি সাধারণভাবে cardiovascular এবং respiratory depression করে না। তবে কখনও কখনও রক্তচাপ অল্প মাত্রায় কমতে পারে। এটি muscular twitching বা মাংসপেশীতে টান সৃষ্টি (rigidity) করতে পারে।

প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে ০'১ মি. গ্রা./কে.জি. মাত্রায় ইঞ্জেকশন

দেওয়া হয়। মুখ দিয়ে খেতে দিলে ০'২ মি. গ্রা./কে.জি. হিসাবে দেওয়া হয়। এই droperidol অনেক সময় fentanyl এর সংগে দিয়ে neuroleptanalgesia করা হয়।

ট্রাইমেপ্রাজিন (Trimeprazine) :

এটি একটি phenothiazine group এর ওষুধ। এটি অনেকাংশে promethazine এর মত কার্য্যকরী। এটি একটি ভাল sedative এবং antihistaminic ওষুধ। এটি বমি নিবারণ এবং প্রতিরোধ করে। এটি চুলকানিতে antipruritic হিসাবে চর্মচিকিৎসায় খুব ব্যবহার করা হয়।

এটির প্রয়োগে cardiovascular system এ খুব একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। এটি sedative এবং অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের কার্য্যকারিতা বাড়ায়। Trimeprazine প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ১ মিলিগ্রাম/কে.জি. হিসাবে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় আর সিরাপ হিসাবে মুখে দিলে ৩ থেকে ৪ মি. গ্রা./কে.জি. মাত্রায় দেওয়া হয়।

ট্রাইফ্লুওপ্রোমাজিন (Triflupromazine) :

এটিও phenothiazine group এর ওষুধ। এটির প্রয়োগে রোগীর খুব ভাল ঘুম হয় এবং এটি মানসিক চিকিৎসায় খুব ব্যবহার হয়। এই triflupromazine বমি বা বমিভাবের ক্ষেত্রে চিকিৎসা এবং তার প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এটি রক্তচাপ অত্যন্ত কমিয়ে দেয়। এটি cerebral depressant ওষুধ, sedative এবং অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের কার্য্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এর প্রয়োগে অনেক উপসর্গ দেখা দিতে পারে যেমন—অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস, শুষ্ক জিভ এবং মুখ, Parkinsonism ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ মি. গ্রা. ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই সীমিত, ০'২ মি. গ্রা./কে.জি. মাত্রায় দেওয়া যেতে পারে।

প্রোপিওম্যাজিন (Propiomazine) :

Propiomazine সাধারণভাবে promethazine এর মত phenothiazine group এর ওষুধ। এটিও খুব ভাল sedative এবং antiemetic ওষুধ। তবে

এর anticholinergic এবং antihistaminic কার্য্যকারিতা খুবই কম। Cardiovascular system এ বিশেষ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। রক্তচাপ মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে ২০ থেকে ৪০ মি. গ্রা. মাত্রায় ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

প্রোক্লোরপেরাজিন (Prochlorperazine) :

Prochlorperazine একটি phenothiazine derivative এর ওষুধ। এটি খুব ভাল কার্য্যকরী বমিনাশক (antiemetic) ওষুধ। এই ওষুধের antihistaminic effect অত্যন্ত কম। এর cardiovascular system এর উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া নেই। এটি রক্তচাপও কমায় না। এটি ইথার এবং বারবিচুরেট অ্যানেস্থিসিয়াকে অনেকক্ষন স্থায়ী করতে পারে।

সাধারণভাবে এটি বমি চিকিৎসার জন্যই ব্যবহার হয়। Migraine এর চিকিৎসায় এবং মানসিক ব্যাধিতে এর ব্যবহার আছে। প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে সাধারণতঃ ১২.৫ মি. গ্রা. ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এর ফলে অ্যানেস্থিসিয়ার সময়ে এবং অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী সময়ে রোগীর বমির আশংকা থাকে না।

ট্রাইক্লোফস (Triclofos) :

Chloral hydrate একটি সুবিদিত nonbarbiturate ঘুমের ওষুধ। এটি খুব ভালভাবে sedation করে। কিন্তু এটি খেতে খুব খারাপ এবং পাকস্থলির পক্ষে ক্ষতিকর। এটি লিভারে এবং কিডনীতে বিপাক (metabolism) হয় এবং trichloroethanol তৈরী হয়। এই trichloroethanolও একটি stable ester। এটির স্বাদ মোটের উপর খারাপ নয় এবং পাকস্থলীতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে না। এটি gastrointestinal tract থেকে ভালই শোষিত হয়। এটি শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে দেওয়া হয়।

এটি সিরাপ হিসাবে বাজারে পাওয়া যায়। সাধারণসঃ ০.৭৫ মি. গ্রা./কে. জি. হিসাবে এই ওষুধ শিশুদের মুখ দিয়ে খেতে দেওয়া হয়।

লোরাজিপাম (Lorazepam) :

এটি একটি নতুন benzodiazepine group এর ওষুধ। এটি একটি ভাল

tranquilliser এবং sedative ওষুধ। এটি ভয় ভাবনা দূর করতে সাহায্য করে। রোগী সাময়িকভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভুলে যায়—amnesia হয়। এটি cardiovascular এবং respiratory depression করে না। প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে ৪ মি. গ্রা. মাত্রায় ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

ক্লোরডায়াজিপোক্সাইড (Chlordiazepoxide) :

এটিও diazepam এর মত benzodiazepine group এর ওষুধ। এটি ভাল tranquilliser এবং sedative। এটি ভয়ভাবনা দূর করতে সাহায্য করে। এটির ব্যবহারে ঝিমুনী ভাব কম হয়। এটি anticonvulsant হিসাবেও ব্যবহার হয়। এটি psychiatry তে anxiety states এর চিকিৎসায় ব্যাপক ব্যবহার হয়। প্রাক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে ১ মি. গ্রা. / কে. জি. মাত্রায় ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে।

নবম অধ্যায়

ওপেন ইথার অ্যানেস্থিসিয়া

Open drop পদ্ধতিতে ইথার অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার আগে রোগীকে ভালভাবে premedication দেওয়া দরকার। অন্ততপক্ষে এট্রোপিন সালফেট ০·৬৫ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশন-অজ্ঞান করার ১ ঘণ্টা আগে দেওয়া দরকার। অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করার সময় রোগীর চোখ দুটি ভালভাবে ঢেকে দেওয়া উচিত তা না হলে ইথারের জন্য চোখ খারাপ হয়ে যেতে পারে।
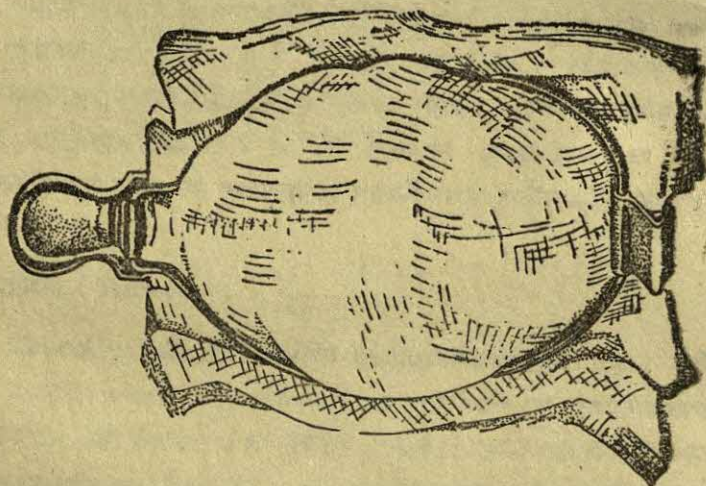
চিত্র-৫৩ : Schimmelbusch মাস্ক

Schimmelbusch মাস্কে (চিত্র নং-৫৩) অন্ততঃ ১০ টি layer বা স্তরে gauge দেওয়া হয়। একটি gamgee pad রোগীর মুখে লাগানো হয়। তারপর ইথার ফোঁটা ফোঁটা ক'রে মাস্কের উপর ফেলা হয় এবং মাস্ক রোগীর মুখ এবং নাকের উপর চেপে রাখা হয়। প্রথমদিকে রোগীর সহ্যমত ইথারের ফোঁটা ফেলা হয় এবং পরে আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। যখন ঠিকমত অ্যানেস্থিসিয়া হয়, রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক পরিষ্কার হয়ে আসে। অ্যানেস্থিসিয়া চালু রাখার জন্য ইথার পরে খুব কমই লাগে। সে সময় রোগীর মুখ একপাশে

হেলিয়ে এবং মাথাটি একটু extend করে রাখলে ভাল হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস যেন কোন রকমে ব্যাহত না হয়। মাঝে মাঝে মাস্কটি খুলে দেখা উচিত। যদি মুখে কোন secretion বা বমি থাকে তা তৎক্ষনাৎ sucker machine এর সাহায্যে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

এই open drop প্রক্রিয়া খুবই সহজ এবং এতে কোন ভারী দামী যন্ত্রপাতি, গ্যাস সিলিণ্ডার ইত্যাদি লাগে না। রোগী বাতাস এবং ইথার ভেপার তার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই নেয়। এতে শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাস বের করে দেওয়া দুইটিই atmostphere এ খোলা থাকে- তাই এটা মোটামুটি open circuit।

রোগীকে বাতাসের চেয়ে একটু বেশী অক্সিজেন দিতে হলে সিলিণ্ডার থেকে একটি নল নাকে লাগানো যেতে পারে। এতে রোগী প্রচুর অক্সিজেনযুক্ত বাতাস পায়। রোগীর মুখে একটি airway tube দিয়ে রাখা ভালো।

ওপেন ইথার অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় রোগীর নাড়ীর গতি, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ বারবার লক্ষ্য করা উচিত।

এই ভাবে অ্যানেস্থিসিয়া দিতে হলে একটু ধৈয্য ধরে দিতে হয়। মোটামুটি অ্যানেস্থিসিয়া হতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লাগে। এই প্রক্রিয়ায় ইথারের সর্বাধিক concentration হয় প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ।

এই open drop প্রক্রিয়ায় অন্য ওষুধও ব্যবহার করা যায় যেমন—ক্লোরোফর্ম, ইথাইল ক্লোরাইড এবং হ্যালোথেন। Open drop ক্লোরোফর্ম দিতে গেলে প্রথমদিকে খুব অল্প—মিনিটে ২০ ফোঁটা—পরে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে মিনিটে ৪০ ফোঁটা পর্য্যন্ত দিতে হয়। ক্লোরোফর্ম দেওয়ার সময় মাস্কটি অন্ততঃ মুখ থেকে আধ ইঞ্চি উপরে রাখা হয়—যাতে রোগী বেশী পরিমাণে শুদ্ধ বাতাস পায়। ক্লোরোফর্ম খুব ভাল ওষুধ, কিন্তু দেওয়ার সময় খুব সাবধানে দেওয়া উচিত।

ইথাইল ক্লোরাইডও open method এ দেওয়া যায়। এতে খুব তাড়াতাড়ি রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া হয়। কিন্তু এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ওষুধ এবং সবসময় নিরাপদ নয়। হ্যালোথেন খুব দামী ওষুধ। এটি open method-এ দিলে অনেক অপচয় হয়। এটির ব্যবহারে সবসময়েই বেশী পরিমাণে অক্সিজেন দেওয়া বিধেয়।

General অ্যানেস্থিসিয়ার মোটামুটি কয়েকটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক।

১। ইচ্ছাকৃতভাবে ওষুধ দিয়ে রোগীকে অজ্ঞান করা হয়।

২। সেই অজ্ঞানাবস্থা কম বেশী নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং আবার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায়।

৩। এটি ব্যথা বেদনা উপশম করে।

৪। এটি মাংশপেশী শিথিল (relaxation) করে।

৫। এটি কিছু relex activity কমিয়ে রাখে।

অ্যানেস্থিসিয়ার বিভিন্ন পর্য্যায় (Stages of Anaesthesia) :

এটি Guedel কৃত ইথার অ্যানেস্থিসিয়ার বিভিন্ন অবস্থা। এটি বহুদিন থেকেই বিশেষভাবে প্রচলিত। ইথার অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করা থেকে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত মোট সময়কে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রথম অবস্থা বা Stage of analgesia :

এটি ইথার অ্যানেস্থিসিয়ার আরম্ভ থেকে যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞালোপ হয়—ততক্ষণ পর্য্যন্ত। এই অবস্থায় রোগীর ক্রমশঃ ব্যথা বেদনার অনুভূতি কমে যায় এবং তার সংগেই ক্রমশঃ অজ্ঞান হতে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থা বা Stage of excitement :

এটি প্রথম অবস্থা শেষ হওয়ার থেকে আরম্ভ করে যতক্ষণ না রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস বেশ স্বাভাবিক সরল হয় ততক্ষন পর্য্যন্ত। এই সময় রোগী অত্যন্ত লাফালাফি, চিৎকার, চেঁচামেচি করে। এই সময় রোগী দম বন্ধ করে রাখতে পারে, বমি করতে পারে এবং কাশতে পারে। কিন্তু এই সময় রোগীর সম্পূর্ণ সংজ্ঞালোপ থাকার জন্য পরে কোন কিছুই মনে থাকে না। সাধারণভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থাকে একত্রে induction period বলা যেতে পারে।

তৃতীয় অবস্থা বা Stage of surgical anaesthesia :

এই অবস্থা রোগীর স্বাভাবিক সরল শ্বাসপ্রশ্বাস আরম্ভ হওয়া থেকে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ respiratory paralysis হয় ততক্ষণ পর্ন্ত। মোটামুটি এই অবস্থাতেই রোগীর অপারেশন করতে দেওয়া হয়। এই অবস্থাটিকে মোট ৪টি plane-এ ভাগ করা হয়।

Plane ১ : রোগীর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস আরম্ভ হওয়া থেকে যতক্ষণ না অক্ষিগোলক ঠিক মাঝখানটিতে আসে এবং কোন নড়াচড়া না করে—ততক্ষণ পর্ন্ত।

Plane ২ : অক্ষিগোলক মাঝখানে আসা থেকে আরম্ভ ক'রে যখন inter-costal paralysis আরম্ভ হয়—ততক্ষণ পর্ন্ত।

Plane ৩ : Intercostal paralysis আরম্ভ হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত।

Plane ৪ : এই অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রধান মাংসপেশী diaphragm-এ পর্যন্ত paralysis আরম্ভ হয়—ফলে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কমে যেতে থাকে।

চতুর্থ অবস্থা বা Stage of medullary paralysis :

এটি সাধারণতঃ অত্যধিক ইথার প্রয়োগের জন্য হয়। এ অবস্থায় রোগীর নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়, রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যায়। শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মাংসপেশী একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে। চোখের মণি অতি প্রসারিত হয়ে পড়ে। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

Guedel এর এই অ্যানেস্থিসিয়ার শ্রেণীবিন্যাস ঠিকমত বোঝা যায় একমাত্র open drop ইথার অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময়—অবশ্য যদি কোন premedication না দেওয়া থাকে এবং রোগী যদি ভালোভাবে সহযোগিতা করে। আজকালকার আধুনিক অ্যানেস্থিসিয়াতে সব stage গুলি ঠিকমত বোঝা সম্ভব নয়। এখন সাধারণভাবে general অ্যানেস্থিসিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। অসম্পূর্ণ বা inadequate অ্যানেস্থিসিয়া ঃ যখন ঠিকমত অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দেওয়া না হয়—যদি অল্প পরিমানে দেওয়া হয় অথবা রোগী যদি ঠিকমত অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস বা ভেপার শরীরে না নিতে পারে—তবে অ্যানেস্থিসিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এসময় অপারেশন করলে রোগী সব বুঝতে পারে, ব্যথা পায়, কষ্ট হয়, নড়চড়া করে। রোগীর ক্ষতি হয়।

২। Light অ্যানেস্থিসিয়া ঃ এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে বেশী stimulus দিলে রোগীর ব্যথা হয়, নড়াচড়া করে, কিন্তু অল্প stimulus-এ রোগী মোটামুটি ভালই থাকে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকে। চোখের মণি মাঝখানে থাকলেও ঠিক প্রসারিত হয় না। Muscle relaxation ভাল হয় না। এ অবস্থায় বেশী stimulus দিলেই রোগী নড়াচড়া করে, কাশে, দম বন্ধ করে ফেলে, এমনকি laryngospasm ও হতে পারে।

৩। Deep অ্যানেস্থিসিয়া : এটি সাধারণভাবে বেশী অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দেওয়ার জন্য হয়। বেশী stimulus দিলেও রোগী বুঝতে পারে না—নড়াচড়া করে না—ব্যথা অনুভূতি থাকে না। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক ভালই

থাকে, তবে কমে যেতে পারে। Muscle relaxation বেশীই থাকে। চোখের মণি মাঝখানে প্রসারিত অবস্থায় থাকে।

General অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় রোগী ঠিক কোন stage এ আছে—light অথবা deep অবস্থায় আছে কি না তা দেখা দরকার। অ্যানেস্থিসিয়া হঠাৎ light হয়ে যাচ্ছে কি না তা জানতে গেলে এইগুলি দেখা উচিত।

রোগীর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। চোখ নড়াচড়া করে। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়—অস্বাভাবিক হয়। হাত পা-এর আঙুল নড়াচড়া করে। Muscle relaxation কমে যায়। ঘাম হতে থাকে। নাড়ীর গতি বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলতে থাকে।

আবার খুব বেশী deep অ্যানেস্থিসিয়া হয়ে গেলে তার লক্ষনগুলি অন্যরকম। চোখের মণি খুব প্রসারিত হয়ে পড়ে। শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যায়, অস্বাভাবিক হতে হতে পারে। Muscle tone অত্যন্ত কমে যায়। রোগী ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়—অনেক সময় পাওয়াই যায় না। অপারেশনের জায়গায় কম রক্তপাত হয়—ফ্যাকাশে দেখায়। রক্ত চাপ অত্যন্ত কমে যায়।

দশম অধ্যায়

অ্যানেস্থিসিয়ার ঔষধপত্র

অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলি মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক টি inhalational—যেগুলি শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে নিয়ে রোগী অজ্ঞান হয়। আর দ্বিতীয়টি intravenous ওষুধ—যেগুলি শিরাপথে (intravenous) ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়।

Inhalational অ্যানেস্থিসিয়ার ঔষধপত্র :

একটি ভাল inhalational অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হতে গেলে তার কয়েকটি বিশেষগুণ থাকার দরকার। এটি ভালভাবে রোগী শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে নিতে পারবে এবং সুন্দরভাবে অ্যানেস্থিসিয়া করতে পারবে। ভাল muscle relaxation ও করা উচিত। এটির ব্যবহারে নিরাপত্তা থাকা দরকার এবং অ্যানেস্থিসিয়ার পরে কোন উপসর্গ না হলেই ভালো। এটি শরীরে অযথা বিরূপ প্রতিক্রিয়া না সৃষ্টি করলেই ভাল। এই সব ওষুধের মধ্যে কয়েকটি গ্যাস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন—নাইট্রাশ অক্সাইড, সাইক্লোপ্রোপেন। আর কয়েকটি volatile অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ যেমন ইথার, ক্লোরোফর্ম, হ্যালেথেন, মেথোক্সিফ্লুরেন ইত্যাদি।

নাইট্রাশ অক্সাইড (Nitrous oxide) :

এই নাইট্রাশ অক্সাইড গ্যাস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে Priestley কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। Sir Humphry Davy ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বলেন যে এই গ্যাসগ্রহণের ফলে অপারেশনের ব্যথাবেদনা দূর হতে পারে। Horace Wells ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যথাহীন দাঁত তোলার জন্য এই গ্যাসের ব্যবহার করেন এবং ঐ সময় থেকেই আজকালকার general অ্যানেস্থিসিয়ার প্রচলন হয়।

নাইট্রাশ অক্সাইড বাতাসের থেকে দেড়গুণ ভারী এবং এর specific gravity ১·৫। এটি মিষ্টি গন্ধযুক্ত, রঙহীন গ্যাস। এটি শ্বাসনালীতে কোন অশান্তি ঘটায় না। এটি নীল রঙের সিলিণ্ডারে ৭৫০ পাউণ্ড/ইঞ্চি^{২} প্রেসারে তরল অবস্থায় থাকে। এটি দাহ্য নয় এবং এটি বিস্ফোরনও ঘটায় না।

নাইট্রাশ অক্সাইডে কয়েকটি অবিশুদ্ধ জিনিস থাকতে পারে যেমন নাই-ট্রোজেন, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি।

রক্তের প্লাজমাতে এই গ্যাস বেশী দ্রবীভূত হয়। কিন্তু হিমোগ্লোবিনে বা শরীরের অন্য কিছুতে এটি সংযুক্ত হয় না। এটি মস্তিষ্ককে অবদমিত করে। রোগীর ব্যথা বেদনা দূর হয়, এমনকি অ্যানেস্থিসিয়াও হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসেবে এটি ব্যবহার হলেও শুধু নাইট্রাশ অক্সাইড দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া দিলে তা খুব বেশী পরিমানে দিতে হয় এবং তার ফলে অক্সিজেনের ভাগ অত্যন্ত কমে যায়। স্থতরাং রোগীর শরীরেও অক্সিজেন কম পড়তে পারে। তবে ব্যথা বেদনা উপশম এটি খুব ভাল ভাবেই করতে পারে। অবশ্য ছোটখাট অপারেশন এর সাহায্যে করা যায়। অন্য সময়ে নাইট্রাশ অক্সাইডের সংগে অন্য volatile ওষুধ পরিপূরক হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। নাইট্রাশ অক্সাইড ব্যবহারে বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে বমি হয় না। সোডা লাইমের সংগে ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যবহারের পর শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই আবার দেহ থেকে অপরিবর্তিত অবস্থায় বেরিয়ে যায়।

তবে নাইট্রাশ অক্সাইডের muscle relaxant গুণ কিছুই নেই। অনেকক্ষণ নাইট্রাশ অক্সাইড দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার পর ঐ নাইট্রাশ অক্সাইড অনেক বেশী পরিমাণে ফুসফুসে আবার চলে আসে এবং ফলে diffusion hypoxia হতে পারে। টিটেনাশ এবং পোলিও মাইলাইটিশ অসুখে অনেকদিন ধরে নাইট্রাশ অক্সাইড দিলে bone marrow depression এবং agranulocytosisও হতে পারে।

সাইক্লোপ্রোপেন (Cyclopropane) ঃ

এই সাইক্লোপ্রোপেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে Freud প্রথম প্রস্তুত করেন। আজ-কালকার ব্যবহারিক অ্যানেস্থিসিয়ায় এর প্রচলনের মূলে Lucus, Henderson, Waters এবং Rovenstine-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এটি বেশ মিষ্টি গন্ধের, বর্ণহীন গ্যাস। এটি অত্যন্ত দাহ্য এবং ভীষণ বিস্ফোরক। এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে দেড়গুণ ভারী। কমলা রঙের সিলিণ্ডারে রাখা হয়। সাধারণতঃ ৭৫ পাউণ্ড/ইঞ্চি^{২} চাপে এটি তরল অবস্থায় থাকে। এত কম চাপে থাকার জন্য Boyle apparatus-এ এর জন্য কোন reducing valve লাগে না।

এই সাইক্লোপ্রোপেন বেশ দক্ষতার সংগে অ্যানেস্থিসিয়া করে। এটি শ্বাসের সংগে নেওয়ার সময় শ্বাসনালীতে জ্বালা-যন্ত্রণা করে না। অ্যানেস্থিসিয়ার আরম্ভ খুব ভালভাবে এবং তাড়াতাড়ি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিপ্রকৃতি একটু কমতে পারে। শ্বাসনালীতে secretion খুব একটা বাড়ে না। রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে। নাড়ীর গতি একটু কমে যেতে পারে—নানারকম dysrhythmia অবশ্য নানা কারণে হতে পারে—যেমন সাইক্লোপ্রোপেনের অত্যধিক মাত্রা, অ্যানেস্থিসিয়ার সময় অক্সিজেনের অভাব ঘটলে বা শরীরে কারবন ডাইঅক্সাইড বেশী হলে অথবা শরীরে catecholamine বেশী নিঃসৃত হলে। সাইক্লো-প্রোপেন সাধারণতঃ লিভার এবং কিডনীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে না। রোগীর হৃৎপিণ্ড এবং রক্তপ্রবাহ মোটামুটি ঠিক রাখে।

তবে সাইক্লোপ্রোপেন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি কমিয়ে দেয়। কিছু রোগীর হাঁপানির মত শ্বাসের টান হয়। অপারেশনের জায়গা থেকে বেশী রক্তক্ষরণ হতে পারে। সাইক্লোপ্রোপেন অ্যানেস্থিসিয়ার পর রোগীর হঠাৎ রক্তচাপ কমে যেতে পারে এবং রোগী খুব ছটফট করতে থাকে। একে emergence delirium বলে।

এটি কখনই ডায়াথার্মি (diathermy) করার সময় ব্যবহার করা উচিত নয়—বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। হাঁপানী রোগীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিষেধ। সাইক্লোপ্রোপেন অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীকে এডরেনালিন বা ঐ জাতীয় ওষুধ দেওয়া উচিত নয়।

ইথার (Ether) :

ইথার বর্ণহীন ঝাঁঝালো গন্ধের volatile অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। ইথারের ভেপার বাতাস থেকে প্রায় আড়াইগুন ভারী। ইথার সাধারনতঃ অ্যাম্বার রঙের বোতলে রাখা হয়। আলো, তাপ এবং বাতাসের সংস্পর্শে এটি দূষিত হয়ে যায়। ইথারের সংগে অবিশুদ্ধ জিনিষগুলির মধ্যে acetaldehyde এবং ether peroxide থাকতে পারে। এসব থাকলে ইথারের গুন অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়।

ইথার দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া দিলে রোগীর নাড়ী প্রথমদিকে বেড়ে যায়। রক্তচাপও অল্প বাড়ে, তবে পরে তা মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। খুব deep অ্যানে-স্থিসিয়াতে রক্তচাপ কমেও যেতে পারে। ইথারের ভেপার শ্বাসনালীতে

irritate করে এবং তার ফলে secretion খুব বেড়ে যায়। প্রথমদিকে রোগী কাশতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস অল্প বেড়ে যায়, পরে অবশ্য শ্বাসপ্রশ্বাস অনেক কমে যেতে পারে।

ইথার প্রথমে ব্যথা উপশম করে, পরে excitement এবং শেষে অ্যানেস্থিসিয়া করে। ইথার অ্যানেস্থিসিয়ার শেষ দিকে deep হয়ে গেলে myocardial depression হয়। ইথারে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়। শরীরের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ইথার মোটামুটি ভাল muscle relaxation করে।

ইথার মোটামুটিভাবে নিরাপদ অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি আমাদের দেশেও অপেক্ষাকৃত সস্তা। এটি হাঁপানী রোগীকেও দেওয়া চলে কেননা এটি শ্বাসনালীর মাংসপেশীকে শিথিল করে।

অবশ্য ইথার অ্যানেস্থিসিয়ার অনেক অসুবিধেও আছে। খুব বেশী salivation এবং secretion হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগী বমি করে। এর ঝাঁঝালো গন্ধ রোগী সহ্য করতে পারে না এবং নিতে চায় না। এর excitement stage অত্যন্ত কষ্টকর এবং বিরক্তিকর। ডায়াবেটিশ বা বহুমূত্র রোগীর ক্ষেত্রে ইথার অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া বিপজ্জনক। ইথার অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর খিঁচুনী হতে পারে। Diathermy ব্যবহারের সময় ইথার দেওয়া নিষেধ কেননা ইথার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ঃ

ক্লোরোফর্ম একটি মিষ্টিগন্ধের বর্ণহীন volatile (উদ্বায়ী) অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি তরল অবস্থায় বোতলে থাকে। এর ভেপার বাতাস থেকে প্রায় ৪ গুণ ভারী। এটি দাহ্য নয় কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে এলে phosgene নামক একটি বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। এটি বিস্ফোরন ঘটায় না।

ক্লোরোফর্ম একটি ভাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি শ্বাসনালীতে বিশেষ কোন irritation করে না। এটি শ্বাসনালীর মাংশপেশীকে শিথিল করে। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়াতে হৃৎপিণ্ডের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে। Myocardial depression হয়, রক্তচাপ কমে যায়। Dysrhythmia হতে পারে, এমন কি হঠাৎ হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে পারে। সেজন্য এটি খুবই সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। কৃত্রিমভাবে ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ডের কাজ চালানোর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন এই ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময়। লিভারের উপর

বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ার পরে বিলম্বিত ক্লোরোফর্ম poisoning হতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর বমি হওয়ার ঘটনা বেশ বেশী। এটিও রক্তে গ্লুকোজ বাড়ায় সুতরাং ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগীকে ক্লোরোফর্ম দেওয়া উচিত নয়। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ায় মাংসপেশীর শিথিলতা (muscle relaxation) ভালই হয়।

আধুনিককালে ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়া একেবারেই কমে গেছে। ক্লোরোফর্ম open method-এও দেওয়া যায়। আবার Boyle apparatus-এর সাহায্যে অক্সিজেন, নাইট্রাস অক্সাইড আর ক্লোরোফর্ম দিয়ে ভালো অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যায়। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় রোগীর যাতে অক্সিজেনের অভাব (hypoxia), কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য (hypercarbia) এবং অত্যধিক রক্তচাপহ্রাস (hypotension) না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ট্রাইক্লোরোএথিলিন (Trichloroethylene) :

ট্রাইক্লোরোএথিলিন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে Fischer কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এটি প্রথম দিকে নানা রকম কলকারখানায় পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হোত। Lehman ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাইক্লোরো এথিলিন দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া করার কথা বলেন। Dennis Jackson ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবহারিক অ্যানেস্থিসিয়ায় এর ব্যাপক প্রচলন করেন।

ট্রাইক্লোরোএথিলিন একটি বর্ণহীন তরল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটিতে waxoline blue dye দিয়ে রঙ করা থাকে—যাতে সহজেই ওষুধটিকে চেনা যায়। এটি মোটেই দাহ্য নয়—বিস্ফোরকও নয়। এর boiling point প্রায় ৮৬° সেলসিয়াস। সুতরাং এটি ঠিক open method-এ ব্যবহার করা যায় না। কলকারখানায় ব্যবহারের জন্য যে ট্রাইক্লোরোএথিলিন বাজারে চালু আছে তা কখনই অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

ট্রাইক্লোরোএথিলিন কখনই closed circuit-এ ব্যবহার করা উচিত নয়, কেননা সোডা লাইমে এটি dichloroacetylene তৈরী করে—যার বিষক্রিয়ায় রোগীর নানান উপসর্গ, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এটি দাহ্য নয় এবং বিস্ফোরণও ঘটায় না।

ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে ট্রাইক্লোরোএথিলিন বেশ কার্যকরী। অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসেবেও এটি বেশ ভালো। এটি রোগী সহজভাবেই শ্বাসের সংগে নিতে

পারে। তবে অ্যানেস্থিসিয়া বেশী deep হলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেশ বেড়ে যায়। রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে। নাড়ীর গতি কমতে পারে—dysrhythmiaও হতে পারে। Muscle relaxation খুব ভালো হয় না। শ্বাসনালীর secretion খুব একটা বাড়ে না। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে বমি বড় একটা হয় না।

ট্রাইক্লোরোএথিলিন লিভার এবং কিডনীর খুব একটা ক্ষতি করে না। এটি বেশীর ভাগ অপরিবর্তিত অবস্থায় শরীর থেকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই বেরিয়ে যায়, তবে খানিকটা প্রস্রাবের সংগেও কয়েকদিন ধরে বেরিয়ে যায়।

ট্রাইক্লোরোএথিলিন প্রসব-বেদনা কমানোর জন্যও ব্যবহার হয়। এই অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর খুব বেশী উপসর্গ দেখা দেয় না। তবে এটি কখনই closed circuit-এ ব্যবহার করা উচিত নয়।

আধুনিককালে ট্রাইক্লোরোএথিলিনের ব্যবহার অনেক কমে গেছে, বিশেষতঃ হ্যালোথেন আবিষ্কারের পরে। কিন্তু কিছু অসুবিধা থাকা সত্বেও এটি একটি ভালো অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এবং কিছুটা সস্তাও বটে।

হ্যালোথেন (Halothane) :

হ্যালোথেন প্রথম প্রস্তুত করেন Suckling ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। অ্যানেস্থিসিয়ায় এর ব্যবহার করেন Raventos এবং Johnstone। এটি একটি বর্ণহীন মিষ্টি গন্ধের তরল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এর boiling point ৫০° সেলসিয়াস। এটি সাধারণতঃ অ্যাম্বার রঙের বোতলে রাখা হয়, নতুবা আলোর প্রভাবে এটি সামান্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বোতলে হ্যালোথেনের সংগে ০·০১% thymol মিশিয়ে রাখা হয় তার স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য। এটি মোটেই দাহ্য নয় এবং কখনই বিস্ফোরণ ঘটায় না। এটি ভালোভাবে closed circuit-এ সোডা লাইমের সংগে ব্যবহার করা যায়।

হ্যালোথেন বেশ ভালো অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। রোগী বেশ ভালোভাবে শ্বাসের সংগে নেয়—অ্যানেস্থিসিয়া খুব তাড়াতাড়ি হয়। শ্বাসনালীতে কোন irritation হয় না। Salivation এবং secretion খুব একটা বাড়ে না। হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস একটু কমে যায়। নাড়ীর গতি কমে যায়—রক্তচাপও কমে। অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার আগে রোগীকে এট্রোপিন দেওয়া উচিত। হ্যালোথেন ভালো muscle relaxation করতে পারে না।

হ্যালোথেন হৃৎপিণ্ডকে অবদমন করে। নানারকমের dysrhythmia

করতেও পারে, এমনকি ventricular fibrillation পর্যন্ত হতে পারে। হ্যালোথেন কিডনীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না করলেও লিভারে বিষক্রিয়া করতে পারে। অত্যধিক হ্যালোথেন uterine relaxation করতে পারে।

হ্যালোথেন সাধারণতঃ বেশীর ভাগই অপরিবর্তিত অবস্থায় বেরিয়ে যায় শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে। হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর বমি খুব একটা হয় না। তবে হঠাৎ কাঁপুনি বা halothane shakes হতে পারে।

মোটের উপর হ্যালোথেন বেশ জনপ্রিয় অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এতে রোগীর জ্ঞানও বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। হ্যালোথেন ব্যবহারের জন্য Goldman vaporizer বা Fluotec vaporizer ব্যবহার করা হয়।

তবে এর অনেক অসুবিধাও আছে। এটি বেশ দামী ওষুধ। হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ার সময় রক্তচাপ অনেক কমে যেতে পারে। অপারেশনের পরে রোগীর অস্থিরতা বাড়ে, কেননা অ্যানোস্থিসিয়া শেষ হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে এবং রোগী ব্যথা অনুভব করে।

মেথোক্সিফ্লুরেন (Methoxyflurane) :

এটি একটি halogenated ইথার। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে Artusio এবং তাঁর সহকর্মীরা সর্বপ্রথম অ্যানেস্থিসিয়ায় মেথোক্সিফ্লুরেন ব্যবহার করেন। এটি একটি স্বচ্ছ, রংহীন, তরল volatile অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটির বেশ মিষ্টি গন্ধ আছে। এর molecular weight ১৬৪ ; specific gravity ১'৪৩ এবং boiling point ১০৪'৮° সেন্টিগ্রেড। এটি সাধারণ ভাবে দাহ্য নয় এবং এটি বিস্ফোরণও ঘটায় না। এটি সোডা লাইমের সংগে কোন বিক্রিয়া ঘটায় না। তবে এটি রবারকে নষ্ট করে। আলো, বাতাস এবং অক্সিজেনে এটি ভালই থাকে, নষ্ট হয় না।

মেথোক্সিফ্লুরেন বেশ ভালোভাবে ব্যথা-বেদনা দূর করে এবং অ্যানেস্থিসিয়া সৃষ্টি করে। এটির খুব কম volatilityর জন্য রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া খুব ধীরে হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার deep plane-এ রোগীর muscular relaxation খুব ভালো হয়।

মেথোক্সিফ্লুরেন সাধারণতঃ cardiac output কমিয়ে দেয় এবং রক্তচাপ কমে যায়। নাড়ীর গতি মোটামুটি ঠিক থাকে, তবে রোগীর hypoxia বা hypercarbia থাকলে arrhythmia হতে পারে। এই অ্যানেস্থিসিয়ায় sympathetic tone বাড়ে না এবং রক্তপ্রবাহে catecholamineও বাড়ে না। মেথোক্সিফ্লুরেন অ্যানেস্থিসিয়ায় এডরেনালিন infiltrate করলে খুব একটা ক্ষতি হয় না।

এর অত্যধিক (deep) অ্যানেস্থিসিয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা (blood sugar level) বেড়ে যায়। মেথোক্সিফ্লুরেন লিভারে সাধারণতঃ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। তবে এর renal toxic effect আছে। High output renal insufficiency হতে পারে এবং তার ফলে প্রথম দিকে খুব বেশী প্রস্রাব হয়। Vasopressin এই সব ক্ষেত্রে দিলে বিশেষ কোন কাজ হয় না।

মেথোক্সিফ্লুরেন অ্যানেস্থিসিয়ার পরবর্তী উপসর্গ (complication) হিসাবে cardiac arrest, malignant hyperpyrexia, delayed recovery, emergence delirium হতে পারে।

মেথোক্সিফ্লুরেন বেশীর ভাগ শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তবে কিছু পরিমাণে লিভারে biotransformation হয় এবং সেই metabolites-গুলি প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যায়। অ্যানেস্থিসিয়ার পরবর্তী ১২ দিন পর্যন্ত প্রস্রাবের সংগে সেই সব metabolite বেরুতে পারে।

এনফ্লুরেন (Enflurane):

এটি একটি fluorinated ইথার। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে Dobkin এবং তাঁর সহকর্মীরা এটি অ্যানেস্থিসিয়ায় প্রথম প্রবর্তন করেন। এটি হ্যালোথেনের মত তরল volatile অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এর specific gravity ১·৫ এবং এর boiling point ৫৬·৫° সেন্টিগ্রেড। এটি বাতাস বা অক্সিজেনে দাহ্য নয়। এটি আলোয়, বাতাসে এবং তাপে মোটামুটি ঠিক থাকে। এটি সোডালাইমের সংগে ব্যবহার করা যায়। এটির কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে হ্যালোথেনের অর্ধেক।

এটি ব্যথা-বেদনা দূর করে, ভালোভাবে muscular relaxation করে। এটি কিউর্যারির কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে দেয়। এনফ্লুরেন শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত করে না। এটি স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের minute volume মোটামুটি অব্যাহত রাখে। এতে salivation, laryngospasm, কাশি এবং দম বন্ধ রাখা (breath holding) ইত্যাদি খুবই কম হয়।

এনফ্লুরেন অ্যানেস্থিসিয়ায় নাড়ীর গতি দ্রুত হয়—রক্তচাপ অত্যধিক কমে যেতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রায় বিশেষ তারতম্য ঘটে না। Arrhythmia হ্যালোথেনের চেয়ে কম হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর বমি প্রায়ই দেখা যায়।

এনফ্লুরেন অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীর খিঁচুনি (convulsion) হতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে ১৬ দিন পর্যন্ত এই খিঁচুনি হলেও হতে পারে। এই অ্যানেস্থিসিয়ায় polyuric renal failure এবং hepatocellular dysfunction হতে পারে। এটি Caesarean section-এ দেওয়া যেতে পারে, মা এবং শিশুর কোন ক্ষতি হয় না। তবে অত্যধিক uterine relaxation হতে পারে।

এনফ্লুরেন প্রায় সবই শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তবে অল্প মাত্রায় লিভারে biotransformation হয় এবং এর metaboliteগুলি প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যায়।

কয়েকটি intravenous অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ

থায়োপেন্টোন (Thiopentone) :

শিরাপথে দেওয়ার জন্য অ্যানেস্থিসিয়ার এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ওষুধ। এটি বারবিচুরেট ওষুধ এবং খুব অল্প সময়ের জন্য শরীরে কার্যকরী থাকে। এটি অ্যাম্পুলে হলদে রঙের পাউডার হিসাবে থাকে। এতে হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ থাকে। ইঞ্জেকশনের জল দিয়ে এটি দ্রবীভূত করা হয় এবং মোটামুটি ২·৫% সলিউশনে এর ব্যবহার করা হয়। এটি খুব ক্ষার (alkaline) এবং এর pH প্রায় ১০·৮।

থায়োপেন্টোন শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেবার প্রায় সংগে সংগেই রোগীর ঘুম আসে এবং ক্রমশঃ সংজ্ঞা লোপ পায়। এটি মস্তিষ্ক অবদমিত করে। শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যায়। তবে প্রথম দিকে হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হওয়া, শ্বাসের টান হওয়া ইত্যাদি হতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এবং গভীরতাও কমে যায়।

মস্তিষ্কস্থিত ascending reticular activating system খুবই অবদমিত হয়। রোগীর বমি হতে পারে। Intracranial প্রেসার কমে যায়। হৃৎপিণ্ডের উপর এর বেশ প্রভাব পড়ে। রক্তচাপ কমে যায়। হৃৎপিণ্ডের অসুখের রোগীর ক্ষেত্রে এ ওষুধটি বিপজ্জনক হতে পারে। থায়োপেন্টোন ভালো muscle relaxation করে না। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এটি placental barrier দিয়ে যেতে পারে এবং গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করতে পারে। এতে কখনও কখনও hypersensitivity reaction এবং skin reaction হতে পারে।

থায়োপেন্টোন কতটা কাজ করবে তা সাধারণতঃ নির্ভর করে মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহের উপর এবং তার fat solubilityর উপর। শিরায় ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর খুব তাড়াতাড়ি এই ওষুধ মস্তিষ্কে চলে যায়, কেননা মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ খুবই বেশী এবং এর স্নেহজাতীয় পদার্থও বেশ বেশী। এই ওষুধ রক্ত থেকে মস্তিষ্কে অনায়াসে যেতে পারে এবং অল্প সময়েই রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু এটি মস্তিষ্কে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, কেননা শরীরের অন্য যায়গায় বিশেষতঃ যে সব জায়গায় চর্বি বেশী আছে সেখানে এই ওষুধ redistributed হয়। শরীরে চর্বিজাতীয় পেশীতে রক্তপ্রবাহ কম থাকার জন্য এই redistribution খুব আস্তে আস্তে হয়। ইতিমধ্যে মস্তিষ্কে থায়োপেন্টোনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় রোগীর জ্ঞান খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

থায়োপেন্টোন শরীরে পুরোপুরি বিপাক (metabolism) হয় এবং তা বেশীর ভাগ হয় লিভারে। অবশ্য কিডনী এবং মাংসপেশীও এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ সাহায্য করে।

এই ওষুধটি অ্যানেস্থিসিয়া শুরু করার জন্যই ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। তবে খুব ছোটখাট অপারেশনের ক্ষেত্রে একমাত্র অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবেও এটি ব্যবহার করা যায়। টিটেনাস ইত্যাদিতে খিঁচুনী কমানোর জন্যও এই ওষুধ ভালোভাবে ব্যবহার হয়।

থায়োপেন্টোন যে কোন রোগীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়, তবে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বিচার সাপেক্ষ। একেবারে শিশুরা বা অতি বৃদ্ধরা এটি ভালো সহ্য করতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের অসুখে, হাঁপানি ইত্যাদি অসুখে এর ব্যবহার সীমিত। লিভার এবং কিডনী খারাপ থাকলে এর ব্যবহার ভেবেচিন্তে করতে হবে। যেখানে রোগীকে পুনরুজ্জীবন (resuscitation) করার ব্যবস্থা নেই সেখানে থায়োপেন্টোন ব্যবহার না করাই উচিত।

থায়োপেন্টোন ব্যবহারের সুবিধে অনেক। এমন সুন্দর সহজভাবে অ্যানেস্থি-সিয়ার শুরু প্রায় অন্য কিছুতেই হয় না। তাড়াতাড়ি এবং সহজভাবে রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে। এতে রোগী স্বাচ্ছন্দ্যও অনেক বেশী। কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াও তুলনামূলকভাবে এতে অনেক কম।

তবে কিছু অসুবিধাও আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কমে যায়। রক্তচাপও অনেক কমে যেতে পারে। এটি ব্যথাবেদনা উপশম করতে পারে না, উপরন্তু

ব্যথার অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেয়। হাঁপানির টান ঘটাতে পারে। অ্যালার্জি এবং anaphylactic reaction হতে পারে।

থায়োপেন্টোন ইঞ্জেকশনের সময় শিরার বাইরে কোনক্রমে গেলে স্থানীয় প্রদাহ সৃষ্টি করে। সে জায়গার চামড়া এবং স্থানীয় পেশীগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। Thrombophlebitis হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে সব থেকে অসুবিধা যদি কোন কারণে না জেনেশুনে arteryর মধ্যে ইঞ্জেকশন হয়ে যায়। এর ক্ষারীয় দ্রাবণ arteryতে প্রচণ্ড সংকোচন ঘটায়। থায়োপেন্টোন arteryর মধ্যে precipitate করে, ফলে রক্তপ্রবাহ কমে যায়, এমন কি বন্ধও হতে পারে। রোগীর ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময়েই হাতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। হাতের চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নাড়ী প্রায় পাওয়াই যায় না, পরে হাতে পচন (gangrene) পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং এ অবস্থা যাতে কখনই না ঘটে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। ২·৫% দ্রাবণ খুব আস্তে আস্তে দেওয়া উচিত। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় রোগী হাতে ব্যথার কথা বললে তৎক্ষণাৎ সাবধান হওয়া উচিত। আর চিকিৎসার জন্য হেপারিন (heparin) ব্যবহার করা যেতে পারে। রক্তনালী প্রসারণ ঘটানোর জন্য brachial plexus block করলে উপকার হতে পারে। অনেক সময় প্রোকেন বা প্যাপাভেরিন intra-arterial ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

মেথোহেক্সিটোন (Methohexitone) :

এটি একটি মেথিলেটেড অক্সিবারবিচুরেট। এটিরও শরীরের উপর কার্যকারিতা খুবই অল্প সময়ের জন্য। এটি অ্যাম্পুলে পাউডার হিসেবে থাকে। সাধারণভাবে ১% দ্রাবণে ব্যবহার করা ভালো। মেথোহেক্সিটোন থায়োপেন্টোন থেকে প্রায় ৩ গুণ কার্যকরী।

ইঞ্জেকশন দেবার পর মেথোহেক্সিটোন ঘুম পাড়ায় এবং ভালো অ্যানেস্থিসিয়া করে। শ্বাসপ্রশ্বাস অল্প কমে যায়, কাশি এবং হিক্কাও হতে পারে, এমনকি হঠাৎ শ্বাসবন্ধ হয়ে যেতেও পারে। রক্তচাপ অল্প কমে। অ্যানেস্থিসিয়া বেশ তাড়াতাড়িই হয়, আবার জ্ঞানও ফিরে আসে অল্প সময়ে। এটি লিভারে বিপাক (metabolised) হয়। মেথোহেক্সিটোন এখন আর বিশেষ ব্যবহার হয় না। তবে অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করার ক্ষেত্রে এবং ছোট অপারেশনের সময় এটিকে এককভাবে ব্যবহার করা যায়।

প্রোপানিডিড (Propanidid) :

এটি একটি eugenol জাতীয় ঔষধ। এটি অ্যাম্পুলে সামান্য হলদে রঙের তরল অবস্থায় থাকে, ৫% দ্রাবণে ১০ মি. লি. পরিমাণে। অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় ৫ থেকে ১০ মি. গ্রা./কে. জি. ইণ্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। অবশ্য পরে দরকার মত আবার দেওয়া যায়।

শিরাপথে দেওয়ার পর ৩ থেকে ৫ মিনিটের জন্য রোগীর সম্পূর্ণ অ্যানেস্থিসিয়া হয়। ছোটখাট অপারেশন যেমন দাঁত তোলা, ফোঁড়া কাটা ইত্যাদি করা যেতে পারে। এই ওষুধের কার্যকারিতা খুব অল্প সময়ের জন্য, তারপর রোগীর জ্ঞান একেবারে ফিরে আসে—কোন রকম ঝিমুনী একেবারেই থাকে না। তাই আউটডোরে এই অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার পর কোন রকম সাহায্য ছাড়াই রোগীকে বাড়ী পাঠানো যেতে পারে।

Propanidid প্রথম দিকে শ্বাসপ্রশ্বাস বাড়িয়ে দেয় তবে একটু পরেই কিন্তু কমে যেতে পারে। নাড়ীর গতি বেড়ে যায় এবং রক্তচাপ অল্প কমে। একটু অস্বাভাবিক muscular movement হতে পারে। এটির ব্যবহারে লিভারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে বমি বড় একটি হয় না।

লিভার ও রক্তের এষ্টারেজ্ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি প্রোপানিডিড নষ্ট হয়ে যায়, তাই রোগীর জ্ঞান বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। এই ওষুধ দিয়ে ছোট অপারেশনের ক্ষেত্রে এককভাবে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যায়। তবে অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করার ওষুধ হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার আছে।

কেটামিন (Ketamine) :

এটি একটি নতুন অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে Domino এবং Corssen এটি আবিষ্কার করেন। এটি ১% দ্রাবণে শিরাপথে এবং মাংসপেশীতেও ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হয়। শিরাপথে ২ মি. গ্রা./কে. জি. হিসাবে দিলে প্রায় ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে অ্যানেস্থিসিয়া শুরু হয় এবং ৫ থেকে ৮ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পুরোপুরি অ্যানেস্থিসিয়া হয়—অন্য কোন ওষুধের দরকার হয় না। দরকার মত পরে আবার মাঝে মাঝে এই ওষুধ দিলে অ্যানেস্থিসিয়া অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দিলে সাধারণতঃ ৮ মি. গ্রা. প্রতি কে. জি. হিসেবে দেওয়া হয়। এতে অ্যানেস্থিসিয়া ৩ মিনিটের মধ্যে আরম্ভ হয় এবং প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।

কেটামিন রোগীকে ঘুম পাড়ায়, ব্যথা-বেদনা উপশম করে, অ্যানেস্থিসিয়া করে। এর ফলে নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ বেড়ে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস খুব একটা পরিবর্তন হয় না। মাংসপেশীর শিথিলতা খুব একটা হয় না। কিন্তু অস্বাভাবিক muscular movement হতে পারে। এটি শিশুদের ক্ষেত্রে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। Surface অপারেশন কেটামিনের সাহায্যে ভালই করা যায়। যে সব ক্ষেত্রে Boyle অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিন পাওয়া দুর্লভ সেখানে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

তবে কয়েকটি অসুখের ক্ষেত্রে এই কেটামিন ব্যবহার না করাই শ্রেয়। যেমন—অত্যধিক রক্তচাপ, অ্যালকোহলে আসক্ত, thyrotoxicosis এবং upper airway obstruction-এর রোগীদের ক্ষেত্রে। কেটামিন আমাদের দেশে বেশী পাওয়া যায় না—দামও বেশী। কেটামিন অ্যানেস্থিসিয়ার পর রোগী নানারকম ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে পারে এবং hallucination বা মতিভ্রম হতে পারে। তবে ভালো প্রাক্‌-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে তা অবশ্যই কমানো যেতে পারে।

কেটামিন ব্যবহার করার সুবিধা এই যে এটি এককভাবে অ্যানেস্থিসিয়া করতে পারে—কোন endotracheal intubation লাগে না। কোন ভারী যন্ত্রপাতি, গ্যাস সিলিণ্ডার লাগে না। কেটামিন হৃৎপিণ্ড, লিভার এবং কিডনীর উপর কোন বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে না।

অ্যালথেসিন (Althesin) ঃ

এটিও একটি নতুন অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি steroid জাতীয় ওষুধ এবং শিরাপথে দিতে হয়। ০·০৫ মি. লি. থেকে ০·০৭৫ মি. লি./কে. জি. হিসেবে দেওয়া হয়। এটি দেওয়ার প্রায় সংগে সংগেই অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ হয় এবং প্রায় ৩ থেকে ৬ মিনিট স্থায়ী হয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে নাড়ীর গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অল্প বেড়ে যেতে পারে, তবে রক্তচাপ অল্প কমে যায়।

অ্যালথেসিন রক্তনালীতে বিশেষ irritation করে না। কিউর্‌্যারি এবং প্যানকিউরোনিয়ামের muscle relaxation effect একটু বাড়িয়ে দেয়। অস্বাভাবিক muscular twitching হতে পারে। Histamine release হতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার পর বমি হয় না। জ্ঞান খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসে এবং কোন রকমের ঝিমুনী ভাব থাকে না। অ্যালথেসিন ছোট অপারেশনের ক্ষেত্রে এককভাবে ব্যবহার করা হয়।

মাংসপেশী শিথিলকারী ঔষধপত্র (Muscle Relaxants)

এই ওষুধগুলি skeletal muscleকে শিথিল বা relaxation করে। Neuromuscular transmissionকে কোন না কোন রকমে ব্যাহত ক'রে সাধারণভাবে এই মাংসপেশীর শিথিলতা আনা হয়। স্বাভাবিকভাবে একটি nerve impulse এই neuromuscular transmission-এর সাহায্যেই মাংসপেশীর সংকোচন ঘটায়।

সচরাচর একটি motor nerve fibre অনেক শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয় এবং শেষে মাংসপেশীর কাছে motor end plate-এ শেষ হয়। নিয়মমাফিক একটি nerve impulse-এর ফলে motor end plate-এ acetyl choline নিঃসৃত হয়। তখন ওখানে একটি বৈদ্যুতিক আলোড়ন বা action potential সৃষ্টি হয়। এই potential চলাকালে এবং পরবর্তী সংকোচনের মধ্যে মাংসপেশী polarised অবস্থায় থাকে। সংকোচনের পরই এটি depolarised হয় এবং সে সময় কোন ক্রমেই সংকোচন হয় না, যতক্ষণ না cholinesterase নিঃসৃত acetylcholineকে নষ্ট করে ফেলে।

Muscle relaxant ওষুধগুলি সাধারণতঃ দুভাবে neuromuscular transmissionকে ব্যাহত করে।

১। Non-depolarizing muscle relaxant : এতে competitive block হয়। এই ধরনের ওষুধ acetylcholine-এর সংগে প্রতিযোগিতা করে এবং motor end plate-এর receptor-এ acetylcholine যেতে পারে না। ফলে মাংসপেশীতে সংকোচন হয় না। গ্যালামিন, টিউবো কিউর্যারিন, প্যানকিউ-রোনিয়াম ইত্যাদি এই ধরনের ওষুধ।

২। Depolarizing muscle relaxant : এতে যেন acetylcholine-এর effect অত্যন্ত বেশী হয়। নিয়মমাফিক মাংসপেশী সংকোচনের পরে depolarised অবস্থায় মাংসপেশী একেবারে শিথিল অবস্থায় থাকে। এই ধরনের ওষুধের ফলে মাংসপেশীকে বেশ কিছুক্ষণ depolarised রাখতে সাহায্য করে, ফলে সে সময় কোন রকমেই সংকোচন ঘটে না। সাক্সামেথোনিয়াম, ডেকামেথোনিয়াম ইত্যাদি এই ধরনের ওষুধ।

কিউর্যারি (Curare) :

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা তীরের ফলায় কিউর্যারিকে বিষের মত

ব্যবহার করতো। তারা বাঁশের টিউবের মধ্যে এই বিষ রাখতো তাই এর নাম tubocurarine। Sir Walter Raleigh ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এর ব্যবহারের কথা প্রথম বলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে Claude Bernard, neuromuscular junction-এর উপর কিউর্যারির প্রভাবের কথা বলেন। Griffith এবং Johnstone ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানেস্থিসিয়াতে এর ব্যাপক ব্যবহার করেন।

এটি একটি ভালো non-depolarizing muscle relaxant। Endotracheal intubation-এর সময় ১৫ থেকে ৩০ মি. গ্রা. শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যে সব মাংসপেশী একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে এবং প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী থাকে। Neostigmine এই কিউর্যারির প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এটি কোন ব্যথা উপশম করে না বা অ্যানেস্থিসিয়াও করে না। এটি histamine release করে এবং রক্তচাপ কমায়। কিউর্যারি প্রধানতঃ কিডনী দিয়ে বেরিয়ে যায়, তবে অল্প পরিমাণে লিভারেও নষ্ট হয় এবং কিছুটা পিত্তরসে নির্গত হয়।

কিউর্যারি ভালোভাবে endotracheal intubation-এর জন্য ব্যবহার করা হয়। অপারেশনের সময় muscle relaxation-এর জন্য ব্যবহার হয়। আবার টিটেনাস, মায়োসাইটিস ইত্যাদি অসুখে চিকিৎসার জন্যও এর ব্যাপক ব্যবহার আছে।

গ্যালামিন (Gallamine) :

এটি একটি synthetic non-depolarizing muscle relaxant। Bovet এটি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তৈরী করেন এবং Huguenard ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানেস্থিসিয়ায় প্রথম ব্যবহার করেন।

এটি বেশ ভালোভাবে মাংসপেশীর শিথিলতা আনতে পারে। সাধারণতঃ endotracheal intubation-এর জন্য ৮০ থেকে ১২০ মি. গ্রা. শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এটির কাজ ১ থেকে ২ মিনিটের মধ্যেই হয় এবং প্রায় ২০ মিনিট স্থায়ী থাকে। Neostigmineএর প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার হয়।

গ্যালামিন নাড়ির গতি বাড়ায়। রক্তচাপও অল্প বাড়তে পারে। Histamine release খুব কম—নামমাত্র। এটি গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে placental barrier দিয়ে যেতে পারে এবং Caesarean section-এর পর শিশুর ক্ষতি

করতে পারে। এই ওষুধের প্রায় সবটাই অপরিবর্তিত অবস্থায় কিডনী দিয়ে বেরিয়ে যায়। সুতরাং কিডনীর অসুখে এর ব্যবহার নিরাপদ নয়।

অ্যালকিউরোনিয়াম (Alcuronium) ঃ

এটিও synthetic non-depolarizing muscle relaxant। এটি toxiferin থেকে তৈরী হয়। এটি শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়ার ৩ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যেই মাংশপেশীর শিথিলতা আনে এবং থাকে প্রায় ২০ মিনিট।

এটি histamine release প্রায় করেই না। তবে রক্তচাপ একটু কমতে পারে, কেননা এর অল্প ganglion blocking effect আছে। এটি হাঁপানি রোগীকেও ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে এর বিশেষ প্রচলন নেই।

প্যানকিউরোনিয়াম (Pancuronium) ঃ

এটি একটি নতুন non-depolarizing muscle relaxant। আমাদের দেশেও এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এটি মোটামুটি ০.১ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যেই মাংসপেশীর শিথিলতা আসে এবং প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।

প্যানকিউরোনিয়াম histamine release খুব কম করে। রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে, বরং একটু বেড়েও যেতে পারে। লিভারের অসুখে, হৃৎপিণ্ডের অসুখে, হাঁপানিতে প্যানকিউরোনিয়াম নিরাপদে দেওয়া যায়। এর বেশীর ভাগ কিডনী দিয়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় বেরিয়ে যায়। সুতরাং কিডনীর অসুখে প্যানকিউরোনিয়াম সাবধানে দেওয়া উচিত। অবশ্য পিত্তরসেও এর কিছুটা নির্গত হয়।

সাক্সিনিলকোলিন (Succinylcholine) :

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Bovet সর্বপ্রথম succinylcholine-এর neuromuscular blocking action-এর কথা বলেন। ব্যবহারিক অ্যানেস্থিসিয়াতে এর প্রচলন করেন Von Dardel এবং Mayerhofer ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। এটি depolarizing muscle relaxant। এটি শরীরের pseudocholinesterase-এর সাহায্যে নষ্ট হয়। Endotracheal intubation-এর জন্য এই ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ ৫০ থেকে ৭৫ মি. গ্রা. শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ১ মিনিটের মধ্যেই মাংসপেশীর শিথিলতা আসে এবং ৩ থেকে ৫ মিনিট স্থায়ী হয়। মাংসপেশীর এই শিথিলতা আসার আগে শরীরে বিশেষতঃ হাতে

পায়ে এবং মুখের মাংসপেশীতে কাঁপুনি হয়। এর জন্ম পরে গোটা শরীরের মাংসপেশীতে বেশ ব্যথা-বেদনা হয়।

এই ওষুধ ব্যবহারের ফলে salivary এবং gastric secretion বাড়ে। নাড়ীর গতি বেশ কমে যায়, রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। সাধারণভাবে এটি placental barrier দিয়ে না যাওয়ার জন্ম Caesarean sectionএ নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

তবে এর ব্যবহারে রক্তের পটাশিয়াম বেশ বেড়ে যেতে পারে। চোখের এবং পাকস্থলীর মধ্যকার চাপ বেশ বেড়ে যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগীর প্রচণ্ড জ্বর (malignant hyperpyrexia) হতে পারে।

কোন কোন সময়ে রোগীর অনেকক্ষণ muscle paralysis থাকতে পারে, বিশেষতঃ যাদের শরীরে cholinesterase level অত্যন্ত কম অথবা যাদের abnormal pseudocholinesterase gene আছে তাদের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে দরকার মত কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাজা রক্ত সঞ্চালন এক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী।

নিওস্টিগমিন (Neostigmine) :

Non-depolarizing muscle relaxant ওষুধের প্রতিষেধক হিসেবে neostigmine-এর ব্যবহার খুব ব্যাপক। এটি একটি anticholinesterase। Neostigmine, cholinesterase-কে নষ্ট করে, ফলে aectylcholine নষ্ট হতে পারে না। সুতরাং শরীরে বেশী acetylcholine জমতে সাহায্য করে এবং তা myoneural junction-এ কিউর‍্যারিকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তার ফলে স্বাভাবিক ভাবে মাংসপেশীর সংকোচন ঘটে।

অ্যানেস্থিসিয়া শেষ হওয়ার পরও যদি কিউর‍্যারি জাতীয় ওষুধের কার্যকারিতা থাকে, যদি রোগী পর্যাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস না নিতে পারে তবে neostigmine দিয়ে তাকে decurarise করা হয়। সাধারণতঃ ১ থেকে ২·৫ মিলিগ্রাম শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। কতটা দিতে হবে তা নির্ভর করে কতটা muscle relaxant-এর effect আছে। Neostigmine বেশী salivation এবং secretion করে, নাড়ীর গতি অনেক কমে যায়। সুতরাং এ ওষুধ দেওয়ার আগে এট্রোপিন সালফেট শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া একান্ত উচিত।

এড্রোফোনিয়াম (Edrophonium)

এটি একটি synthetic anticholinesterase। এটিও non-depolarizing muscle relaxant-এর প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এর কার্যকারিতা খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে—প্রায় ৫ মিনিট। সুতরাং পরে আবার muscle relaxant এর effect ফিরে আসতে পারে—একে recurarisation বলে। সুতরাং রোগীর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং দরকার মত বারবার edrophonium দিতে হতে পারে। Edrophonium দেওয়ার আগেও এট্রোপিন সালফেট ইঞ্জেকশন দিয়ে নেওয়া উচিত। Edrophonium সাধারণভাবে ১০ থেকে ১৫ মিলিগ্রাম শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

একাদশ অধ্যায়

শ্বাসগ্রহণযোগ্য (inhalational) অ্যানেস্থিসিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া

অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলি, বিশেষতঃ যে সব ওষুধ শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে নেওয়া হয় (inhalational), সেগুলির কিছু সাধারণ ধর্ম আছে এবং শরীরে সেগুলি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রত্যেক ওষুধই যে ভাবেই হোক না কেন—narcosis বা অজ্ঞানাবস্থা সৃষ্টি করে।

এই সব অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলি সাধারণতঃ lipoid soluble হয়। যে ওষুধ যত ভালো অ্যানেস্থেসিয়ার ওষুধ, সে ওষুধ তত বেশী lipoid soluble। কিন্তু কিছু water solubility থাকাও একান্ত দরকার—এতে ওষুধটি শরীরের প্রতিটি জীবকোষে যেতে পারে। এই সব ওষুধের বেশী lipoid-water ratio থাকার জন্য এগুলি nerve tissue এবং মস্তিষ্কে বেশী যেতে পারে—অবশ্য অন্য tissueতে অপেক্ষাকৃত কম যায়। রোগীর narcosis নির্ভর করে কতটা ওষুধ মস্তিষ্কে বা নার্ভ tissueতে গেছে তার উপর। বেশীর ভাগ এই শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ একেবারেই inert অথবা খুবই কম পরিমাণে শরীরে নষ্ট হয়। এই ওষুধগুলি শরীর থেকে বের হয়ে গেলেই রোগী আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

সাধারণভাবে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ central nervous systemকে অবদমিত করে—higher centre—cerebral cortex থেকে আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় medullary vital centreগুলিতে।

Narcosis ঠিক কি ভাবে হয় সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম theory বা মতবাদের কথা বলেন, তবে ঠিক কোনটি সঠিক তা বলা অত্যন্ত কঠিন। কয়েকটি বিশেষ মতবাদ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের Quastal theoryর মতে এই অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলি শরীরের বিভিন্ন enzyme actionএর মধ্যে দিয়ে intracellular oxidationএর কিছু বাধা সৃষ্টি করে এবং তার ফলে রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া হয়।

২। Meyer Overton theoryর মতে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ lipoid soluble হওয়ার জন্য মস্তিষ্কে বেশী যায় এবং সেখানেই বেশী কাজ করার ফলে রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া হয়।

৩। Claude Bernard-এর মতবাদ বলে যে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলি শরীরের cell metabolismএ নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে। এই ওষুধগুলি কেউ colloid তৈরী করে, কেউ জীবকোষের surface tension পরিবর্তন করে, কেউ বা viscosityতে পরিবর্তন ঘটায়। এই সবের জন্যই রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া হয়।

৪। কিছু অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ nervous system-এ electric polarityর পরিবর্তন ঘটায় এবং এর ফলেই রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া হয়।

৫। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে Ferguson সর্বপ্রথম বলেন যে এই অ্যানেস্থিসিয়া যে সমস্ত ওষুধ দিয়ে হয় তা সবই সেই সব ওষুধের inert gas effect-এর জন্য।

৬। Microcrystal theory of Pauling: এই মতে অ্যানেস্থিসিয়া ওষুধের molecule, মস্তিষ্কের water molecule-এর সংগে interaction বা পারস্পরিক বিক্রিয়া হয়। এর ফলে crystal তৈরী হয়। সেই crystalগুলি cell membrane-এর ionic exchange ঘটাতে দেয় না এবং তার ফলে polarisationও হতে পারে না, এর জন্যই অ্যানেস্থিসিয়া বা narcosis হয়।

এই সমস্ত মতবাদের প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু বক্তব্য আছে কিন্তু এদের কোনটিই ঠিক সন্তোষজনকভাবে অ্যানেস্থিসিয়ার সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না।

শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে গিয়ে যে সব ওষুধ অ্যানেস্থিসিয়া সৃষ্টি করে, তারা কোন না কোন orgnaic অথবা inorganic compound-এর হয়। এদের মধ্যে কিছু ওষুধ, যেমন—নাইট্রাস অক্সাইড, সাইক্লোপ্রোপেন, ইথাইল ক্লোরাইড ইত্যাদি সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস হিসাবে পাওয়া যায়, আবার কিছু ওষুধ—যেমন ইথার, ক্লোরোফর্ম, ট্রাইক্লোরোএথিলিন, হ্যালোথেন ইত্যাদি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে। এদের মধ্যে ইথার বেশী ব্যবহার করা হয়। ইথার একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ এবং এর একটি ঝাঁঝালো (pungent) গন্ধ আছে। ক্লোরোফর্ম সাধারণতঃ মিষ্টি গন্ধের। হ্যালোথেনের গন্ধও ভালো। নাইট্রাস অক্সাইডের কোন গন্ধ নেই এবং শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার এটি বহুল ব্যবহৃত। সাইক্লোপ্রোপেন মিষ্টি গন্ধের হয় এবং ৫ atmospheric প্রেসারে সিলিণ্ডারে তরল অবস্থায় থাকে।

ইথারের boiling point ৩৪·৬° সে. এবং এটি ভাল ভেপার তৈরী করে। হ্যালোথেনের boiling point ৫০° সে.। ট্রাইক্লোরএথিলিনের boiling point বেশী—প্রায় ৮৭° সে. তাই এটি open drop method-এ ব্যবহার করার অসুবিধা আছে। গ্যাসীয় অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলি মোটামুটি stable এবং সিলিণ্ডারে যেভাবে রাখা হয় তাতে বেশী impurities থাকার সম্ভাবনা কম। নাইট্রাস অক্সাইড সাধারণতঃ ৯৯·৯% খাঁটি, অল্প নাইট্রোজেন থাকলেও থাকতে পারে। সাইক্লোপ্রোপেনে অল্প মাত্রায় propylene থাকতে পারে। এথিলিন (ethylene) যদিও এখন ব্যবহার করা হয় না, তবে এতে কারবন মনোক্সাইড বিপজ্জনকভাবে থাকতে পারে।

ইথার বাতাস, আলো এবং তাপে নষ্ট হয়ে যেতে বা decompose করতে পারে এবং এর ফলে ether peroxide অথবা acetic aldehyde থাকতে পারে। তামার সংস্পর্শে থাকলে decomposition কম হয়। ক্লোরোফর্ম তাপ এবং আলোর প্রভাবে ফস্‌জিন (phosgene) তৈরী করে, তবে ১% ইথাইল অ্যালকোহল এর মধ্যে দেওয়া থাকলে phosgene তৈরী হতে পারে না। ট্রাইক্লোরোএথিলিনে ০·০১% থাইমল দেওয়া থাকলে বিকৃতি (decomposition) কম হয়। হ্যালোথেনেও এটি ব্যবহার করা হয় এবং অ্যাম্বার রঙের বোতলে রাখা হয় যাতে বিকৃতি (decompositon) না ঘটে।

Soda lime-এর সঙ্গে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করলে ফস্‌জিন তৈরী হতে পারে। ট্রাইক্লোরোএথিলিনের সঙ্গে soda lime কখনও ব্যবহার করা উচিত নয় কেননা এতে dichloroacetylene তৈরী হয় এবং এর প্রভাবে cranial nerve leison হতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলির বেশীর ভাগই শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে নিলে ভালোভাবে শোষিত হয়—ভালোভাবে রক্তপ্রবাহে প্রবাহিত হয় এবং কোন রকমের বিপাক (metabolism) না হয়েই শরীর থেকে বের হয়ে যায়। অবশ্য কিছু পরিমাণ চামড়া, mucous membrane এবং অপারেশনের ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং বাকীটা রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে বের হয়ে যায়। এই বেরিয়ে যাওয়ার পরই রোগী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অবশ্য ট্রাইক্লোরোএথিলিন শরীরে কিছু বিপাক হয় এবং এর ফলে trichloroacetic acid প্রস্রাবের সঙ্গে অল্পমাত্রায় বেশ কিছুদিন যাবৎ বেরিয়ে যেতে থাকে।

এখন এই শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়া ঠিক কী ভাবে হয়, কী ভাবে

শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে গিয়ে শরীরের রক্তে এবং অন্যান্য system-এ যায়, সেই পদ্ধতি বা mechanism সম্বন্ধে কিছু অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

Inhalation অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ গ্যাস বা ভেপার হিসাবে দেওয়া হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার তরল ওষুধের ভেপার হতে গেলে সাধারণ বাতাস অথবা অক্সিজেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসে volatilise করা হয়। এটি সাধারণতঃ সেই তরল ওষুধের boiling point-এর উপর নির্ভর করে। Vapour concentration নির্ভর করে অনেকগুলি জিনিসের উপর—যেমন gas flow, vaporizer-এর গুণগতমান এবং কতটা তরল ওষুধ, কত তাপে এবং কতক্ষণ দেওয়া আছে—তার উপর।

রোগীর শ্বাসনালী হয়ে ফুসফুস পর্যন্ত কী ভাবে এই ভেপার যাবে তা সাধারণতঃ নির্ভর করে ঐ ভেপারের viscosity এবং densityর উপর। Viscosity যত কম হবে এবং যত বেশী হাল্কা হবে—gas flow তত বেশী সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হবে। শ্বাসনালীতে এই ভেপার যাওয়ার পরে সেখানকার বাতাসে তা অনেকাংশে dilute হয়ে যায়। এই dilution ফুসফুসের functional residual capacityর উপর নির্ভরশীল। একটি emphysema রোগীর ক্ষেত্রে এই তরলীকরণ (dilution) খুব বেশী হবে এবং তার ফলে ফুসফুসের alveoliতে সেই ওষুধের concentration ঠিক মাত্রায় আসতে বিলম্ব হবে এবং রোগীটির অ্যানেস্থিসিয়া হতেও দেরী হবে।

Boyle অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিন থেকে অ্যানেস্থিসিয়ার ভেপার ফুসফুস পর্যন্ত ভালোভাবে যেতে গেলে রোগীর ভালোমত শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া দরকার। Effective minute ventilation তাই রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এবং tidal volume-এর উপর নির্ভর করে। সুতরাং তাড়াতাড়ি অ্যানেস্থিসিয়া দিতে গেলে তাকে প্রথমতঃ ভালো পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং বেশী concentration-এর ভেপার দিতে হবে এবং সেই সংগে রোগীর pulmonary ventilationও পর্যাপ্ত থাকা দরকার। অনেক সময় irritant ভেপার দেওয়ার জন্য রোগীর কাশি হয়, বেশী salivation হয় এবং শ্বাসনালীতে কিছু বাধা এমনকি laryngospasmও হতে পারে—সেক্ষেত্রে অ্যানেস্থিসিয়ার শুরু হতে অনেক দেরী হয়।

এরপর alveoli থেকে pulmonary epithelium হয়ে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ pulmonary vascular bed-এ যায়। সাধারণতঃ প্রথম দিকে এই vapour tension ফুসফুসে বেশী থাকে এবং সেখানে থেকে কম vapour ten-

sion-এর দিকে অর্থাৎ রক্তের দিকে যেতে থাকে। অ্যানেস্থিসিয়া যত গভীরতর হয় এই প্রেশার gradiant ততই কমতে থাকে। আবার যখন রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া শেষ হয় তখন রোগীর রক্ত থেকে ফুসফুসের দিকে ভেপার উল্টো দিকে প্রবাহিত হয় এবং রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস যদি পর্যাপ্ত থাকে—সমস্ত ভেপার রোগীর ফুসফুস দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস যখন ফুসফুস হয়ে ফুসফুসের রক্তপ্রবাহে যায় তখন এটি আর গ্যাস থাকে না—এটি তরল হয়ে যায়। সুতরাং গ্যাস বা ভেপারের solubility রোগীর অ্যানেস্থিসিয়াকে বেশ প্রভাবিত করে। রোগীর ফুসফুসের রক্তপ্রবাহ (pulmonary blood flow) যেমন ভালো থাকা দরকার তেমন ভালো ventilated alveoliগুলিও ভালোভাবে পর্যাপ্ত perfused থাকা দরকার। এছাড়াও অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস যদি অপেক্ষাকৃত insoluble হয় তবে inspired air, alveoli এবং রক্তে tension-এর সমতা বেশ তাড়াতাড়িই আসে। অন্য দিকে খুব দ্রবণীয় গ্যাস হলে এই সমতা আসতে অনেক দেরী হয়।

অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এইভাবে রক্তপ্রবাহে যাওয়ার পর শরীরের সব তন্ত্রে চলে যায়। তবে তা নির্ভর করে সেই অঙ্গের রক্তপ্রবাহ, ওষুধের দ্রাব্যতা এবং দুইদিকের pressure gradiant-এর উপর। রোগীর মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, লিভার এবং কিডনিতে বেশী অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ যায় কেননা তিন-চতুর্থাংশ cardiac output এখানেই খরচ হয়। মস্তিষ্কে lipoid content এবং রক্ত-প্রবাহ বেশী তাই অ্যানেস্থিসিয়ার প্রতিক্রিয়া এখানেই বেশী, central nervous system-এ অবদমন (depression) বেশী হয়।

অপারেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দেওয়া বন্ধ করা হয়, তখন central nervous system থেকে রক্তে এবং রক্ত থেকে ফুসফুসে প্রেশার gradiant-এর মাধ্যমে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ শরীর থেকে বের হয়ে যায়। অবশ্য এর জন্য simple filtration, diffusion অথবা active trans-port—এসবও খানিক সাহায্য করে। অ্যানেস্থিসিয়ার থেকে জ্ঞান ফিরতে বা recovery হতে অনেক সময় দেরী হতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের দ্রাব্যতা যদি বেশী থাকে তবে অনেক ওষুধ অনেকক্ষণ ধরে শরীর থেকে বের করতে হবে। অ্যানেস্থিসিয়া যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে স্বাভাবিক কারণেই জ্ঞান ফিরতে দেরী হতে পারে। আবার মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য non-nervous tissueতে

যদি ওষুধ বেশী distributed থাকে তবে সেখানে অপেক্ষাকৃত কম রক্তপ্রবাহ থাকার জন্যও ওষুধের নির্গমন বা excretionও ধীরে ধীরে হয়।

অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলির যদিও অন্যতম কাজ রোগীর narcosis করা তবুও শরীরের অন্য সব system-এ এমন কি প্রত্যিটি জীবকোষে এই ওষুধগুলির প্রতিক্রিয়া আছে। এই ওষুধের অত্যধিক প্রয়োগে toxic manifestation হতে পারে এবং এক-একটি ওষুধের এক-এক রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

এখন এইসব শ্বাসগ্রহণযোগ্য (inhalational) অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের শরীরের বিভিন্ন তন্ত্রে প্রতিক্রিয়া কী ধরনের হয়—সে সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

Central Nerveus System :

শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ যে সংজ্ঞালোপ বা narcosis করে সেকথা সুবিদিত। এই narcosis-এর নানা রকমের মতবাদ আছে, সেগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে।

এই ওষুধগুলি মোটের উপর central nervous systemকে অবদমিত করে। প্রথমে cerebral cortex, তারপর আস্তে আস্তে basal ganglia, cerebellum. sensory এবং motor functions of spinal cord এবং শেষে vital centreগুলিকে অবদমিত করে। Guedel-এর শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার শুরু থেকে যতক্ষণ না রোগীর cardio-respiratory arrest হয়—এই মোট সময়কে ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। এর প্রথম stage-এ রোগীর ব্যথাবেদনার অনুভূতি থাকে না কেননা এ সময় রোগীর sensory cortex অবদমিত অবস্থায় থাকে। দ্বিতীয় stage-এ রোগী প্রলাপ বকে, লাফালাফি করতে পারে, কাশি বা বমিও হতে পারে। এটি হয় রোগীর cortical এবং subcortical control levelগুলি অবদমিত অবস্থায় থাকার জন্য। এ সময় রোগী অচৈতন্য থাকে। তৃতীয় stage হোল surgical অ্যানেস্থিসিয়ার stage। এ বিভিন্ন রকমের ৪টি plane-এ বিভক্ত। এ সময়ে রোগীর বিভিন্ন respiratory muscle-এ paralysis ঘটতে থাকে। এই সময়েই রোগীকে নির্দিষ্ট অপারেশন করা হয়। চতুর্থ stage-এ রোগীর medullary paralysis এবং মৃত্যু ঘটে।

অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীর cerebral oxygen consumption কমে যায়।

মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বা cerebral blood flowর তারতম্য ঘটতে পারে তবে এরজন্য রোগীর রক্তচাপ এবং pH বিশেষভাবে দায়ী।

ইথার অ্যানেস্থিসিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষিগোলকের নড়াচড়া খুব বেশী হয় এবং সেসময় চোখের মণিও প্রসারিত হয়। অবশ্য অতিমাত্রা (overdose) হলে বা অত্যধিক cerebral hypoxiaতেও চোখের মণি খুব বেশী প্রসারিত হয়ে পড়ে। ক্লোরোফর্ম, হ্যালোথেন ইত্যাদিতে চোখের মণি প্রসারিত হয়।

মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদি ঘুমের ওষুধ এই শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার মধ্যে দিলে উভয় ওষুধেরই কার্যকারিতা বেড়ে যায় এবং বেশী cerebral depresion হয়।

অনেক সময়, বিশেষতঃ ইথার অ্যানেস্থিয়ায়, রোগীর খিঁচুনি বা convulsion দেখা দিতে পারে। তবে এটি অন্য কারণেও হয়। অত্যধিক ইথার ব্যবহারের ফলে বা ইথারে কোন impurity থাকলে খিঁচুনি হতে পারে। রোগীর জ্বর থাকলে, জীবাণু সংক্রমণ (infection) থাকলে, কারবন ডাই-অক্সাইড রক্তে খুব বেশী বা খুব কম হলে এমনটি হতে পারে। এট্রোপিনের অত্যধিক ব্যবহারেও খিঁচুনি হতে পারে।

ইথার ব্যবহারের ফলে sympathetic nervous systemকে উত্তেজিত (stimulate) করে, নাড়ীর গতি বাড়ায়, রক্তচাপ বাড়ায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। কিন্তু parasympathetic system সাধারণতঃ অবদমিত হয়। Myoneural junction-এ কাজ ক'রে কিউর‍্যারির মত মাংসপেশীর শিথিলতা ঘটাতে সাহায্য করে।

হ্যালোথেন sympathetic systemকে অবদমিত করে। এর ফলে vasodilatation হয় এবং রোগীর রক্তচাপ অনেক কমে যায়।

Cardiovascular System :

শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ায় এই রক্তসংবহনতন্ত্রের কাজ নানাভাবে ব্যাহত হতে পারে। মস্তিষ্কের vasomotor centre অবদমিত হতে পারে। হৃৎপিণ্ডের myocardium অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। Cardiac pace-maker অথবা conducting mechanism-এ গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। শরীরের রক্তনালীর অস্বাভাবিক সংকোচন বা প্রসারণ ঘটতে পারে। Autonomic nervous systemএর উত্তেজনা (stimulation) বা

অবদমন (depression) ঘটলে হৃৎপিণ্ড বা রক্তনালীর স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতে পারে।

ইথার এবং সাইক্লোপ্রোপেনে হৃৎপিণ্ডের myocardial activity অত্যন্ত কমে যায়। ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের ফলে cardiac dilatation হতে পারে এবং প্রথম দিকে pulmonary এবং auricular pressure বেড়ে যায়। নাইট্রাস অক্সাইডও অল্প পরিমাণে cardiac dilatation করতে পারে। ক্লোরোফর্ম এবং হ্যালোথেন উভয়েই বেশ ভালোভাবে myocardial depression ঘটায়।

সাধারণভাবে বেশীর ভাগ অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ peripheral vasodilatation করে এবং তার ফলে রক্তচাপ কমে। অত্যধিক ইথার অ্যানেস্থিসিয়াতে peripheral vasodilatation হতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় রক্তচাপ মোটামুটি ঠিক থাকে, কেন না ইথার শরীরে এডরেনালিন নিঃসরণে সাহায্য করে। এতে রোগীর নাড়ীর গতি একটু বাড়ে, cardiac outputও বাড়ে। তার ফলে অল্প vasodilatation হলেও রক্তচাপ খুব একটা কমতে পারে না।

নাইট্রাস অক্সাইড অ্যানেস্থিসিয়ার ফলে রোগীর নাড়ী এবং রক্তচাপের বিশেষ হেরফের হয় না, অবশ্য যদি না তার সঙ্গে অক্সিজেনের অভাব (hypoxia) থাকে। ট্রাইক্লোরোএথিলিন দিয়ে light plane অ্যানেস্থিসিয়াতে নাড়ীর গতি কমে যেতে পারে, তবে রক্তচাপ ঠিকই থাকে। তবে deep অ্যানেস্থিসিয়াতে রক্তচাপ খুবই কমে যেতে পারে। ক্লোরোফর্মে রক্তচাপ খুবই কমে—যত বেশী পরিমাণে বা সময়ে দেওয়া হয় তত বেশী রক্তচাপ কম হয়। ইথাইল ক্লোরাইড একই ভাবে রক্তচাপ কমায়। হ্যালোথেনে নাড়ীর গতি একটু কমে যায়—vasodilatation হয় এবং রক্তচাপ কমে যায়। সাইক্লোপ্রোপেন অ্যানেস্থিসিয়ায় রক্তচাপ বেড়ে যায়, central venous pressureও বাড়তে পারে।

ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ায় vagal inhibition হয়ে হৃৎস্পন্দন হঠাৎ থেমে যেতে পারে। ইথারের irritant ভেপার, সাইক্লোপ্রোপেন, ট্রাইক্লোরোএথিলিন এবং হ্যালোথেন vagal stimulation ঘটাতে পারে।

ক্লোরোফর্ম, হ্যালোথেন, ট্রাইক্লোরোএথিলিন অনেক সময়েই arrhythmia করে। এটি ওষুধের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় হতে পারে, তবে অনেক সময় অক্সিজেনের অভাব, কারবন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য এবং শরীরে অত্যধিক catecholamine নিঃসরণের ফলে ventricular arrhythmia এবং এমনকি

ventricular fibrillation ঘটাতে পারে। ইথাইল ক্লোরাইড vagal stimulation ক'রে হৃৎপিণ্ডের ছন্দপতন ঘটাতে পারে। অত্যধিক সাইক্লোপ্রোপেন অ্যানেস্থিসিয়াও ventricular arrhythmia করতে পারে। এই সব অ্যানেস্থিসিয়ার সময় কখনও এড্রেনালিন বা ঐ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

Respiratory System :

এই সব অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই দেহে যায় সুতরাং respiratory tract এই সব ওষুধে বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবশ্য মস্তিষ্কে respiratory centre-এর উপরও এই সব ওষুধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ থাকে।

ইথার respiratory tract-এ খুব বেশী irritate করে এবং শ্বাসনালীতে secretion যথেষ্ট বাড়ায়। এর irritant effect-এর জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস প্রথম দিকে একটু বেড়ে যায় এবং অনেক সময় ইথারের central depression effectকে ছাপিয়ে যায়। ইথার অ্যানেস্থিসিয়ার প্রথম দিকে রোগীর দম বন্ধ করে রাখা, কাশি, ইত্যাদি হতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার দ্বিতীয় stage-এর পর রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে আসে।

এর পর আরও অ্যানেস্থিসিয়া বেশী হলে সম্পূর্ণভাবে intercostal paralysis হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার তৃতীয় stage-এর চতুর্থ planeএ রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে কমে যায়—এমন কি diaphragm ও paralysis হয়। আর চতুর্থ stageএ রোগীর respiratory failure হয়—respiratory muscleএ paralysis-এর ফলে এবং মস্তিষ্কের respiratory centre অবদমিত হওয়ার ফলে। এটি সাধারণতঃ অতিমাত্রায় ইথার দেওয়ার ফলেই ঘটে। ইথার bronchodilatation করে।

ক্লোরোফর্ম খুব তাড়াতাড়ি এবং অত্যন্ত বেশী respiratory depression করে। তবে ক্লোরোফর্ম খুব একটা শ্বাসনালীতে secretion বাড়ায় না। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ায় খুব তাড়াতাড়ি অনভিপ্রেতভাবে রোগী চতুর্থ stageএ চলে আসতে পারে। ট্রাইক্লোরোএথিলিন কিন্তু ক্লোরোফর্মের মত অতটা respiratory depression করে না। এটি মোটেই irritant নয়। প্রথম দিকে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়ে যায়—গভীরতা খুব বাড়ে না তবে হার প্রতি মিনিটে

৪০ বা তার চেয়েও কম হতে পারে। অনেক সময় এর depressant effect-এর জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যেতে পারে এবং রোগীর hypoxia ঘটতে পারে। হ্যালোথেন ভালো মিষ্টি গন্ধের non-irritant ওষুধ। তবে এটি respiratory depression করে। যত বেশী হ্যালোথেন concentration দেওয়া হয় তত বেশী depression করতে পারে। এটি salivation বা bronchial secretion বাড়ায় না। শ্বাসের টান বা কাশি করে না। হাঁপানি রোগীকেও ভালোভাবে হ্যালোথেন দেওয়া যায়।

নাইট্রাস অক্সাইড সেই হিসাবে অত্যন্ত ভালো। এটি শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বা গভীরতা কোনটিরও উল্লেখযোগ্যভাবে তারতম্য ঘটায় না। এতে রোগীর respiratory arrest হওয়ার আশংকা থাকে না—অবশ্য যদি না রোগীর অক্সিজেনের অভাব থাকে। সাইক্লোপ্রোপেন অ্যানেস্থিসিয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাসের হার এবং গভীরতা বা tidal volume কমে যায়। এ সব ক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধ—যেমন মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদি যদি প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে দেওয়া থাকে, তবে বিপজ্জনকভাবে respiratory depression এমন কি শ্বাসবন্ধ (apnoea) পর্যন্ত হতে পারে। এর parasympathomimetic action থাকার দরুন bronchospasm এবং laryngospasm ঘটাতে পারে।

Hepatic Function :

শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলির বেশীর ভাগই কিছু-না-কিছু লিভারের কাজ ব্যাহত করে। একমাত্র বোধ হয় নাইট্রাস অক্সাইড সম্বন্ধে সে রকম কিছু বলা হয় না। ক্লোরোফর্ম, হ্যালোথেন এবং মেথোক্সিফ্লুরেন-এর নিশ্চিত hepatotoxic effect আছে। অবশ্য অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ছাড়াও অন্য কারণে লিভারের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতে পারে। রোগীর nutrition এবং state of oxygenation-এর উপরও তা নির্ভর করে। যে সব রোগীর আগে থেকেই লিভারের গণ্ডগোল থাকে, তাদের liver toxicity স্বাভাবিক কারণেই বেশী হয়। অনেকক্ষণ ধরে অস্বাভাবিক রক্তচাপ হ্রাসের ফলেও লিভারের কাজ ব্যাহত হতে পারে।

ক্লোরোফর্মের liver toxicity সুবিদিত। এটি প্রত্যক্ষভাবে লিভারের ক্ষতি করে। যত বেশী concentration-এ দেওয়া হবে এবং যত বেশীক্ষণ দেওয়া হবে—লিভারের ক্ষতিও হবে তত বেশী। Delayed chloroform

poisoning সাধারণতঃ ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ার পর দেখা যায়। এতে লিভারের centrilobular necrosis হয়। বার বার ইথাইল ক্লোরাইড অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার পর রোগীর ন্যাবা বা jaundice এবং তার লিভারে fatty degeneration হতে পারে। ট্রাইক্লোরোএথিলিন সে দিক দিয়ে কম hepatotoxic, বিশেষতঃ ক্লোরোফর্মের তুলনায়। সাইক্লোপ্রোপেন খুব একটা hepatotoxic নয় বটে তবে এটি অত্যন্ত বেশী catecholamine নিঃসরণ করে। তার ফলে বিপজ্জনকভাবে splanchnic vasoconstriction ঘটে এবং massive hepatic necrosis করতে পারে।

হ্যালোথেন লিভারে sensitivity type toxicity করে। বার বার হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ার ফলে রোগীর ন্যাবা হতে পারে। এতে যে liver dysfunction হয় তা প্রায় viral hepatitis-এর মত। মেথোক্সিফ্লুরেন খুব একটা hepatotoxic নয় তবে আগে থেকে লিভার এবং পিত্তস্থলীর গণ্ডগোল থাকলে সেক্ষেত্রে মেথোক্সিফ্লুরেন ব্যবহার না করাই শ্রেয়। ডাই-ইথাইল ইথার সাধারণতঃ খুব বেশী লিভারের কাজ ব্যাহত করে না, তবে বার বার ইথার অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার পর লিভারে সামান্য fatty change দেখা দিতে পারে।

Liver toxicity এড়ানোর জন্য রোগীর পুষ্টি বা nutrition-এর দিকে নজর দেওয়া উচিত। রোগীর যাতে অ্যানেস্থিসিয়ার সময় অক্সিজেনের অভাব, কারবন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য এবং অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস না ঘটে তাও দেখা উচিত। আগে থেকে লিভারের অসুখ থাকলে hepatotoxic ওষুধ ব্যবহার না করাই উচিত।

Renal Function :

সাধারণভাবে শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধে কিডনির স্বাভাবিক কাজ বিশেষ ব্যাহত হয় না। তবে অনেক সময় কিডনির রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়ায় কিডনির কাজ বিঘ্নিত হতে পারে। অনেকক্ষণ ধরে বেশী ইথার ব্যবহারের ফলে রোগীর প্রস্রাবের সংগে এলবুমিন (albumin) বের হতে পারে ; সাময়িকভাবে কিডনিতে cloudy swelling হতেও পারে। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ার পরেও এমন হতে পারে। ইথার এবং সাইক্লোপ্রোপেন ব্যবহারে কিডনির রক্তপ্রবাহ অনেক কমে যায়, glomerular filtration rateও কমে যায় এবং প্রস্রাবের পরিমাণ কম হয়। সাধারণভাবে অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর প্রস্রাব অন্য কারণেও কমে যায়। অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীর দেহের

antidiuretic hormone-এর আধিক্য ঘটে এবং তার ফলে কিডনিতে জলের পুনঃশোষণ (reabsorption) বেশী হয় এবং প্রস্রাব কমে যায়।

হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়াতেও glomerular filtration rate এবং কিডনির রক্তপ্রবাহ কমে যায়। হ্যালোথেন খুব বেশী vasodilatation করে এবং শরীরের রক্তচাপ কমায়। তার ফলেই কিডনির কাজ ব্যাহত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু renal vasoconstriction হয় না।

মেথোক্সিফ্লুরেন ওষুধের কিন্তু renal toxicity আছে। এই অ্যানেস্থিসিয়ার পর প্রথম দিকে প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং high output renal failure হয়।

Myoneural blocking action :

শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার অনেক ওষুধ muscular paralysis-এ সাহায্য করে। ইথার non-depolarizing muscle relaxant-এর কার্যকারিতাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ায় কিছু curariform effect আছে। ট্রাইক্লোরোএথিলিন, নাইট্রাস অক্সাইড, সাইক্লোপ্রোপেন ইত্যাদি ওষুধের বিশেষ কোন muscle relaxation effect নেই।

হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ায় খুব অল্প muscle relaxation হতে পারে। এটি সাধারণভাবে non-depolarizing muscle relaxantদের কার্যকারিতা বাড়ায় কিন্তু depolarizing muscle relaxantকে অনেক সময় antagonise করে।

বিপাক (Metabolism) :

ইথার অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীর অক্সিজেন ব্যবহার বা consumption প্রায় ৭% বেড়ে যায় এবং সাইক্লোপ্রোপেনের ক্ষেত্রে তা বেড়ে প্রায় ১৫% হতে পারে। এই অক্সিজেন consumption বাড়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যে ইথার এবং সাইক্লোপ্রোপেন শরীরে catecholamine অত্যধিক নিঃসরণ করে। হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ায় অক্সিজেন consumption প্রায় ১৫ থেকে ২০% কমে যায়।

সাধারণভাবে শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়া cerebral oxygen uptake কমায়। তবে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ (cerebral blood flow) মোটামুটি ঠিকই থাকে। ইথার, ক্লোরোফর্ম এবং হ্যালোথেন মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ বাড়াতে পারে।

ইথার এবং সাইক্লোপ্রোপেন অ্যানেস্থিসিয়ায় রক্তে lactate level অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং এটি সাধারণতঃ এদের বেশী sympathetic nervous activityর জন্য। ইথার এবং ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। হ্যালোথেন এবং মেথোক্সিফ্লুরেন অ্যানেস্থিসিয়ায় রক্তের শর্করার মাত্রা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। নাইট্রাস অক্সাইড অ্যানেস্থিসিয়ায় রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিকই থাকে—অবশ্য যদি অক্সিজেনের অভাব এবং কারবন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য না ঘটে।

Protein metabolism এইসব অ্যানেস্থিসিয়ায় খুব একটা পরিবর্তন হয় না। তবে ক্লোরোফর্মের hepatotoxic action থাকায় প্রোটীন বিপাক (protein metabolism) বিঘ্নিত হতে পারে।

বিবিধ :

শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার পরে gastro-intestinal tone কমে যায়। ইথার এবং ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থিসিয়ায় post-operative গোলমাল হতে দেখা যায়। ইথার অ্যানেস্থিসিয়ায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর বমি হয়। হ্যালোথেন, ট্রাইক্লোরোএথিলিনে রোগীর বমি সাধারণতঃ কম হয়। নাইট্রাস অক্সাইডে বমি হয় না।

নাইট্রাস অক্সাইড এবং ট্রাইক্লোরোএথিলিন প্রয়োগে uterine tone-এর খুব একটা পরিবর্তন ঘটে না। তবে ইথার, ক্লোরোফর্ম বা হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ায় uterine tone খুবই কমে যায়। হ্যালোথেন খুব বেশী পরিমাণে বা concentration-এ দিলে vaginal delivery বা Caesarean section-এর পর post-partum haemorrhage হওয়ার আশংকা থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

এণ্ডোট্রেকীয়াল (Endotracheal) অ্যানেস্থিসিয়া

শ্বাসনালীর মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের টিউব দেওয়ার নাম endotracheal intubation। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে Curry প্রথম মানুষের endotracheal intubation করেন। তখন laryngoscope-এর প্রচলন না থাকায় আন্দাজে এবং মুখের মধ্যে স্পর্শ করে ঐ টিউব দেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে MacEwen'ও endotracheal intubation করেন, তবে Magill এটি ব্যবহারিক অ্যানেস্থিসিয়াতে বহুল প্রবর্তন করেন।

অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস এবং ভেপার ঐ টিউব দিয়েই রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে দেহে যায় এবং অ্যানেস্থিসিয়ার সৃষ্টি করে। একেই endotracheal অ্যানেস্থিসিয়া বলা হয়। আসলে এই টিউব একটি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসনালীর ব্যাপ্তি এবং রোগীর শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়া তখনকার মত ঐ টিউব দিয়েই হয়।

এইভাবে শ্বাসনালীতে টিউব পরানো হয় সাধারণতঃ দুটি কারণে—অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য এবং কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালানোর জন্য। কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালানোর সময় কোন অ্যানেস্থিসিয়া লাগে না কিন্তু এই টিউব দিয়েই অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং অনেক সময়েই তা পজিটিভ প্রেশার দিয়ে দিতে হয়। যখন কোন রোগীর শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে—যেমন আফিম, পেথিডিন, বারবিচুরেট ইত্যাদির বিষক্রিয়ায়, status asthmaticus, status epilepticus, bulbar poliomylitis ইত্যাদিতে। তখন এই টিউব পরিয়ে পজিটিভ প্রেশার দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানো অবশ্য কর্ত্তব্য। যে কোন কারণে হৃৎপিণ্ডের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে, শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হলেও এইভাবে শ্বাসকার্য চালানো দরকার।

Endotracheal অ্যানেস্থিসিয়া দিতে গেলে এইভাবে টিউব দিতেই হবে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অপারেশনে এইভাবে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া বিধেয়। মস্তিষ্কের অপারেশনে, বুকের মধ্যে অপারেশনে, মাথা, গলায় এবং মুখের মধ্যে অপারেশনের ক্ষেত্রে, অনেকক্ষণ ধরে অপারেশন হলে, যেসব অপারেশনে
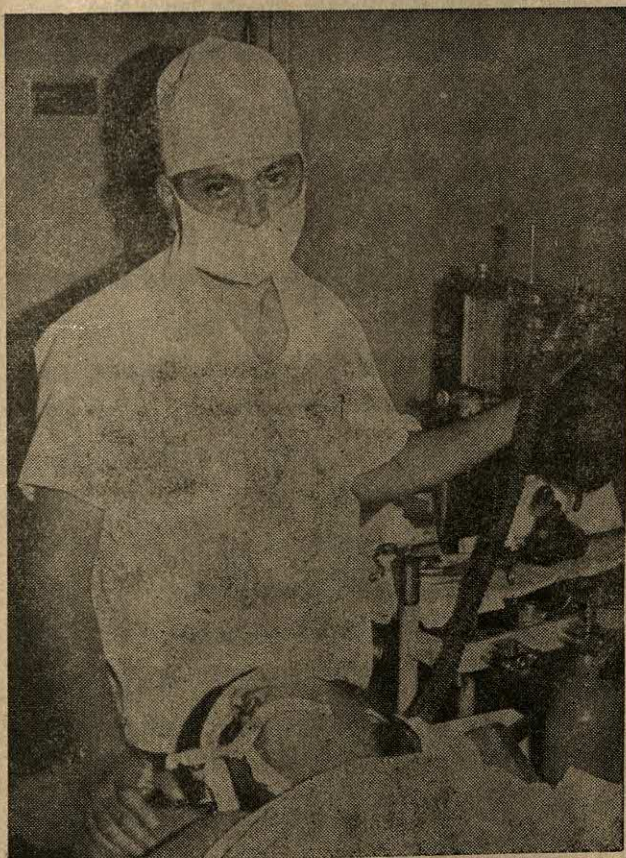
চিত্র ৫৪ : Endotracheal Anaesthesia

পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৫

muscle relaxation খুব দরকার হয়, পাশ ফিরিয়ে বা উপুড় করে অপারেশন করতে হলে—এণ্ডোট্রেকীয়াল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

Endotracheal intubation করলে অনেক ধরনের স্থবিধে পাওয়া যায়। এটিতে একটি ভালো, পরিষ্কার, বাধাহীন শ্বাসক্রিয়ার পথ পাওয়া যায়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ মসৃণভাবে এবং অল্পায়াসে হয়। রক্ত, বমি ইত্যাদি শ্বাসনালীতে যেতে পারে না। আরও স্থবিধা, দরকার মত রোগীকে muscle relaxant দেওয়া যায়। দরকার হলে কৃত্রিমভাবে রোগীর শ্বাসকার্য চালানো যায়। অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিন অপারেশনের জায়গা থেকে বেশ একটু দূরে রাখা যায়।

অবশ্য এণ্ডোট্রেকীয়াল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার অস্থবিধাও কিছু আছে। এইভাবে অ্যানেস্থিসিয়া দিতে গেলে রোগীর শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকার দরকার। রোগীর বেশী বা deep অ্যানেস্থিসিয়াতেই এই টিউব পরানো হয় এবং রাখা হয় স্থতরাং বেশী পরিমাণে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ লাগে। এছাড়াও অন্য উপসর্গ হতে পারে।

Laryngoscopy করার সময় এবং টিউব পরানোর সময় নানা জায়গায় আঘাত লাগতে পারে—যেমন দাঁতে, ঠোঁটে, মাড়িতে, আলজিভে, শ্বাসনালী ইত্যাদিতে। শ্বাসনালীর ভেতরে আঘাত লেগে রক্তক্ষরণ হতে পারে, ফুলে যেতে পারে। Vocal cordএও আঘাত লাগতে পারে। দাঁত ভেঙে যেতে পারে। নাক দিয়ে টিউব পরানোর সময় সেখানেও আঘাত লাগতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়ার light অবস্থায় টিউব পরালে রোগীর নিঃশ্বাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, শ্বাসের টানও হতে পারে। Laryngospasm এমনকি হৃৎস্পন্দন থেমেও যেতে পারে। এণ্ডোট্রেকীয়াল টিউব যদি তুলনায় খুব ছোট হয়, আপাতদৃষ্টিতে শ্বাসনালীতে গেলেও পরে যেকোন সময় টিউব বেরিয়ে আসতে পারে। টিউব যদি খুব বড় হয় এবং অনেকদূর পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হয় তবে একটি bronchusএ চলে যায় এবং তার ফলে অন্য ফুসফুস অকেজো হয়ে পড়ে। টিউব যদি খুব মোটা হয় তবে intubation করতে কষ্ট হবে এবং বেশী আঘাত হবে। আবার টিউব যদি খুব সরু হয় তবে তা দিয়ে রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হবে এবং রোগীর অক্সিজেনের অভাব ঘটবে।

Endotracheal টিউব যদি দুমড়ে বা মচকে যায় তবে টিউব প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং তা দিয়ে গ্যাস যেতে পারে না। রক্ত, বমি ইত্যাদি টিউবের মধ্যে

গিয়ে টিউব বন্ধ করে দিতে পারে। রোগী হঠাৎ কামড়েও টিউবে বন্ধ সৃষ্টি করতে পারে।

এসব ছাড়াও রোগীর গলায় ব্যথা, শ্বাসনালীতে প্রদাহ ইত্যাদি হতেই পারে। নানা রকমের অসুখ—যেমন নিউমোনিয়া, aspiration pneumonitis, bronchopneumonia ইত্যাদি পর্যন্ত হতে পারে। শ্বাসনালীর মুখ হঠাৎ ফুলে গেলে (oedema glottis) রোগীর শ্বাস কষ্ট হয়। সময়মত চিকিৎসা না করলে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

Endotracheal intubation সাধারণতঃ তিনভাবে করা যেতে পারে। মুখের মধ্য দিয়ে শ্বাসনালীতে টিউব পরানোর নাম orotracheal intubation, আবার নাকের মধ্য দিয়ে টিউব শ্বাসনালীতে দেওয়ার নাম nasotracheal intubation। অবশ্য tracheostomy করা থাকলে সেখান দিয়েও টিউব দেওয়া যায়। একে transtracheal intubation বলে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে direct laryngoscopy করে শ্বাসনালীর মুখটি দেখে তবে টিউবটি ঠিকমত পরানো হয়। কিন্তু যখন রোগী মুখ খুলতে পারে না তখন laryngoscopy করা যায় না। তখন না দেখে (blindly) রোগীর nasotracheal intubation করা হয়।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে endotracheal intubation করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে—যেমন যে সব রোগী পর্যাপ্ত মুখ খুলতে পারে না, যাদের ঘাড় পেছনের দিকে মোটে বাঁকে না, যদি গলায় contracture থাকে, যাদের গলা খুব ছোট থাকে, যাদের সামনের দাঁত (incisor teeth) খুব বড় এবং উঁচু থাকে। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য সহকারে যত্ন নিয়ে টিউব পরানোর চেষ্টা করতে হবে।

Endotracheal অ্যানেস্থিসিয়ার একটি বহুল ব্যবহৃত প্রয়োগ পদ্ধতি :

রোগীকে আগে থেকেই ভালোভাবে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন মত laboratory testগুলি করা উচিত। রোগীর কোন রকম অন্য অসুখ থাকলে চিকিৎসা করে রোগীকে মোটামুটি অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য উপযুক্ত করে নেওয়া হয়।

রোগী হাসপাতালে ভর্তির পর আবার রোগীকে দেখা উচিত। আগে আউটডোরে দেখে যে note রাখা আছে আবার তা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া উচিত। এই preoperative visit-এ রোগীর সংগেও একটা সুসম্পর্ক

গড়ে ওঠে। রোগীর ভয়-ভাবনাও অনেক কমে যায়। দরকার মত রোগীকে আগের রাতে ঘুমের ওষুধও দেওয়া যেতে পারে। এতে রোগীর ভালো হয় এবং মানসিক শান্তিও ফিরে আসে।

রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করার আগে রোগীকে premedication দেওয়া হয়। সাধারণভাবে ১ ঘণ্টা আগে মাংসপেশীতে (intramuscular) ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। পেথিডিন ১০০ মি. গ্রা. এবং এট্রোপিন ০.৬৫ মি. গ্রা. একসংগে একটি পূর্ণবয়স্কলোকের গ্রেড ১ রোগীর ভালো প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ।

রোগীকে এর পর ভালোভাবে অপারেশন টেবিলে নিয়ে আসা হয়। রোগীকে তখনও একবার পরীক্ষা করা উচিত। অন্ততঃ নাড়ী এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দেখে নেওয়া দরকার। ঠিক রোগী এসেছে কি না তা identify করা দরকার। রোগীর অপারেশনের লিখিত সম্মতি আছে কি না তাও দেখা দরকার।

সাধারণভাবে থায়োপেন্টোন সোডিয়াম ৩০০ থেকে ৩৫০ মি. গ্রাম এবং গ্যালামিন ১০০ থেকে ১২০ মি. গ্রাম শিরাপথে ইঞ্জেকশন ধীরে ধীরে দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করা হয়। রোগীকে তখন মাস্ক দিয়ে ১০০%অক্সিজেন দেওয়া দরকার। তারপর laryngoscopy করে ঠিক মত ঠিক সাইজের endotracheal টিউব পরানো হয়। এরপর Boyle অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিনের সংগে যোগ করা হয়। রোগীর বুকে ষ্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা উচিত ঠিক মত endotracheal intubation হয়েছে কি না। একটি পূর্ণবয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে ৩ লিটার অক্সিজেন এবং ৬ লিটার নাইট্রাস অক্সসাইড প্রতি মিনিটে দেওয়া হয়। এর সংগে অবশ্য ইথার, বা ট্রাইক্লোরোএথিলিন বা হ্যলোথেন অ্যানেস্থিসিয়ার পরিপূরক হিসাবে দেওরা যেতে পারে।

রোগীর এই অ্যানেস্থিসিয়া এবং অপারেশন চলা কালে নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ, দেহের তাপ ভালোভাবে বারবার পরীক্ষা করা উচিত। Muscle relaxant-এর কার্যকারিতার জন্য কৃত্রিম ভাবে পজিটিভ প্রেশারে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এই ventilation-এর গোলমালে রোগীর নানা-উপসর্গ হতে পারে—রোগীর অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে, cyanosis হতে পারে।

অপারেশন শেষ হয়ে গেলে প্রথমে ইথার বা হ্যালোথেন দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। যদি গ্যালামিন বা কিউর‍্যারি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে অতি অবশ্য decurarisation করা দরকার। এর জন্য এট্রোপিন এবং নিওষ্টিগ্‌মিন

শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক এবং পর্যাপ্ত হলে তবেই বুঝা হবে শরীরে গ্যালামিনের আর কোন কার্যকারিতা নেই।

মুখের মধ্যে saliva, secretion বা বমি ভালোভাবে sucker মেশিনের সাহায্যে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। যদি মুখের মধ্যে কোন gauge pack দেওয়া থাকে তা অবশ্যই বের করে দিতে হবে। যদি cuffed endotracheal টিউব দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে cuff-এর বেলুন থেকে হাওয়া বের করে দিতে হবে। রোগীকে নাইট্রাস অক্সাইড বন্ধ করে বেশী পরিমাণে অক্সিজেন দেওয়া হয়। তারপর আস্তে আস্তে এণ্ডোট্রেকীয়াল টিউব বের করে ফেলা হয়—একে extubation বলে।

রোগীকে এরপর মুখের মাস্ক দিয়ে খানিকক্ষণ অক্সিজেন দেওয়া হয়। রোগীর আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসে, রোগীকে ডাকলে সাড়া দেয়, জিভ দেখাতে বললে জিভ দেখায়। চোখ খুলে রাখতে পারে। নামও বলতে পারে। রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং রক্তচাপ ঠিকমত আছে কিনা দেখা উচিত। রোগী ঠিক থাকলে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওয়ার্ডে রোগীকে আস্তে আস্তে বিছানায় শোয়ানো হয়। নাকে ক্যাথেটার দিয়ে রোগীকে এখানেও অক্সিজেন দেওয়া হয়।

এণ্ডোট্রেকীয়াল অ্যানেস্থিসিয়ার উপরোক্ত পদ্ধতি দরকার মত এবং anaesthetist-এর দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বদলানো যেতে পারে। Induction অন্যভাবেও করা যেতে পারে। Open ইথারে অথবা মুখে মাস্ক দিয়ে অক্সিজেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ইথার অথবা হ্যালোথেন দিয়েও অজ্ঞান করা যায়।

অ্যানেস্থিসিয়া চালু রাখার সময় উপরোক্ত Magill's semiclosed circuit ছাড়াও প্রয়োজনে circle system-এ কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা যায়। অবশ্য circle system-এ ট্রাইক্লোরোএথিলিন কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আঞ্চলিক (Regional) অ্যানেস্থিসিয়া

ব্যথাহীন অপারেশনের ক্ষেত্রে রিজিওন্যাল অ্যানেস্থিসিয়া বা অ্যানালজেসিয়া (analgesia) একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এতে অপারেশনের জায়গায় যে স্নায়ুগুলি থাকে সেগুলিকে ওষুধের সাহায্যে block বা অবরোধ করা হয় যাতে ব্যথার অনুভূতি সাময়িকভাবে থাকে না। এই পদ্ধতিতে অপারেশন করলে রোগীকে অজ্ঞান করার দরকার হয় না। এই ওষুধগুলিকে বলে local anaesthetic drug। এই ওষুধ স্থানীয় স্নায়ুতন্তুর কাছে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হয়। কিছু সময়ের জন্য ঐ জায়গা অসাড় হয়ে যায়, ব্যথা অনুভূতি থাকে না। পরে অবশ্যই অনুভূতি আবার ফিরে আসে। স্নায়ুর কোন ক্ষতি হয় না।

এই রিজিওন্যাল অ্যানেস্থিসিয়ার নানারকমের পদ্ধতি আছে।

১। Surface অ্যানালজেসিয়া ঃ এতে ত্বক বা mucous membrane-এর উপর কোকেন বা লিগনোকেন (৪%) স্প্রে অথবা মলম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ছোটখাট অপারেশনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হয়। Laryngoscopy, bronchoscopy, urethral dilatation এভাবে করা যায়। চোখের conjunctiva এবং cornea এইভাবে ব্যথাহীন করা যায়।

২। Infiltration অ্যানালজেসিয়া : এই পদ্ধতিতে লিগনোকেন (০.৫-১%) বা ঐ জাতীয় ওষুধ স্থানীয় অপারেশনের জায়গায় চামড়ার নীচে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এটি খুব সরল পদ্ধতি এবং ছোট অপারেশনের ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী। এটি দাঁত তোলার ক্ষেত্রে, চামড়ার নীচে, wart, cyst ইত্যাদির অপারেশনে ব্যবহার করা যায়।

৩। Nerve block ঃ এক্ষেত্রে একটি বিশেষ নার্ভকে block করা হয়। অপারেশনের জায়গা যে স্নায়ুতন্তুর অধীন সেটিকে লিগনোকেন বা ঐ জাতীয় ওষুধ —যেমন প্রিলোকেন ১ থেকে ২% দিয়ে block করা হয়। হাতের অপারেশনের ক্ষেত্রে brachial plexus blockও করা হয়। এছাড়াও দরকার মত intercostal nerve block, pudendal nerve block ইত্যাদিও করা যেতে পারে।

৪। Field block : এখানে অপারেশনের জায়গাটির চারদিকে লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ফলে সব জায়গাটিতেই ব্যথার অনুভূতি থাকে না।

৫। শিরাপথে (intravenous) local analgesia : হাতে বা পায়ে প্রথমে একটি tourniquet অথবা Esmarch bandage বাঁধা হয়। তারপর একটি blood pressure cuff উপরের দিকে বাঁধা হয় এবং এর প্রেশার তুলে রাখা হয় রোগীর রক্তচাপের উপরের লেভেলে। এর পর Esmarch ব্যাণ্ডেজ খুলে নেওয়া হয়। এসবের ফলে হাত বা পা প্রায় রক্তশূন্য অবস্থায় থাকে। তারপর লিগনোকেন বা ঐ জাতীয় ওষুধ শিরাপথে দেওয়া হয়। হাতের ক্ষেত্রে লিগনোকেন ০.৫% ৪০ মি. লি. পর্যন্ত লাগে এবং পায়ের ক্ষেত্রে ৮০ মি. লিটার পর্যন্ত লাগে। এই পদ্ধতিতে ব্যথার অনুভূতি চলে যায় খুব তাড়াতাড়ি। অপারেশনের পর blood pressure cuff খুলে দেওয়া হয় এবং এর পর অ্যানেস্থিসিয়া চলে যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই।

রিজিওন্যাল অ্যানেস্থিসিয়ার সাহায্যে অনেক ধরনের অপারেশন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে করা যায়। যখন জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ায় বাধা থাকে বা যখন রোগী হয়তো সেইমাত্র খেয়েছে—সেসব ক্ষেত্রে এইভাবে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

তবে শিশুদের ক্ষেত্রে এসব না দেওয়াই ভালো। রোগী সহযোগিতা না করলে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয় না। অ্যানেস্থিসিয়ার ইঞ্জেকসন দেওয়ার জায়গায় প্রদাহ থাকলে এবং লিগনোকেন বা ঐ জাতীয় ওষুধের hypersensitivity থাকলে কখনই এ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত নয়।

মোটামুটিভাবে রিজিওন্যাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার অনেক সুবিধাও আছে। রোগী অপারেশনের পর তাড়াতাড়ি খেতে পারে—চলাফেরা করতে পারে। অপারেশনের সময় রক্তপাতও অপেক্ষাকৃত কম হয়। কোন বিস্ফোরণ হবার আশংকা থাকে না। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে উপসর্গও প্রায় হয় না বললেই চলে।

কয়েকটি সাধারণ লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ :

কোকেন (Cocaine) :

লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের মধ্যে কোকেন সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল কোলার চোখের cornea অপারেশনে এটি প্রথম ব্যবহার

করেন। এই ওষুধ কোকা গাছের পাতা থেকে উৎপন্ন হয়। ঐ গাছ পেরু, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্য দেশেও খুব পাওয়া যায়।

কোকেন খুব ভালো লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। চোখ, নাক, গলার mucous membrane-এ ভালোভাবে অ্যানেস্থিসিয়া করে। সর্বাধিক মাত্রা কখনই ১০০ মিলিগ্রামের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটি লিভারে detoxicate করে কিন্তু প্রস্রাবের সংগে অপরিবর্তিত অবস্থায় কিছু বেরিয়ে যায়।

কোকেনের প্রভাবে রোগীর excitement, euphoria, রক্তচাপ বৃদ্ধি, নাড়ীর গতিবৃদ্ধি ইত্যাদি হতে পারে। সব থেকে অসুবিধা এটি নেশায় পরিণত হতে পারে। অত্যধিক কোকেন প্রয়োগে খিঁচুনি, সংজ্ঞালোপ, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং এমন কি হৃৎপিণ্ডও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সব কারণে এখন কোকেনের ব্যবহার প্রায়ই হয় না।

প্রোকেন (Procaine) :

এটি Einhorn ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন। এটি কোকেনের থেকে কম ক্ষতিকর। এটি mucous membrane-এ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায় না, তাই surface analgesiaতে ব্যবহার হয় না। Infiltration ইঞ্জেকশন হিসেবে এটি দেওয়া হয় ০·২৫% solution-এ, নার্ভ block করতে গেলে ১ থেকে ২% solution-এ। মোট ৫০০ মি. গ্রা. থেকে ১০০০ মি. গ্রা. দেওয়া যায়। ইঞ্জেকশন দিলে ২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যে ফল পাওয়া যায় এবং প্রায় ৩০ থেকে ৬০ মিনিট স্থায়ী থাকে।

লিগনোকেন (Lignocaine) :

এই ওষুধটি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত। এটি প্রথমে Lofgran ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবহার করেন। এটির কার্যকারিতা অনেকক্ষণ থাকে। এর থেকে ক্ষতিও অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণতঃ ৫০০ থেকে ৭০০ মি. গ্রামের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়। এটি surface অ্যানেস্থিসিয়াতে, নার্ভ block-এ, spinal এবং epidural অ্যানেস্থিসিয়াতে ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়। লিগনোকেন (১ থেকে ২%) জেলী হিসাবে এবং মলম হিসাবেও ব্যবহার হয়।

লিগনোকেনের কার্যকারিতা যাতে অনেকক্ষণ থাকে তার জন্য adrenaline এর সংগে দেওয়া হয়। কিন্তু যেখানে end-arteries আছে—যেমন হাতের

এবং পায়ের আঙুলে, penis-এ—সেখানে শুধু লিগনোকেন দেওয়া উচিত নতুবা এডরেনালিনের প্রভাবে রক্তনালী সংকুচিত হয়ে রক্তপ্রবাহ কমে যায় এবং তার ফলে সেখানে পচন (gangrene) হতে পারে।

Infiltration-এ ০·৫%, নার্ভ block-এ ১ থেকে ১·৫%, spinal অ্যানেস্থিসিয়াতে ৫% এবং epidural অ্যানেস্থিসিয়াতে ১·৫ থেকে ২% লিগ-নোকেন ব্যবহার করা হয়। লিগনোকেন সাধারণতঃ লিভারে বিপাক হয়, এবং কিডনি দিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রিলোকেন (Prilocaine) :

এটি Lofgren এবং Tegner প্রথম বের করেন এবং Gordh ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রথম ব্যবহার করেন। এটিও ভালো কার্যকরী ওষুধ এবং কম ক্ষতিকারক। এটি লিভার এবং কিডনি দিয়ে বিপাক হয়। কিন্তু এটি রক্তে methaemoglobinaemia ঘটাতে পারে এবং ফলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। প্রিলোকেনের কার্যকারিতা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়—প্রায় ৩ ঘণ্টার মত। এটি nerve block, spinal এবং epidural অ্যানেস্থিসিয়াতে ব্যবহার করা যায়।

সিনকোকেন (Cinchocaine) :

এটিও যথেষ্ট কার্যকরী লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এর কাজ আরম্ভ হয় একটু দেরীতে—প্রায় ৩ থেকে ৫ মিনিট লাগে। কিন্তু ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মত স্থায়ী হয়। এটি mucous membrane-এ ভালোভাবে কাজ করে তাই ভালো surface অ্যানেস্থিসিয়া হয়। সর্বাধিক মাত্রা ১২০ মিলিগ্রাম। সিনকোকেন spinal অ্যানেস্থিসিয়াতেও ব্যবহার হয়। ১% সিনকোকেন মলমও পাওয়া যায়।

মেপিভ্যাকেন (Mepivacaine) :

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে Ekenstam এটিকে অ্যানেস্থিসিয়ায় প্রথম ব্যবহার করেন। এটি লিগনোকেনের থেকেও কম ক্ষতিকারক। এতে এডরেনালিন দিলে স্থায়িত্ব খুব বেশী কিছু বাড়ে না। Infiltration অ্যানেস্থিসিয়াতে ০·৫ থেকে ১%, নার্ভ block-এ ১ থেকে ১·৫%, spinal অ্যানেস্থিসিয়াতে ৪% এবং epidural অ্যানেস্থিসিয়াতে ১·৫ থেকে ২% মেপিভ্যাকেন ব্যবহার করা বিধেয়।

গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে এটি placenta দিয়ে বেরিয়ে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং Caesarean section-এ এর ব্যবহার না করাই উচিত।

বুপিভ্যাকেন (Bupivacaine) :

এটি একটি নতুন লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটিও ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে Ekenstam প্রথম ব্যবহার করেন। এটি লিগনোকেন এবং মেপিভ্যাকেন থেকে প্রায় ৪ গুণ বেশী কার্যকরী। এর কার্যকারিতা অন্য সব ওষুধের চেয়ে অনেক বেশী স্থায়ী—প্রায় ৫ থেকে ১৬ ঘণ্টার মত।

এটির সংগেও এডরেনালিন দেওয়া যায়। সর্বাধিক মাত্রা ২ মি. গ্রা./কে. জি.। মোট ১৫০ মিলিগ্রামের মত। এটি nerve block, epidural অ্যানেস্থিসিয়া ইত্যাদিতে ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়।

এই সব লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের অনেক সময় toxic reaction হতে দেখা যায়। অবশ্য অনেক কারণেই এরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। যেমন, কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর। অনেক বেশী পরিমাণে ওষুধ প্রয়োগের ফলে, অত্যধিক concentration-এ ওষুধে প্রয়োগের জন্য, ভুলক্রমে arteryর মধ্যে ওষুধ ইঞ্জেকশনের ফলে—আরও নানা কারণে এ রকমের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। রোগীর সেই ওষুধে hypersensitivity থাকলে বা ইঞ্জেকশনের জায়গায় বেশী প্রদাহ থাকলে, রোগীর লিভারের অবস্থা খুব খারাপ থাকলেও toxic reaction হতে পারে।

এই সব বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটলে সেটি তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা দরকার এবং অবিলম্বে চিকিৎসা করা বিধেয়।

রোগীর প্রথম দিকে মাথাধরা, মাথাঘোরা, উত্তেজিত হওয়া এই সব লক্ষণ দেখা দেয়। খিঁচুনি হতে পারে, বমিও হতে পারে। পরে রোগীর সংজ্ঞালোপ ঘটে, নাড়ী পাওয়া যায় না, রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হয়, এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এলার্জিতে rash বেরুতে পারে, গলা ফুলে যেতে পারে, হাঁপানির টানও হতে পারে।

এই toxic reaction যাতে না ঘটে তার জন্য রোগীকে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার আগে ভালোভাবে পরীক্ষা করা দরকার। রোগীকে

প্রয়োজনে প্রাক-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। ঠিক মত মাত্রা নির্ণয় করে ঠিকভাবে ওষুধ প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় হঠাৎ প্রয়োজনে রোগীকে যাতে resuscitation করা যায় তার ব্যবস্থা রাখা অবশ্য কর্তব্য।

যাই হোক, toxic reaction হলে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস যাতে ঠিক থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অক্সিজেন দিতে হবে। দরকার হলে endotracheal intubation করে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাতে হবে। শিরাপথে fluid দিতে হবে। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধ দিতে হবে। খিঁচুনী কমানোর জন্য ডায়াজিপাম, কিউর‍্যারি অথবা থায়োপেন্টোন দেওয়া যেতে পারে।

Spinal অ্যানেস্থিসিয়া

এই পদ্ধতিতে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ subarachnoid space-এ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তার ফলে ঐ ওষুধ spinal nerve root-এ কাজ করে এবং ঐ সব নার্ভ শরীরের যে যে অংশে অনুভূতি জোগায়, সেই সব অংশে অ্যানেস্থিসিয়ার সৃষ্টি হয়। এই subarachnoid space সাধারণভাবে piamater এবং arachnoid mater-এর মধ্যবর্তী স্থান। এখানে cerebrospinal fluid দিয়ে ভর্তি থাকে। এটি মস্তিষ্ক থেকে দ্বিতীয় sacral vertebra-র নীচের লেভেল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

Subarachnoid space-এ ইনজেকশন দেওয়া হয় lumbar puncture করে। Spinal অ্যানেস্থিসিয়া প্রথম প্রবর্তন করেন August Bier ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু Pitkin ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি ব্যাপকভাবে চালু করেন।

Spinal অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য সিনকোকেন, লিগনোকেন, মেপিভ্যাকেন, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ৫% লিগনোকেন spinal অ্যানেস্থিসিয়াতে খুব ব্যবহার করা হয়। এটিকে heavy লিগনোকেন বলা হয়—এর সংগে থাকে ৩·১% dextrose এবং এর specific gravity ১০১৮। এড্রেনালিন এর সংগে দেওয়া যায় কিন্তু neural ischaemia-র ভয়ে এড্রেনালিন না দেওয়াই উচিত।

Spinal অ্যানেস্থিসিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতি :

রোগীকে আগে থেকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। অ্যানেস্থিসিয়ার

আগে premedication দেওয়া হয় যাতে রোগী অযথা ভয় না পায়, কোন দুর্ভাবনা না থাকে, রোগী যাতে ভালোভাবে সহযোগিতা করে এবং অপারেশনের সময় শান্ত সমাহিত থাকে।

Spinal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার জন্য এর সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতির একটি set একেবারে বীজাণুমুক্ত অবস্থায় প্যাক করা থাকে। এই প্যাকে থাকে :

১। সিরিঞ্জ : ২ মি.লি., ৫ মি.লি., ১০ মি.লি. এবং ২০ মি.লি.। এদের সংগে hypodermic needles বা সূচ।

২। তোয়ালে, swab, sponge forceps, তুলা, গজ ইত্যাদি

৩। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ—লিগনোকেন ইত্যাদি

৪। Lumbar puncture needle বা সূচ

Lumbar puncture করার সময় খুব সাবধানে aseptic precaution নিয়ে করা উচিত। Spinal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় রোগীকে বসিয়ে করা যায়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগীকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে করা হয়। রোগীর হাঁটু দুটি মুড়ে বুকের কাছে আনতে হবে এবং চিবুকটি ঐ হাঁটু দুটির কাছাকাছি যাবে। এতে রোগী কুঁকড়ে প্রায় গোল হয়ে যায়। একজন সহকারী রোগীকে এ অবস্থায় থাকতে সাহায্য করলে সুবিধা হয়।

Lumbar puncture সাধারণতঃ তৃতীয় এবং চতুর্থ lumbar vertebrar মাঝে করা হয়। কেন না এতে spinal cord-এ কোন আঘাত লাগে না—spinal cord সাধারণতঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় lumbar vertebrar মধ্যে শেষ হয়ে যায়। প্রথমে ঐ জায়গাটিকে লিগনোকেন ১% চামড়ার নীচে ইঞ্জেকশন দিয়ে অসাড় করে নেওয়া হয়। তারপর spinal needle আস্তে আস্তে চালাতে হবে ঠিক শিরদাঁড়ার মাঝখানে কিন্তু একটু উপরের দিকে। ঐ সূচটি চালাতে হবে যতক্ষণ না dura mater বিদ্ধ হয়। তারপর সূচের styletটি খুলে নিলে সূচ দিয়ে cerebrospinal fluid ভালোভাবে পড়তে থাকে। এতে সঠিক বোঝা যায় যে সূচটি ঠিক subarachnoid space-এ আছে। তখন লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধটি মাত্রামত আস্তে আস্তে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

তারপর styletটি আবার সূচে দিয়ে সবসমেত সূচটি বের করে নেওয়া হয়। ইঞ্জেকশনের জায়গায় ভালোভাবে dressing করে রোগীকে চিৎ করে অপারেশন

টেবিলে শোয়ানো হয়। রোগীর মাথায় বালিশ দেওয়া যেতে পারে, রোগী যাতে আরামে শুয়ে থাকতে পারে তা দেখা উচিত।

ভালো কার্যকরী spinal অ্যানেস্থিসিয়া দিতে গেলে অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে—যেমন কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে, কতটা ব্যবহার করা হয়েছে, কী concentration-এ দেওয়া হয়েছে, কোন vertebraর লেভেলে দেওয়া হয়েছে, কোন postureএ রোগীকে রাখা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Spinal অ্যানেস্থিসিয়া সাধারণভাবে রোগীর diaphragm-এর নীচে যে কোন অপারেশনের জন্য মোটামুটি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন কারণে জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার বিপদ থাকলে spinal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যেতে পারে। রোগীর বুকের অসুখ থাকলে, ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র অসুখ থাকলে, কিডনি বা লিভারের অসুখ থাকলে spinal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া ভালো। এতে রোগীর অপারেশনের সময় রক্তপাতও অপেক্ষাকৃতভাবে কম হয়।

অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে spinal অ্যানেস্থিসিয়া না দেওয়াই ভালো। রোগীর অনিচ্ছা থাকলে, রোগীর মস্তিষ্কের অসুখ থাকলে, অত্যধিক রক্তাল্পতায় spinal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয় না। শিরদাঁড়া খারাপ থাকলে, পিঠের চামড়ার প্রদাহ থাকলে, রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার গোলমাল থাকলে কখনোই spinal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া উচিত নয়।

Spinal অ্যানেস্থিসিয়ার সুবিধা কিন্তু অনেক। ভালো muscle relaxation হয়। রোগীর সংজ্ঞালোপ হয় না। ডায়াথার্মি বা cautery ব্যবহার করা যায়। Endotracheal intubation করার দরকার হয় না। জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়ার কুফল এখানে থাকে না।

Spinal অ্যানেস্থিসিয়ার নিজস্ব কিছু কুফল আছে। রোগীর রক্তচাপ অনেক কমে যেতে পারে। পরে রোগীর প্রচণ্ড মাথা ধরতে পারে। পিঠে ব্যথা হতে পারে। Meningitis হতে পারে। রোগীর কিছু neurological disorder—যেমন cauda equina syndrome, cranial nerve palsy ইত্যাদিও হতে পারে।

Spinal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়াকালীন রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ ইত্যাদির দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা উচিত। কিছু অঘটন ঘটলে সময়মত তার চিকিৎসা করা দরকার।

Nerve block যদি দশম thoracic vertebraর উপর যায় তবে তাকে high spinal বলা হয়। এতে রক্তচাপ খুব কমে যেতে পারে—শ্বাসপ্রশ্বাসও ব্যাহত হতে পারে। একটি medium spinal block সাধারণতঃ দশম thoracic vertebra থেকে চতুর্থ lumbar vertebra পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। হারনিয়া, তলপেটের অপারেশন, পায়ের অপারেশন ইত্যাদি এ ভাবেই করা যায়। আর low spinal block সাধারণভাবে sacral segmentকেই block করে। এতে piles, fistula ইত্যাদি অপারেশন করা যেতে পারে।

Epidural অ্যানেস্থিসিয়া

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে Pages এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে Dogliotti এই epidural অ্যানেস্থিসিয়ার প্রবর্তন করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে Massey Dawkins এটিকে ব্যাপকভাবে চালু করেন।

এই পদ্ধতিতে spinal nerveগুলিকে block করা হয় epidural space-এর মধ্যে। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ spinal needle-এর সাহায্যে epidural space-এ দেওয়া হয় এবং সেখানেই spinal nerveগুলি ঐ ওষুধের প্রভাবে blocked হয়।

Epidural space থাকে vertebral canal-এর periosteum এবং spinal dura mater-এর মধ্যবর্তী জায়গায়। এই space উপরের দিকে foramen magnum এবং নীচে coccyx পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই space-এ থাকে areolar, tissue, fat, spinal nerve roots, spinal arteries এবং venous plexus। এই space-এ সাধারণভাবে negative প্রেসার থাকে। এই নেগেটিভ প্রেসার epidural অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় জায়গাটিকে চিনতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

Epidural space চেনার বেশ কয়েকটি উপায় আছে। Lumbar puncture করার সময় সূচটি ligamentum flavumকে ফুঁড়ে যাওয়ার পর প্রতিবন্ধ (resistance) বেশ কমে যায়, এটা বোঝা যায়। তখন styletটি খুলে নিয়ে ঐ space-এ বাতাস ইঞ্জেকশন দিলে বাতাস বেশ ভালোভাবে চলে যাবে ঐ epidural space-এ। অবশ্য অন্যভাবেও ঐ space বোঝা যায়। Spinal needle-এর hub-এ saline drop আগে থেকে দেওয়া থাকলে—ঐ space-এ সূচ গেলেই saline dropটি নেগেটিভ প্রেসারে ভেতরে টেনে

নেয়। একটা ফোলানো বেলুন সূচের hub-এ লাগানো থাকলে epidural space-এ সূচের অগ্রভাগে গেলেই বেলুনটি চুপসে যায়।

সাধারণভাবে রোগীকে শুইয়ে পাশ ফিরিয়ে ঠিক যেমনটি spinal অ্যানেস্থিসিয়ার সময় করা হয় তেমন ভাবেই epidural অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয়। রোগীকে বসিয়ে epidural অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রেও বিশেষ aseptic measureগুলি নেওয়া উচিত। আগে থেকে কোন intervertebral space-এ দেওয়া হবে সেটা ঠিক করে spinal needle খুব আস্তে আস্তে চালাতে হবে। Ligamentum flavum দিয়ে যাওয়ার পর styletটি বের করে নেওয়া হয় তখন—কোন cerebrospinal fluid আসবে না। তখন সিরিঞ্জ দিয়ে বাতাস দিলে তা ভালোভাবে চলে যাবে। এতেই বুঝতে হবে সূচটি ঠিক space-এ আছে—তখন লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ আস্তে আস্তে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ১.৫% লিগনোকেন solution দিয়ে epidural অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ১৫ থেকে ৩৫ মি. লি. লিগনোকেন লাগে। কতটা ওষুধ লাগবে অবশ্য তা নির্ভর করে কতটা block করতে হবে এবং কী অপারেশন হবে তার উপর।

Epidural অ্যানেস্থিসিয়া দিলে meningitis এবং neurological উপসর্গ সাধারণতঃ হয় না। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে মাথা ধরা হয় না। রোগীর রক্তচাপ একটু কমতে পারে, তবে খুব বেশী কমে না। বুকের অসুখ থাকলে epidural অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। এটি ভালোভাবে ব্যথা উপশম করে এবং muscle relaxation করে। মোটের উপর অন্য সব অ্যানেস্থিসিয়ার পদ্ধতির তুলনায় epidural অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীর physiological derangement কম হয়। অবশ্য শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাহত হওয়া বা পরে কম হওয়া এ অ্যানেস্থিসিয়ায় হতেও পারে।

এই epidural অ্যানেস্থিসিয়া খুব যত্ন নিয়ে করা উচিত। অন্যমনস্কভাবে দিলে dural puncture হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে spinal অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যেতে পারে। আবার সূচটি একটু সরিয়ে এনে epidural space-এ ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য আবার অন্য লেভেলে নতুন করে puncture করা যেতেও পারে।

অনিচ্ছাকৃতভাবে subarachnoid space-এ অনেকটা লিগনোকেন দেওয়ার ফলে total spinal analgesia হতে পারে। এতে রোগীর রক্তচাপ অত্যন্ত

কমে যায়। শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। চোখের মণি প্রসারিত হয়ে পড়ে। রোগীর সংজ্ঞালোপ ঘটে। এমতাবস্থায় রোগীকে সংগে সংগে endotracheal intubation করে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে শ্বাসকার্য চালাতে হবে। শিরাপথে fluid দিতে হবে। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor দেওয়াও উচিত।

যাই হোক, epidural অ্যানেস্থিসিয়া সবরকম পেটের অপারেশনে, পায়ের অপারেশনে এবং Caesarean section-এ ভালোভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রসববেদনা থেকে অব্যাহতি দিতে অনেক সময় এ পদ্ধতির ব্যবহার হয়। অপারেশনের পর ব্যথা-বেদনা দূর করতে, ক্যানসার জাতীয় অসুখে intractable pain থেকে রোগীকে বাঁচাতে epidural অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয়।

একটিমাত্র ইঞ্জেকশনে epidural অ্যানেস্থিসিয়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। সুতরাং অনেকক্ষণ স্থায়ী করার জন্য continuous epidural দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে একটি বিশেষ ধরনের spinal needle ব্যবহার করা হয়—একে বলে Tuohy needle। এর bevel দিকটি একটু বাঁকানো—এর ফলে dura mater ফুটো হয়ে যাওয়ার ঘটনা কমে এবং প্রয়োজনে এই spinal needle দিয়ে ক্যাথেটার দিলে ইচ্ছেমত দিকে পাঠানো যায়। এক্ষেত্রে epidural space-এ Tuohy needle দেওয়া হয়। Stylet বের করে নিয়ে একটি লম্বা সরু ক্যাথেটার ওর মধ্য দিয়ে epidural space-এ পাঠানো হয়। তারপর সূচটি সাবধানে বের করে নেওয়া হয়। ক্যাথেটারটি epidural space-এ থাকে এবং বাইরের দিকটি ভালোভাবে aseptic precaution নিয়ে পিঠে strap করা থাকে। প্রয়োজন মত বারবার লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এর মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর ব্যথা-বেদনা কমাতে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

Epidural অ্যানেস্থিসিয়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিফল হতে পারে। সেই বিফলতা সাধারণতঃ দুটি কারণে হয়—প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে প্রায়োগিক দক্ষতা এবং ভালো অভিজ্ঞতার অভাবে হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রোগীর নির্বাচন যদি ঠিকমত না হয় তবে অকৃতকার্য হতে পারে—বিশেষতঃ বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে, যেখানে interspinous ligament এবং ligamentum flavum-এ অত্যধিক fibrosis বা calcification হয়ে গেছে। যদি রোগীর শিরদাঁড়ায় কোন anatomical

বিচ্যুতি থাকে তবে তার epidural space-এ puncture করাই কষ্টকর হয় এবং সেক্ষেত্রেও বিফলতা অসম্ভব নয়।

Epidural space ঠিকমত puncture ক'রে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন করলেও কতদূর analgesia হবে বা তা পর্যাপ্ত হবে কিনা তা নির্ভর করে বেশ কয়েকটি জিনিসের উপর :

১। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের পরিমাণ (volume) : বেশী segmentকে block করতে গেলে বেশী পরিমাণ ওষুধ লাগে।

২। ঠিকমত segment block করতে গেলে site of puncture ঠিক মত হওয়া দরকার। ঠিক interspace নির্বাচন করে puncture করতে হবে।

৩। ঠিক মত concentration-এ লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দেওয়া উচিত।

৪। Speed of injection : সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মি. লি. ইঞ্জেককশন দেওয়া উচিত। কম rate-এ ইঞ্জেকশন দিলে spread কমে যায়। অল্প অল্প করে বার বার ইঞ্জেকশন দিলেও spread বিঘ্নিত হয়। তাড়াতাড়ি ইঞ্জেকশনে spread বিস্তৃত হয়।

৫। রোগীর position : সাধারণভাবে রোগীকে বসিয়ে বা পাশ ফিরিয়ে ইঞ্জেকসন দিলে ওষুধের spread উপরে এবং নীচে সমান ভাবেই যায়। তবে মাথা নীচের দিকে থাকলে (head down position-এ) উপরের দিকে spread ৩ থেকে ৫ segment বেড়ে যেতে পারে।

৬। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের specific gravity অনেকাংশে epidural spread নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে epidural spread কমে, গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে spread বেড়ে যেতে পারে। লম্বা লোকেদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রার ওষুধ লাগে।

Caudal অ্যানেস্থিসিয়া

এটিকে extradural sacral blockও বলে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে Cathelin এবং Sicard এই পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতিতে লিগনোকেন

জাতীয় ওষুধ sacral canal-এর মধ্যে extradural spaceএ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং এর ফলে রোগীর perineal region পুরোপুরি অসাড় হয়ে পড়ে। একটি মাত্র ইঞ্জেকশন দিয়েই caudal analgesia হয় কিন্তু বহুক্ষণ স্থায়ী করার জন্য continuous caudal blockও করা যায়। সাধারণতঃ ব্যথাহীন প্রসবের জন্যই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। লিগনোকেন ১.৫% বা ২% একবার ইঞ্জেকশন দিলে প্রায় দেড় ঘণ্টার মত অ্যানেস্থিসিয়া কার্যকরী থাকে।

Caudal block-এর ফলে রোগীর cardiovascular অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। রোগীর নাড়ীর গতি অল্প কমতে পারে কিন্তু রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন হেরফের দেখা যায় না।

Caudal block ৩ রকমের হতে পারে। এর প্রথমটি low block, যেখানে L_2 পর্যন্ত অসাড় হয়। এটি perinium, rectum, anal canal, urethra, vagina ইত্যাদির শল্য চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়টি mid block—যেখানে T_{10} পর্যন্ত অসাড় হয়। এতে হার্নিয়া এবং পায়ের অপারেশন করা যায়। শেষেরটি high block—এতে প্রায় T_4 পর্যন্ত block হয়। এতে পেটের উপরের দিকেও অপারেশন করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকায় এই পদ্ধতি বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয় না।

অপারেশন ছাড়াও pelvis বা পায়ের intractable ব্যথায়, সায়েটিকাতে, কোমরের ব্যথায় এই caudal block করা যায়। এতে রোগনির্ণয়ের এবং অনেক সময় নিরাময়ের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

এই caudal block-এ কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে। এতে রোগীর কোন রকমের মাথাব্যথা হয় না। রোগীর neurological কোন উপসর্গ হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ডজনিত কোন কুফল দেখা দেয় না।

কিন্তু কিছু অসুবিধাও আছে। এই পদ্ধতিতে কিছু technical difficulty হতে পারে বিশেষতঃ sacrum-এ কোন গণ্ডগোল থাকলে। এই পদ্ধতিতে সময় একটু বেশীই লাগে। Subarachnoid বা intravascular ইঞ্জেকশন হয়ে যেতে পারে। বেশী উপরের block-এ রক্তচাপ কমে যেতে পারে। High block-এ অনেক ওষুধ লাগে—তাই drug toxicity হতে পারে। কিছু জীবাণু (infection) সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। Muscular relaxation

প্রয়োজন মত যথেষ্ট নাও হতে পারে। মোটা স্থূল লোকেদের caudal block করা বেশ কঠিন।

Caudal block কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে না করাই শ্রেয়। রোগীর যদি central nervous system-এ অসুখ থাকে, ইঞ্জেকশন দেবার জায়গায় যদি infection থাকে, pilonidal cyst থাকলে বা sacrum-এ কোন বিকৃতি থাকলে caudal block করা উচিত নয়।

রোগীকে উপুড় করে শোয়ানো হয়। Hip-এর নীচে একটি পাতলা বালিশ দিলে ভালো হয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার জায়গা ভালোভাবে আয়োডিন এবং স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। রোগীর coccyx-এর tip, sacral cornu এবং sacral hiatus ভালো করে বুঝে নিতে হবে। সাধারণতঃ sacral cornu-র মাঝখানে sacral hiatus-এর উপর একটু লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে একটি skin wheal করা হয়। এখানেই spinal needle ঠিক ৪৫° কোণে চালানো হয় এবং উপরের দিকে ঠেলা হয় যতক্ষণ না sacrococcygeal ligament দিয়ে যায়। তারপর সূচের hub ৩০° কোণে নীচের দিকে নামানো হয় এবং সূচটি ২ থেকে ৩ সে. মি. sacral canal-এর ভিতর যায়। Spinal needle কখনও যেন S_2-র উপরের দিকে না যায় কেন না dural sac সাধারণতঃ S_1 এবং S_2-র মাঝখানে শেষ হয়। এরপর styletটি বের করে নেওয়া হয়। সিরিঞ্জ দিয়ে aspiration করে দেখা হয় রক্ত বা cerebrospinal fluid আসছে কিনা। যদি না আসে তখন সিরিঞ্জে হাওয়া দিয়ে loss of resistance test করা হয়। যদি ঠিক থাকে, লিগনোকেন ১·৫% ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। মোট কতটা ওষুধ দেওয়া হবে তা নির্ভর করে কতটা height of analgesia দরকার—তার উপর। রোগীকে তারপর অপারেশনের প্রয়োজনমত position-এ শোয়ানো হয়।

কয়েকটি Nerve Block-এর প্রয়োগ পদ্ধতি

Brachial Plexus Block :

এই plexus সাধারণতঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম সারভাইকেল এবং প্রথম থোরাসিক (C_5, C_6, C_7, C_8 এবং T_1) নার্ভের anterior primary division দিয়ে তৈরী হয়। এটিতে অনেক সময় চতুর্থ সারভাইকেল (C_4) এবং দ্বিতীয়

থোরাসিক (T_2) নার্ভের কিছু branch এর সংগে যুক্ত থাকে। এই নার্ভগুলি প্রথম rib-এর দিকে একত্রিত হয় এবং anterior scalene ও medial scalene muscle এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। Clavicle-এর নীচের দিকে এটি subclavian vein এবং arteryর কাছাকাছি থাকে। এই plexus সমস্ত হাতের motor এবং sensory supply করে।

Brachial plexus block দুই ভাবে করা যেতে পারে। একটিতে supraclavicular region-এ block করা হয় এবং অপরটিতে axillary region-এ।

Supraclavicular প্রয়োগ পদ্ধতি :

রোগীকে অপারেশন টেবিলে চিৎ করে শোয়ানো হয়। যেদিকে block করা হবে মাথাটি তার উল্টোদিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে এবং সেই দিকের হাতটি শরীরের পাশ দিয়ে নিয়ে একটু নীচের দিকে টেনে রাখতে হবে।

প্রথমেই clavicle-এর midpoint বের করতে হবে। তার ঠিক ১ সে. মি. উপরে চামড়ায় একটু লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দিয়ে একটি wheal তুলতে হবে। এর পর subclavian artery ঠিক মত palpate করে আঙুলের সাহায্যে ভেতরের এবং নীচের দিকে সরিয়ে রাখতে হবে।

এরপর একটি লম্বা (৫ সে. মি.) স্চ সেই wheal-এ ফোটাতে হবে এবং আস্তে আস্তে নীচের দিকে এবং পেছনের দিকে চালাতে হবে যতক্ষণ না প্রথম rib-এর গায়ে লাগে। স্চটি সাধারণতঃ ৩০° কোণে দেওয়া হয়। যদি স্চের অগ্রভাগ একেবারে plexus-এ লেগে যায় তবে রোগী তা বুঝতে পারে এবং ইলেকট্রিক শক লাগার মত অনুভূতি হয়। যদি plexus-এ নাও লাগে তবুও ঐ জায়গাতেই প্রথম rib-এর উপরে স্চটি রেখে একটি সিরিঞ্জ দিয়ে aspiration test করা হয়। যখন কোন রক্ত না আসে তখন বুঝতে হবে স্চ ঠিক জায়গায় আছে এবং সেখানে ১·৫% লিগনোকেন ১০ মি. লি. ইঞ্জেকশন দিতে হবে। তারপর স্চটি একটু তুলে নিয়ে ১ সে. মি. দূরে আবার সেই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে এরকম ১ সে. মি. দূর দূর মোট দুটি বা তিনটি ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে। তার পর স্চটি বের করে নেওয়া হয় এবং সে জায়গায় উপযুক্ত dressing করা হয়।

এইভাবে block করার পর অন্ততঃ ১০ মিনিট পরে অপারেশন আরম্ভ

করতে দেওয়া উচিত। এতে sensory block পুরোপুরি হয় বটে তবে motor function অনেক কমে গেলেও কিন্তু একেবারে চলে যায়না। এই motor block-এ হাতের প্রায় সব অপারেশনই অত্যন্ত সুন্দর এবং ব্যথাহীন-ভাবে করা সম্ভব।

এই supraclavicular approach-এ কয়েকটি complication হতে পারে। সূচটি যদি ফুসফুসে ফুটে যায় তবে pneumothorax হতে পারে। Subclavian artery এবং Jugular vein-এ ক্ষতি হলে অত্যধিক রক্তপাত হতে পারে। Phrenic nerve block হয়ে অনভিপ্রেত diaphragmatic paralysis হতে পারে।

Axillary প্রয়োগ-পদ্ধতি ঃ

এইভাবেও অতি সুষ্ঠুভাবে brachial plexus block করা যায় এবং এতে pneumothorax হবার কোন ভয় থাকে না। অনভিপ্রেত phrenic nerve, recurrent laryngeal nerve এবং vagus nerve block হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রয়োগপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং নিরাপদ। এটি দুইদিকে block করলেও কোন diaphragm paralysis বা শ্বাসকষ্টের কোন ভয় থাকে না।

এই brachial plexus clavicle-এর নীচ দিয়ে গিয়ে রোগীর axillaতে যায়। এই জায়গায় plexus-এর তিনটি cord, axillary artery এবং vein—এক সংগে একটি connective tissue sheath-এর মধ্যে থাকে। একমাত্র musculocutaneous nerve এই axilla-র অনেক আগেই plexus থেকে বেরিয়ে যায়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে এটি প্রায়ই block হয় না।

রোগী অপারেশন টেবিলে শোয়ার পর যেদিকে block দেওয়া হবে সেই হাত সমকোণে abducted অবস্থায় রাখা হয়, forearm অবশ্যই flexed এবং externally rotated অবস্থায় থাকে। ইঞ্জেকশনের জায়গা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। Axillary artery ভালোভাবে palpate করতে হবে। ঠিক সেখানেই একটি skin wheal তুলতে হবে বগলের একেবারে উপরের দিকে। তারপর একটি সূচ ধীরে ধীরে চালানো হয় যতক্ষণ না fascial sheath ভেদ করে। সেখানেই ৫ থেকে ১০ মিলিলিটার ১·৫% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দিতে হবে। সূচটি আবার তুলে নিয়ে axillary artery-র পেছনের দিকে একইভাবে ঐ

ইঞ্জেকশন দিতে হবে। এরপর ইঞ্জেকশনের জায়গায় dressing করে দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ ১০ মিনিটের মধ্যে এই block কার্যকরী হয়।

Pudendal nerve block :

Pudendal nerve দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সেকরাল (sacral) নার্ভের anterior primary division দিয়ে তৈরী এবং এটি pudendal plexus এর সব থেকে বড় নার্ভ। এই নার্ভ greater sciatic foramen হয়ে pelvic cavity থেকে বেরিয়ে আসে এবং এটি piriformis এবং coccygeus muscle-এর মধ্যে থাকে। তারপর এটি ischial spine হয়ে lesser sciatic foramen দিয়ে perineum-এ আসে। এই নার্ভ সাধারণতঃ ischial tuberosity-র medial এবং posterior দিকে ভালোভাবে block করা যায়।

সাধারণতঃ perineum-এর অপারেশনে, forceps delivery, episiotomy, piles এবং perineal tear repair ইত্যাদি অপারেশনে এই block করা হয়।

Pudendal block দুই ভাবে করা যায়। একটি trans-perineal approach-এ এবং অন্যটি trans-vaginal approach-এ।

Trans-perineal প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

এই block সর্বপ্রথম জার্মানীর Muller ব্যবহার করেন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। রোগীকে প্রথমে lithotomy position-এ শোয়ানো হয়। তারপর ischial tuberosity-র posteromedial margin ভালোভাবে বুঝে নিতে হয়। সেই-খানে চামড়ায় একটি wheal তৈরী করা হয়। তারপর একটি বড় সূচ ধীরে ধীরে ischium-এর medially এবং posteriorly ২·৫ সে. মি. প্রবেশ করানো হয় এবং সেখানে ৫ মি. লি. ২% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। দুইদিকেই এই block করতে হয়।

Trans-vaginal প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে Wilds এই ভাবে block প্রথম ব্যবহার করেন। এখানেও রোগীকে lithotomy অবস্থায় শোয়ানো হয়। Vaginaর মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ischial spine বুঝে নিতে হয়। তারপর sacrospinous ligament হয়ে spine পর্যন্ত palpate করা হয়। তারপর একটি লম্বা সূচ—spinal needle হলে ভালো হয়—আঙ্গুলের পার্শ দিয়ে গিয়ে ischial spine পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই

১০ থেকে ১৫ মিলিলিটার ০·৫% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় ঠিক ischial spine-এর পিছন দিকে। এই একই পদ্ধতিতে অন্যদিকের pudendal nerve block করতে হবে।

Intercostal nerve block ঃ

Intercostal nerve block সাধারণতঃ chest এবং abdominal wall-এর কোন কিছু অপারেশনে, empyema drainage করতে হলে বা rib resection-এর অপারেশনে ব্যবহার করা যায়। Chest injury বা rib fracture হলে ব্যথা কমানোর জন্যও এই intercostal block খুবই উপযোগী।

প্রত্যেকটি thoracic spinal nerve, intervertebral foramen থেকে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি দুটি vertebraর transverse process-এর মাঝামাঝি থাকে। এই নার্ভ intercostal space-এর মধ্যে গিয়ে rib-এর subcostal groove-এর মধ্যে থাকে। Thoracic vein, artery এবং nerve পরপর সাজানো থাকে। পিছনের দিকে thoracic nerve সাধারণতঃ external intercostal muscle এবং internal intercostal fascia-র মধ্যে থাকে। সামনের দিকে এই নার্ভ internal intercostal muscle এবং external intercostal fascia-র মধ্যে থাকে। Thoracic nerveকে যখন-inter-vertebral foramen থেকে বের হওয়ার পরই block করা হয় তখন তাকে paravertebral block বলে। এখানে thoracic nerve তার ramus communicans এবং posterior division সমেত blocked হয়। Thoracic nerve যখন angle of rib-এর পর থেকে block করা হয় তখনই সেটি intercostal block।

Intercostal নার্ভ rib-এর যে কোন সুবিধাজনক অবস্থানে block করা যায়—পেছনের দিকে, পাশে অথবা সামনের দিকে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে angle of ribকেই বেছে নেওয়া হয়। সাধারণত: upper thoracic region-এ midspinons line থেকে ৫ সে. মি. দূরে এবং lower thoracic region-এ ১০ সে. মি. দূরে intercostal block করা হয়।

চামড়ায় প্রথমে একটি wheal তৈরী করা হয় rib-এর নীচের বর্ডারে, ঠিক তার angle-এ। রোগীকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রেখে আগেই ribটি ভালোভাবে palpate করে নেওয়া উচিত। একজন সহযোগী রোগীকে ধরে রাখলে

সুবিধে হয়। এরপর একটি সূচ চামড়ার সংগে ঠিক লম্বভাবে (perpendicular) রেখে বিঁধতে হবে—যতক্ষণ না হাড়ে লাগে। এবার আর একটু ঢুকিয়ে rib-এর নীচের বর্ডার পর্যন্ত যেতে হবে এবং intercostal fascia দিয়ে যাবার সময় অনুভব করে বুঝতে হবে। এখানেই ৫ থেকে ৭ মি.লি. ১·৫% লিগনোকেন দিতে হবে।

অপারেশনের গুরুত্ব এবং ব্যাপকতা অনুযায়ী কতগুলি nerve block লাগবে তা ঠিক করা হয়। সাধারণতঃ ৫ থেকে ৬টি segment block করতে হয় এবং সব সময়ে তা দুদিকেই করতে হবে।

হাতের বা পায়ের আঙুলের ring block ঃ

এটি সাধারণতঃ হাতের বা পায়ের একটি আঙুলের অথবা তার নখের অপারেশনে ব্যবহার করা হয়। আঙুলের গোড়া বা base-এর দুদিকে দুটি ইঞ্জেকশন দিয়ে digital নার্ভগুলি block করা হয়। সাধারণতঃ ১% লিগনোকেন ২ থেকে ৪ মি. লি. ব্যবহার করা হয়। এই solution-এ এড্রেনলিন কখনই দেওয়া উচিত নয়, কেননা এর ফলে আঙুলে পচন বা gangrene হয়ে যেতে পারে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর একটি সরু রবারের টিউব দিয়ে আঙুলে শক্ত করে বাঁধন দেওয়া হয়—এর ফল রক্তপাত কম হয় এবং অ্যানেস্থিসিয়া অনেকক্ষণ কার্যকরী থাকে।

Circumcision করার জন্য field block :

Penis-এর sensory nerve supply সাধারণতঃ ৪টি নার্ভ দিয়ে হয় :

১। Internal pudendal nerves

২। Dorsal nerves of penis—দুই দিকে দুইটি corpus cavernosum-এর dorsal surface-এ থাকে।

৩। Ilioinguinal এবং genitofemoral nerves—penis-এর base-এর দিকে চামড়ায় sensory supply করে।

৪। Posterior scrotal branches of perineal nerves।

পদ্ধতি ঃ

Penis এর base-এ intradermal এবং subcutaneous ring block করা হয়। Dorsal nerve দুই দিকেই penis-এর dorsum-এ ইঞ্জেকশন দিয়ে block করা হয়। সাধারণতঃ ৫ মি. লি. ১% লিগনোকেন দিলেই চলে এবং

needle pointটি corpus cavernosum-এর উপরেই রাখতে হয়। Penisটি উপরের দিকে তুলে ঠিক base-এ ২ মি. লি. ১% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়—যেখানে corpora cavernosa এবং corpus spongiosum-এর একটি groove আছে। এতে para-urethral nerveগুলি block হয়।

এই block করার জন্য লিগনোকেন প্লেন ব্যবহার করা উচিত। এডরেনালিন কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়, কেন না এর end arteries-এ সংকোচন ঘটলে পচন বা gangrene পর্য্যন্ত হতে পারে।

Inguinal hernia-র অপারেশনে field block :

এই field block সাধারণতঃ করা হয় যখন রোগীকে জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া অথবা spinal বা epidural অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার অসুবিধা থাকে। Inguinal canal মোটামুটি দেড় ইঞ্চির মত লম্বা হয় এবং এটি external inguinal ring থেকে internal inguinal ring পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এটি inguinal ligament-এর ভিতরের অর্ধেকের উপরে থাকে। Inguinal hernia দুরকমের হতে পারে—direct অথবা indirect। এখানকার nerve supply সাধারণ ভাবে একাদশ এবং দ্বাদশ থোরাসিক এবং প্রথম ও দ্বিতীয় লাম্বার নার্ভ থেকে আসে। সুতরাং iliohypogastric, ilioinguinal এবং genitofemorai nerve এই হার্নিয়া অপারেশনে block করতে হয়।

প্রথমে একটি skin wheal তৈরী করা হয় anterior superior iliac spine-এর ১ ইঞ্চি ভিতরের দিকে। এখানে একটি সূচ দেওয়া হয় ঠিক খাড়াভাবে যতক্ষণ না external oblique apponeurosis-এর মধ্য দিয়ে যায়। এখানেই ২০ মি. লি. ১% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এইভাবে ilioinguinal এবং iliohypogastric নার্ভগুলি block করা হয়। সূচটি বের করে নেওয়ার সময় সব স্তরেই একটু একটু করে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

এরপর pubic spine-এর উপর একটি skin wheal করা হয়। যেখানে চামড়ার নীচ দিয়ে একটি লম্বা সূচ একেবারে নাভি পর্যন্ত পাঠানো হয় এবং পুরো জায়গায় ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এতে শরীরের উল্টো দিক থেকে যে নার্ভগুলি আসে সেগুলি block হয়।

এরপর আর একটি skin wheal করা হয়—mid-inguinal point থেকে ঠিক আধ ইঞ্চি উপরে। এখান দিয়ে একটি সূচ পাঠানো হয় যতক্ষণ না

external oblique apponeurosis-এর মধ্য দিয়ে যায়। সেখানে ২০ মি.লি. ১% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এভাবে genital branch of genitofemoral নার্ভটিকে block করা হয়।

এসব ছাড়াও incision line-এ, external ring-এ spermatic sympathetic plexus block করার জন্য এবং internal ring-এও অপারেশনের সময় লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

শিরাপথে সীমাবদ্ধ বেদনাহীনতা

(Intravenous local analgesia)

এই পদ্ধতিতে শিরাপথে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হাতে বা পায়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এর আগে নির্দিষ্ট হাতে বা পায়ে arterial tourniquet বাঁধা হয়। এর ফলে সেই হাত বা পা ব্যথা অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে এবং সেখানে ব্যথাহীন শল্যচিকিৎসা করা যায়। একেই intravenous local analgesia বলা হয়।

অবশ্য অন্য কারণেও লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ শিরাপথে দেওয়া হয়— এমন কি জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়ার জন্যও এর ব্যবহার হয়েছে। Status epilepticus এবং cardiac arrhythmia চিকিৎসার জন্য এভাবে এই লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের ব্যবহার সুবিদিত।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম August Bier এই পদ্ধতিতে regional analgesia করেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রোকেনের বদলে লিগনোকেন ব্যবহার করে এই পদ্ধতি পুনরায় প্রচলিত করেন।

লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ শিরাপথে দিলে vasodilatation হয় এবং ওষুধ রক্তনালী থেকে diffuse করে tissue-র মধ্যে চলে যায়। এর ফলে ছোট nerve fibre এবং nerve endingগুলি blocked হয়ে যায়। Traumatised tissue হলে এই diffusion অনেক গুণ বেড়ে যায়। এই পদ্ধতিতে অ্যানেস্থিসিয়া দিতে কম concentration-এর অনেক বেশী পরিমাণে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ লাগে। কোন নির্দিষ্ট হাতের বা পায়ের blood volume কমানোর জন্য এবং রক্তে অ্যানেস্থিসিয়ায় ওষুধের dilution effect

এড়ানোর জন্য সেই হাত বা পা টুর্নিকেট দিয়ে প্রায় রক্তশূন্য করে নেওয়া হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি :

যেখানে অপারেশন করা হবে তার উপরে প্রথমে একটি sphygmomanometer cuff ভালোভাবে বাঁধা হয় এবং যথারীতি রক্তচাপ—বিশেষত: systolic রক্তচাপ মাপা হয়। এরপর একটি ভালো শিরায় একটি self-sealing needle দেওয়া হয় এবং ভালোভাবে strap করে রাখা হয়। তারপর হাত বা পা একটু উপরের দিকে তুলে রাখা হয় যাতে বেশীরভাগ রক্ত ঐ জায়গা থেকে সরে যায়। তারপর ম্যানোমিটার কাফ্ বায়ুস্ফীত করা হয়—অন্তত: যা systolic রক্তচাপ তার ৩০ মি. মি. মার্কারীর উপর লেভেলে। সেইখানেই কাফ বায়ুস্ফীত করে রাখা হয়। তারপর সূচ দিয়ে শিরাপথে লিগনোকেন দেওয়া হয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে ভালো analgesia এবং muscular relaxation হয়।

অনেক সময় arterial টুর্নিকেট এর বদলে Esmarch ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হয় এবং এটি রক্তশূন্য করার পক্ষে বেশী উপযোগী। সাধারণভাবে কতটা পরিমাণ এবং মাত্রার ওষুধ দেওয়া হবে তা নির্ভর করে কী ওষুধ দেওয়া হচ্ছে এবং কোথায় অপারেশন হবে তার উপর। হাতের ক্ষেত্রে ০.৫% লিগনোকেন ৪০ থেকে ৫০ মি.লি. ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য ১% লিগনোকেনও ব্যবহার করা হয়। পায়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশী পরিমাণ লাগে বলে ০.২৫% লিগনোকেন দেওয়া হয়। তবে লিগনোকেনের মোট পরিমাণ কখনও ৩ মি. গ্রা./কে. জি.-র বেশী হওয়া উচিত নয়। টুর্নিকেট যদি পায়ে বাঁধা হয় তবে ৬০ মি.লি. solution লাগে এবং হাতে বাঁধা হলে ২০ থেকে ২৫ মি. লি. solution-এ কাজ হয়।

রোগীর টুর্নিকেটে বাঁধনের জায়গায় অস্বস্তি বা ব্যথা হলে নীচের দিকে আরও একটি টুর্নিকেট দেওয়া হয় এবং তার পরে প্রথমটি খুলে দেওয়া হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার প্রথম দিকে হাতে বা পায়ে গরম অনুভব হয়, একটু ঝিনঝিন করে এবং আস্তে আস্তে ঐ জায়গা ব্যথা-অনুভূতিহীন হয়ে যায়। Muscular paralysis বেশ ভালো হয়।

অপারেশন শেষ হওয়ার পর sphygmomanometer cuff-এর হাওয়া বের করে দেওয়া হয় অথবা টুর্নিকেট বা Esmarch ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হয়।

এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগীর অনুভূতি ফিরে আসে—muscle toneও ফিরে আসে। এসময় রোগীর দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত নতুবা হঠাৎ রক্তপ্রবাহে বেশী ওষুধ গিয়ে toxic reaction ঘটাতে পারে। এতে রোগী হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়তে পারে, নাড়ীর গতি কমে যেতে পারে এবং রক্তচাপও অনেক কমে যেতে পারে। এই সব উপসর্গে রোগীর supportive treatment দিলেই উপকার হয়।

Intra-arterial local analgesia :

এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম Goyanes ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতিতেও একটি sphygomanometer cuff হাতে বাঁধা হয় এবং এর কাফ বায়ু-স্ফীত অবস্থায় রাখা হয় যতক্ষণ না হাতের নাড়ী না অনুভূত হয়। এরপর একটি intra-arterial ক্যাথেটার দিয়ে ০·৫% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় যতক্ষণ না ব্যথা-অনুভূতি চলে যায়। এই পদ্ধতিতে ওষুধ কম লাগে, সাধারণতঃ ১৫ মি. লি. ওষুধেই কাজ পাওয়া যায়। অনেক সময় সাময়িকভাবে vascular spasm হতে পারে। অপারেশনের পর কাফটির বাতাস বের করে দেওয়া হয় এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার ব্যথা-অনুভূতি ফিরে আসে।

চতুর্দশ অধ্যায়

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী নানা উপসর্গ

অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়া শেষ হওয়ার পর রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে recovery room অথবা ওয়ার্ডে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয়। রোগীকে ওয়ার্ডে পাঠাবার আগে নিম্নোক্ত জিনিসগুলি বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবে। কথা বললে উত্তর দেবে। চোখ খুলতে বললে চোখ খুলবে। রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ মোটামুটি ঠিক থাকবে। Cyanosis থাকবে না। রোগীর অপারেশনের জায়গায় ড্রেসিং বেশ শুকনো থাকবে। বেশী রক্তপাত ঘটলে ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগীর history sheet-এ রোগীর এখনকার কী অবস্থা তা লিখে রাখতে হবে। ওয়ার্ডে আরও কী ব্যবস্থা নিতে হবে তাও লেখা থাকবে। রোগী অপারেশন থিয়েটারে কী ওষুধ পেয়েছে, কী fluid পেয়েছে—তাও লিখতে হবে। রক্ত দেওয়া হলে তার হিসাবও থাকবে।

অ্যানেস্থিসিয়ার পর রোগীর অনেক রকম উপসর্গ হতে পারে। তাদের কয়েকটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে জেনে রাখা উচিত এবং দরকার মত চিকিৎসা করা উচিত।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী অস্থিরতা (Restlessness) ঃ

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর অস্থিরতা একটি খুব সাধারণ উপসর্গ। এটি নানা কারণে হতে পারে—যেমন-অপারেশনের ব্যথা-বেদনা, কিছু ওষুধের জন্য, শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে, রোগীর মানসিক অশান্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যতক্ষণ রোগী অ্যানেস্থিসিয়ায় ছিল ততক্ষণ কোন ব্যথা-বেদনা ছিল না ঠিকই, তবে অ্যানেস্থিসিয়া শেষ হওয়ার পরে অপারেশনের জায়গায় ব্যথা বেদনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিছু অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ, যেমন—হ্যালোথেনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য রোগী তাড়াতাড়ি অস্থির বা চঞ্চল চতে পারে। এদিক থেকে ইথারের কার্যকারিতা শরীরে অনেকক্ষণ থাকে।

শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে তার প্রথম দিকে রোগী খুবই অস্থির হয়, ছটপট করে। এটা ব্যাহত শ্বাসক্রিয়ার জন্য হতে পারে, আবার রক্তচাপ অত্যন্ত কম হওয়ার জন্য বা কিউর‍্যারির প্রতিষেধক ঠিকমত না দেওয়ার জন্যও হতে পারে।

কিছু ওষুধ, যেমন—বারবিচুরেট, phenothiazine ইত্যাদি ব্যথা-বেদনা তো উপশম করেই না উপরন্তু ব্যথা-অনুভূতি বাড়িয়ে দেয়। ঐ জাতীয় ওষুধ অপারেশনের আগে বা পরে ব্যবহার করলে রোগীর অস্থিরতা বাড়তে পারে।

অপারেশনের আগে রোগী অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকার জন্য রোগীর শরীরে শর্করা অনেক কমে যেতে পারে। তার জন্য অস্থিরতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আবার রোগীর মানসিক অবস্থাও বিবেচনা করা দরকার। রোগীর বেশী ভয়ভাবনা থাকলে সহজেই সে অস্থির হয়ে ওঠে।

রোগীর এই অস্থিরতা বাড়লে নাড়ীর গতি বেড়ে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়ে যায়, ঘাম হতে থাকে, রক্তচাপ কমে যায়। রোগী ঠিকমত সহযোগিতা করে না। Drip নষ্ট হয়ে যায়। শয্যা থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাও বিচিত্র নয়।

সুতরাং অস্থিরতা কমানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অ্যানেস্থিসিয়ার আগে থেকেই রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। বারবিচুরেট ইত্যাদি ওষুধ এড়িয়ে চলাই ভালো। অযথা বেশীক্ষণ রোগীকে না খাইয়ে রাখা উচিত নয়। অস্থিরতা ঘটলে কী কারণে হচ্ছে তা দেখা দরকার। ব্যথার জন্য হলে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া দরকার। অক্সিজেনের অভাব ঘটলে অক্সিজেন দিতে হবে। শরীর গ্লুকোজ কমে গেলে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দেওয়া দরকার।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী বমন ঃ

এটি অত্যন্ত খারাপ উপসর্গ। বমি করার ফলে নানারকমের বিপত্তি হতে পারে। রোগীর শক্ত বমি শ্বাসনালী বন্ধ ক'রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। পাকস্থলীর অম্ল রস শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসে গেলে aspiration pneumonitis হতে পারে। বার বার অত্যধিক বমি হলে শরীরে জলের ভাগে, জৈবিক লবণের ভাগে, অম্ল ক্ষারের ভাগে তারতম্য ঘটাতে পারে। রোগীর intraocular, intracranial, intrathoracic প্রেশার বেড়ে যায়। রোগী অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে।

যে কোন রোগীর অ্যানেস্থিসিয়ার পরে বমি হতে পারে। তবে কয়েকটি

ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাধারণভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে বমি বেশী হয়, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে। অনেকক্ষণ ধরে অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার পর, পেটের অপারেশনের পর, হঠাৎ অপারেশনের ক্ষেত্রে যেখানে রোগী কিছুক্ষণ আগেই হয়তো খেয়েছে, যে সব রোগীর pyloric stenosis অথবা intestinal obstruction আছে—এসবের ক্ষেত্রে বমি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিছু কিছু ওষুধ, যেমন—মরফিন, পেথিডিন, ইথার ইত্যাদি বমি ঘটাতে পারে। রোগীর মানসিক অবস্থার দিকেও বমি নির্ভর করে। রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে অথবা রক্তচাপ অত্যন্ত কমে গেলেও বমি হতে পারে।

প্রথমেই দেখা উচিত যাতে রোগীর অ্যানেস্থিসিয়ার পরে বমি না হয়। তার জন্য রোগীকে ভালোভাবে তৈরী করা উচিত। অ্যানেস্থিসিয়ার অন্ততঃ ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা আগে থেকে রোগীকে না খাইয়ে রাখতে হবে। হঠাৎ অপারেশনের ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে টিউব দিয়ে পরিষ্কার করে নিলে ভালো হয়। মরফিন বা পেথিডিন অপারেশনের আগে বা পরে না দিলে ভালো হয়। ইথার অ্যানেস্থিসিয়া ব্যবহার না করাই শ্রেয়। দরকার হলে যাতে বমি না হয় তার জন্য কোন ওষুধ—যেমন, প্রোক্লোরপেরাজিন, হ্যালোপেরিডল আগে থেকেই দেওয়া যায়। অক্সিজেনের অভাব এবং রক্তচাপ হ্রাস সর্বদাই এড়িয়ে চলতে হবে।

এসব সত্ত্বেও যদি বমি হয় তবে ভালোভাবে suction মেশিনের সাহায্যে মুখ পরিষ্কার করে দিতে হবে। রোগীকে উপুড় করে বা পাশ ফিরিয়ে tonsillar position-এ শুইয়ে রাখলে ভাল হয়—এতে বমি করলেও তা শ্বাসনালীতে যাওয়ার আশংকা কম। ভালো nursing পরিচর্যা একান্ত দরকার।

অ্যানেসিস্থিয়া পরবর্তী ব্যথা-বেদনা :

অপারেশন ও অ্যানেস্থিসিয়ার পরে অপারেশনের জায়গায় ব্যথা-বেদনা প্রায় সব রোগীরই কম বেশী হয়। অবশ্য শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ রোগী ব্যথার কথা খুব একটা বলে না। এই ব্যথা-বেদনা নানা কারণে হতে পারে। রোগীর মানসিক অবস্থা, অপারেশনের জায়গা, কী ধরনের অপারেশন হয়েছে বা কী ধরনের অ্যানেস্থিসিয়া হয়েছে—এসবের উপর ব্যথা-বেদনা বিশেষভাবে নির্ভর করে।

এই ব্যথা-বেদনায় মাংসপেশীতে সংকোচন ঘটে, ফলে ব্যথা আরও বেড়ে

যায়। বুকের এবং পেটের মাংসপেশীর সংকোচনে রোগী ভালোভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে না—ফলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে। ব্যথার ভয়ে রোগী বেশী নড়াচড়া করতে পারে না—ফলে মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে, phlebitis এবং thromboembolism হতে পারে। রোগীর সেরে উঠতে সময় লাগে। সংকোচন বা spasm হলে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া ঘটে। Vasospasm হলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। Bronchiolar spasm হলে শ্বাসকষ্ট হয়—ফুসফুসের অসুখ হয়। খাদ্যনালীতে spasm হলে বমি হতে পারে—পেট ফুলে ওঠে এবং কোষ্ঠ-বদ্ধতা হয়।

পেটে, বুকে, পিঠে, joint এবং anorectal অপারেশনে ব্যথা-বেদনা বেশী হয়। Continuous epidural অ্যানেস্থিসিয়া দিলে পরে ব্যথা-বেদনা খুবই কম হয়।

রোগীর এই ব্যথা-বেদনা যাতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। রোগীর মানসিক অবস্থার দিকে নজর রেখে তার ভয় এবং দুর্ভাবনা এড়ানোর জন্য ভালোভাবে রোগীর সঙ্গে সহানুভূতি নিয়ে ব্যবহার করা দরকার। ভালো nursing care দরকার। রোগীকে বেশীদিন শুইয়ে রাখা উচিত নয়—তাড়াতাড়ি রোগীকে উঠে বসতে এবং চলাফেরা করতে দেওয়া ভালো।

ব্যথা উপশমের জন্য narcotic analgesics—যেমন, মরফিন, পেথিডিন, পেন্টাযোসিন (pentazocine) ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। তবে মাত্রা ঠিক রাখতে হবে নতুবা অন্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ভয়ভাবনা কমানোর জন্য এর সঙ্গে ডায়াজিপাম্ দেওয়া যেতে পারে। অনেক সময় দরকার মত intercostal nerve block, paravertebral block, segmental epidural analgesia দেওয়া যেতে পারে। আবার এই ব্যথা-বেদনা উপশমের জন্য আকুপাংচারের সাহায্যও নেওয়া চলে।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যাহত শ্বাসক্রিয়া :

অ্যানেস্থিসিয়ার পরেই রোগীর শ্বাসনালী নানা কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রোগী যদি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, তবে তার জিভের মাংসপেশী খুব শিথিল থাকার জন্য জিভ নীচে pharyngeal wall-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে—ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে যদি আওয়াজ শোনা যায় তবে বুঝতে হবে আংশিক বাধা সৃষ্টি হয়েছে। আর যদি বুকের মাংস-

পেশী খুব retract করে, রোগী নীল হয়ে যেতে থাকে, কোন আওয়াজ না হয় তবে বুঝতে হবে প্রায় পুরোপুরি বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

এই অবস্থায় রোগীর মাথা পেছন দিকে বাঁকিয়ে (hyperextend ক'রে) চোয়ালটি সামনের দিকে তুলে ধরলে শ্বাসনালী বাধামুক্ত থাকে। একটি air-way টিউব মুখের মধ্যে দিলেও কার্যকরী হয়। রোগীকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলেও উপকার হয়। এরপর অবশ্যই রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে।

আবার অনেক সময় রক্ত, বমি, থুতু ইত্যাদি শ্বাসনালীতে গিয়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আবার এর ফলে আকস্মিক laryngeal spasm হলেও শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এইসব অবস্থায় মুখ suction-এর সাহায্যে ভালো-ভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। অক্সিজেন তো দিতেই হবে।

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে আবার অনেক কারণে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস কমে যেতে পারে। রোগীর মস্তিষ্কের respiratory centre নানারকম অতিরিক্ত প্রাক-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ—যেমন, মরফিন, পেথিডিনে অবদমিত থাকতে পারে। অতিরিক্ত অ্যানেস্থিসিয়ায় ওষুধেও এমন হতে পারে। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার এবং গভীরতা দুই-ই কমে যায়। রোগীর cyanosis হয়। এসবের চিকিৎসার জন্য অক্সিজেন দিতে হবে। কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে হতেও পারে। দরকার মত প্রতিষেধক হিসেবে nalorphine বা levallor-phan দিলে উপকার পাওয়া যায়।

আবার peripheral depression-ও হতে পারে—যেমন, অতিরিক্ত muscle relaxant দেবার পরে অথবা ঠিকমত decurarisation না হলে। আবার নানারকম অসুখেও শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে—যেমন myasthenia gravis, emphysema, atalectasis, pneumonitis, হাঁপানি ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রেও ঠিকমত অক্সিজেন দিতে হবে। দরকার হলে endrotracheal টিউব পরিয়ে অক্সিজেন দিতে হবে। Muscle relaxant-এর জন্য হলে উপযুক্ত প্রতিষেধক দিতে হবে। অন্য কারণে হলে তার জন্য আলাদা চিকিৎসা দরকার।

বিলম্বিত সংজ্ঞাপ্রাপ্তি :

অ্যানেস্থিসিয়ার পর রোগীর সংজ্ঞা ফিরে আসতে অস্বাভাবিকভাবে অনেক দেরী হতে পারে। এটি নানা কারণেই হতে পারে। অতিরিক্ত মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদি প্রয়োগের ফলে, অত্যধিক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের জন্য, মস্তিষ্কে অপারেশন হলে, অত্যধিক রক্তচাপ কমে গেলে—shock-এ—রোগীর

জ্ঞান ফিরে আসতে দেরী হয়। যে কোন কারণে অ্যানেস্থিসিয়ার সময় অক্সিজেনের অভাব, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য বা acid base defect হলে রোগীর জ্ঞান ফিরে আসতে দেরী হতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার সময় রোগী যদি অন্য অসুখে আক্রান্ত হয়—যেমন, সন্ন্যাসরোগ, myocardial infarction, diabetic coma, hypoglycaemic coma, uraemia ইত্যাদিতে—এইসব মুমূর্ষু রোগীর জ্ঞান ফিরে আসার সন্দেহ থাকেই।

এই অবস্থায় রোগীকে যথেষ্ট সাবধানে পরীক্ষা করা উচিত। কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা দরকার। একটি অজ্ঞান অবস্থার রোগীর ক্ষেত্রে যে যত্ন নেওয়া উচিত তা অবশ্যই নিতে হবে। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস যাতে পর্যাপ্ত এবং অব্যাহত থাকে তা দেখা দরকার। রোগী যাতে বেশী ঘুমের এবং অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ না পায় তা আগেই দেখা দরকার।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী রক্তচাপহ্রাস ঃ

অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রক্তচাপ নানাকারণে কমে যেতে পারে। অপারেশনের সময় অত্যধিক রক্তপাতের জন্য শরীরে রক্তের ভাগ কমে যায় (hypovolaemia)। Vagus নার্ভের overactivityতে রক্তচাপ কমে যায়, এডরেনাল গ্রন্থির hypoactivity রক্তচাপ কমায়। অত্যধিক ঘুমের ওষুধ এবং অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের ব্যবহারে রক্তের নিম্নচাপ ঘটতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার সময় সাধারণতঃ শরীরে রক্তনালীর প্রসারণ ঘটে, সুতরাং যে সময় রোগীকে এক ভংগী (posture) থেকে অন্য ভংগীতে হঠাৎ পরিবর্তন করলে রক্তচাপ কমে যেতে পারে।

রক্তচাপ কমে গেলে তার কারণ খুঁজে দেখা উচিত। এ সময় রোগীর নাড়ীও খুব দ্রুত হয়। রোগী ঘামতে থাকে—ফ্যাকাশে হয়ে যায়। রোগীর shock হয়।

এমতাবস্থায় রোগীকে তাড়াতাড়ি শিরাপথে fluid দিতে হবে। দরকার মত রক্ত সঞ্চালন করা দরকার। রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে, নাকে ক্যাথেটার অথবা মুখে মাস্ক দিয়ে। রোগীর পায়ের দিক একটু উঁচু করে রাখা উচিত যাতে হৃৎপিণ্ডে বেশী রক্ত পৌছতে পারে এবং মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ ভালো হয়। shock-এর কারণ অনুসন্ধান করে বিধিমত তার চিকিৎসা করা উচিত। Vasopressor ওষুধ এবং steroids ব্যবহার করা যেতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী জ্বর :

সাধারণভাবে অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার পর রোগীর শরীরের তাপমাত্রা অল্প বাড়তে পারে। এতে অবশ্য ক্ষতির কিছু নেই। কিন্তু নানা কারণে রোগীর এসময় বেশী জ্বর হতে পারে। অপারেশনের জায়গায়, ফুসফুসে এবং মূত্রাশয়ে রোগ সংক্রমণ হলে রোগীর জ্বর হয়। আবার এ সময় আনুসংগিক অসুখে—যেমন, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা thrombophlebitis ইত্যাদিতেও জ্বর হতে পারে।

যে কারণেই হোক, জ্বর হলে অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ অনুসন্ধান করে বিধিমত তার চিকিৎসা করা দরকার।

ফুসফুস এবং শ্বাসনালী সম্বন্ধীয় উপসর্গ :

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে ফুসফুস এবং শ্বাসনালীতে নানা রকমের প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ব্রংকোনিউমোনিয়া, atalectasis ইত্যাদি খুবই সাধারণ উপসর্গ। এসবের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হয় atalectasis।

সাধারণতঃ যারা অত্যধিক ধূমপানে অভ্যস্ত এবং যাদের আগে থেকেই অল্প-বিস্তর ফুসফুসের অসুখ আছে, অ্যানেস্থিসিয়ার পরে তাদের এই ধরনের অসুখ বেশী হয়। শ্বাসনালীতে যদি রক্ত, বমি ইত্যাদির দ্বারা বাধাসৃষ্টি হয়, যদি অ্যানেস্থিসিয়ার সময় অনেকক্ষণ hypoventilation হয়, তখন ফুসফুসের একটি segment, lobe বা lobule অথবা পুরো একটি ফুসফুস collapse হয়ে যেতে পারে। এতে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়, নাড়ী দ্রুত হয়, cyanosis হতে পারে, বুকের অসুস্থ দিকে নড়চড়া খুবই সীমিত (restricted) হয়, ভালো শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায় না। এক্ষেত্রে বুকের x'ray করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

Aspiration pneumonitis নামে এক ধরনের অসুখ হতে পারে। এটি সাধারণভাবে খুব অম্লযুক্ত বমি শ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে শ্বাসনালীতে চলে যাওয়ার জন্য হয়। এর ফলে ফুসফুসে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এতে রোগী ভালোভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না, শ্বাসকষ্ট হয়, হাঁপানির মত টান হয়। রোগীর নাড়ী দ্রুত হয়। রক্তচাপ কমে যায়। Cyanosis হতে পারে। ষ্টেথোস্কোপ দিয়ে বুকে শুনলে হাঁপানির টান (asthmatic ronchi) শোনা যায়। বুকের x'ray করলে ভালোভাবে রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়। এই অসুখের জরুরী

চিকিৎসা হওয়া দরকার। সংগে সংগে রোগীর শ্বাসনালী ভালোভাবে suction মেশিনের সাহায্যে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। দরকার মত ১০০% অক্সিজেন দিতে হবে। Endotracheal intubation-এর দরকার হতে পারে। Broncho-dilator ওষুধ—যেমন aminophylline দিতে হবে। এন্টিবায়োটিক ওষুধ এবং হাইড্রোকর্টিসোন দেওয়া দরকার। ঠিক মত চিকিৎসা ঠিক সময়ে না হলে রোগীর pulmonary oedema এবং এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এই সব ফুসফুস সংক্রান্ত উপসর্গ এবং অসুখ অ্যানেস্থিসিয়ার পরে যাতে না হতে পারে তা আগে থেকেই দেখা উচিত। রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়ার আগে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা করা উচিত। সাধারণ সর্দি বা অন্য কোন ফুসফুসের অসুখ থাকাকালীন অ্যানেস্থিসিয়া না দেওয়াই উচিত। সাধারণ সর্দিকেও অবহেলা করা উচিত নয়। ধূমপান বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বন্ধ করা উচিত। রোগীকে বেশী পরিমাণে ঘুমের ওষুধ না দেওয়াই উচিত। রোগীর যাতে অ্যানেস্থিসিয়ার সময় অথবা পরে বমি না হয় তার জন্য আগে থেকেই রোগীকে তৈরী করা দরকার। দরকার হলে বমননাশক ওষুধ (antiemetic drugs) অ্যানেস্থিসিয়ার আগে দেওয়া যেতে পারে বমি প্রতিরোধের জন্য। অ্যানেস্থিসিয়ায় ইথার ব্যবহারে ফুসফুস সংক্রান্ত অসুখ বেশী হয়—সুতরাং ইথার এড়িয়ে চলা ভালো। অ্যানেস্থিসিয়ার সময় রোগীর যাতে অক্সিজেনের অভাব এবং অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস না হয় তার চেষ্টা করা উচিত। Endotracheal টিউব ভালোভাবে পরিষ্কার এবং বীজাণু-মুক্ত অবস্থায় রাখা উচিত নতুবা তা থেকেই সংক্রমণ ঘটতে পারে।

Intubation-এর সময় যাতে কোন আঘাত না লাগে, ছিঁড়ে ফেটে না যায় তার দিকে নজর দিতে হবে। প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে এট্রোপিন সালফেট না দেওয়াই ভালো, কেননা এট্রোপিন শ্বাসনালীর secretion-কে ঘন করে ফেলে এবং তা রোগী কেশে ঠিকমত বের করে দিতে পারে না—ফলে ফুসফুসে প্রদাহ হতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়ার পর রোগীকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠে বসতে এবং ক্রমশঃ ঘোরাফেরা করতে দেওয়া উচিত। রোগীকে ভালেভাবে শিখিয়ে নিতে হবে —অ্যানেস্থিসিয়া এবং অপারেশনের পর কীভাবে ভালো করে শ্বাস নিতে হবে, কীভাবে কাশতে হবে, কীভাবে অবস্থান পরিবর্তণ করতে হবে। দরকার হলে

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, ভাল suction, কৃত্রিম শ্বাসকার্য্যের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী convulsion বা খিঁচুনি :

এই খিঁচুনি বা convulsion বহু কারণেই হতে পারে। যে কোন কারণে রোগীর মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব (hypoxia) হলে খিঁচুনি হতে পারে। Cerebral oedema বা cerebrovascular accident হলে রোগীর খিঁচুনি হয়। অত্যধিক জ্বরের প্রকোপে রোগীর খিঁচুনি হতে পারে। যে কোন কারণে hypoglycaemia অথবা hypocalcaemia হলে, রোগীর eclampsia বা epilepsy অসুখ থাকলে এই অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী কালেও খিঁচুনি বা convulsion হতে পারে। অত্যধিক ইথার ব্যবহারের পর, হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ার পর, লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের toxic reaction হিসাবে অনেক সময় খিঁচুনি দেখা দিতে পারে।

এই সব ক্ষেত্রে খিঁচুনি বন্ধ করার জন্য ডায়াজিপাম, প্যারালডিহাইড বারবিচুরেট ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। শিরাপথে থায়োপেন্টোন (thiopentone) এবং muscle relaxant দিয়ে অনেক সময় খিঁচুনি বন্ধ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে endotracheal intubation করে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালাতে হয়। Convulsion-এর কারণ নির্ণয় করে বিধিমত তার চিকিৎসা করতে হবে। রোগীকে snpportive treatment দিতে হবে।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী নাড়ীর গতিবৃদ্ধি (tachycardia) :

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হতে পারে। যে সব কারণে এগুলি হতে পারে তা নানা ধরনের হয়। রোগীর ভয়ভাবনা, stress, anxiety, emotion—এসবের জন্য হতে পারে। রোগীর ব্যথা-বেদনা বেশী থাকলে নাড়ী দ্রুত হয়। দেহের তাপবৃদ্ধি, রক্তাল্পতা, অত্যধিক রক্তচাপহ্রাস, hypoxia এবং shock-এ নাড়ীর গতিবৃদ্ধি হয়। রোগীর congestive cardiac failure বা hyperthyroidism থাকলে এমনিতেই তার নাড়ীর গতি দ্রুত থাকে। এড্রেনালিন, এট্রোপিন বা ঐ জাতীয় ওষুধের প্রয়োগেও নাড়ীর গতি-বৃদ্ধি হতে পারে।

এইসব ক্ষেত্রে কেন নাড়ীর গতিবৃদ্ধি হচ্ছে তা যথার্থ নির্ণয় করা দরকার।

কারণ অনুযায়ী বিধিমত চিকিৎসা করা উচিত। যদি রোগীর congestive cardiac failure না থাকে তবে প্রোপানোলল (propanolol) দেওয়া যেতে পারে। খুব জরুরী অবস্থায় ০'৫ মি. গ্রা. মাত্রায় বার বার দেওয়া যেতে পারে। ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে নাড়ীর গতি কমে আসে। তবে মোট মাত্রা ২ মি. গ্রামের বেশী হওয়া উচিত নয়। অন্য অবস্থায় রোগীকে মুখ দিয়ে ১০ থেকে ৪০ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার দেওয়া যেতে পারে। Congestive cardiac failure থাকলে রোগীকে digitalise করা যেতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী নাড়ীর গতিহ্রাস (bradycardia) ঃ

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক ভাবে কমে যেতে পারে। এর সংগে রোগীর রক্তচাপ কমে। এটিও নানা কারণে হতে পারে, দক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে নাড়ীর গতি স্বাভাবিকভাবেই কম থাকতে পারে।

রোগীর intracranial প্রেসার বেড়ে থাকলে নাড়ীর গতি কমে যায়। যে কোন কারণে vagus নার্ভ উত্তেজিত হলে, অপারেশনের সময় abdominal viscera বা carotid sinus-এ অস্বাভাবিক চাপ পড়লে নাড়ীর গতি হ্রাস পায়। কিছু অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ—যেমন, হ্যালোথেন প্রয়োগে নাড়ীর গতি কমে যেতে পারে। রোগীকে যদি বেশী neostigmine দেওয়া হয়, যে সব রোগী propanolol therapy পাচ্ছে তাদের নাড়ীর গতি কম থাকতে পারে। Myxoedema রোগীর নাড়ীর গতি আগে থেকেই কম থাকে।

এসব ক্ষেত্রে সঠিক কারণ নির্ণয় করে তার চিকিৎসা করা দরকার। শিরাপথে এট্রোপিন ১ মি. গ্রা. বা তারও বেশী দেওয়া যেতে পারে। অন্য কোন ভাবে কাজ না হলে cardiac pacing-এর দরকার হতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী কাঁপুনি (shivering)

সাধারণতঃ দুইটি কারণে অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর কাঁপুনি বা shivering হতে পারে। তার প্রথমটি অ্যানেস্থিসিয়ার কয়েকটি ওষুধ ব্যবহার করার পরে হয়। বিশেষতঃ থায়োপেন্টোন অথবা হ্যালোথেন অ্যানেস্থিসিয়ার পরে কাঁপুনি দেখা যায়। আর একটি কারণ, শরীর থেকে বেশী তাপহ্রাসের ফলে হতে পারে। যদি recovery room-এর তাপমাত্রা খুব কম থাকে তবে রোগীর কাঁপুনি হতে পারে। Semiclosed অথবা আংশিক rebreathing system-এ অ্যানেস্থিসিয়া

দেওয়ার সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে অযথা অনেক তাপ হ্রাস হয়, তার ফলেও কাঁপুনি হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে রোগীকে ভালোভাবে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। Recovery ঘরের তাপমাত্রা পর্যাপ্ত থাকা উচিত। ক্লোরপ্রোমাজিন (Chlorpromazine) ৫ থেকে ১০ মি. গ্রা. শিরাপথে দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী দেহের তাপহ্রাস (hypothermia) ঃ

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর দেহের অস্বাভাবিক মাত্রায় তাপহ্রাস অনেক কারণেই হতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে induced hypothermia করেই অপারেশন হয়েছে তাদের অ্যানেস্থিসিয়ার পরেও কিছু তাপহ্রাস ঘটতে পারে। খুব ঠাণ্ডা অত্যধিক রক্ত সঞ্চালনের (massive blood transfusion-এর) পর রোগীর দেহের তাপ অনেক কমে যেতে পারে। ঠাণ্ডা অন্য infusion দিলেও এটি হতে পারে। ঠাণ্ডা শীততাপনিয়ন্ত্রিত অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন হলেও রোগীর অনভিপ্রেত তাপহ্রাস হতে পারে বিশেষতঃ শিশু এবং অতিবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে। অনেক উচ্চতায় high altitude-এ রোগীর তাপহ্রাস এমনিতেই ঘটে। মুমূর্ষু রোগীদের দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক কম থাকে।

এই সব রোগীর ক্ষেত্রে ঠিক কি কারণে তাপহ্রাস হয়েছে তা নির্ণয় করে তা প্রতিরোধ করা দরকার। এদের গরম কম্বল, গরম জলের বোতল ইত্যাদি দিয়ে slow rewarming করা দরকার। এদের সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট, steroids এবং অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া দরকার। শিরাপথে infusion-ও দিতে হবে।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী রোগীর রক্তচাপ বৃদ্ধি (hypertension) ঃ

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে অনেক কারণেই রোগীর রক্তচাপ বৃদ্ধি হতে পারে। অত্যধিক ব্যথা-বেদনা থাকলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। কোন কারণে রোগীর অক্সিজেনের অভাব হলে এবং কারবন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য হলে তার প্রথম দিকে রক্তচাপ অনেক বেড়ে যায়। বেশী fluid শিরাপথে দিলে, অত্যধিক রক্ত সঞ্চালন করলে, central venous pressure এবং রক্তচাপ বাড়ে। রোগীর intracranial tension অত্যধিক বেশী থাকলে, pheochromocytoma থাকলে,

reflex stimulation করলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। কিছু ওষুধ—যেমন কেটামিন, সাক্সিনিল কোলিন, vasopressor amine ইত্যাদি ব্যবহার করলে রক্তচাপবৃদ্ধি হতে দেখা যায়। রোগীর আগে থেকেই রক্তচাপ বৃদ্ধি অসুখ থাকলে অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার পরও তা থাকবে।

এদের ক্ষেত্রে কী কারণে রক্তচাপ বৃদ্ধি হচ্ছে তা ভালোভাবে নির্ণয় করে তবে তার চিকিৎসা করা উচিত।

অ্যানেস্থিসিয়ার পরে পান্ডুরোগ বা ন্যাবা (Jaundice) :

এই jaundice নানা কারণে হতে পারে। অপারেশনের সময় রক্ত সঞ্চালন (blood transfusion) করলে তার জন্য হতে পারে। রোগীর অনেকক্ষণ ধরে অক্সিজেনের অভাব, কারবন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য অথবা অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস হলে তাদের ন্যাবা হতে পারে। Thalassaemia রোগীর অত্যধিক লোহিত রক্তকণিকা নষ্ট হওয়ার জন্য ন্যাবা হয়। আবার আনুষংগিক obstructive jaundice বা infective hepatitis এই অ্যানেস্থিসিয়ার পরবর্তী সময়েই প্রকাশ পেতে পারে।

সুতরাং রোগীর আনুপূর্বিক বিবরণ নিয়ে, রোগীকে পরীক্ষা করে এবং laboratory investigations করে ঠিক কী কারণে পাণ্ডুরোগ হয়েছে তা দেখা দরকার এবং তার বিধিমত চিকিৎসা করা বিধেয়।

দীর্ঘস্থায়ী অ্যানেস্থিসিয়ার কুফল :

দীর্ঘস্থায়ী অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ায় রোগীর শরীরে এবং মনে অনেক কুফল দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে অ্যানেস্থিসিয়ার নানান ধরনের ওষুধ, থায়োপেন্টোন, muscle relaxant, narcotics, volatile অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ অনেক পরিমাণে লাগে। এ গুলি শরীরে বিপাক হতে এবং এদের excretion হতেও অনেক সময় লাগে। কিছু ওষুধ শরীরে জমে থাকতে পারে এবং পরে ধীরে ধীরে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী অপারেশনে রোগীর রক্তক্ষয় বেশী হয়, shock হতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার পরবর্তী সময়েও শ্বাসপ্রশ্বাস এদের বিঘ্নিত হতে পারে। Sore throat বা গলা-ব্যথা এদের খুবই হয়। Pulmonary complicationsও বেশী হয়। এদের মধ্যে বমির সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী। এদের fluid এবং electrolyte balance ঠিকমত থাকে না।

এদের basal metabolic rate বেশ কমে যায়। শরীরের সবরকমের বিপাক কমে যায়। অনেকক্ষণ শীততাপনিয়ন্ত্রিত থিয়েটারে অপারেশনের ফলে রোগীর দেহের অস্বাভাবিক তাপ হ্রাস ঘটতে পারে।

এদের infusion বেশী দেওয়া হয়। Thrombophlebitis-এর ঘটনা এদের বেশী হয়। এদের রক্তের প্রয়োজনও বেশী, তাই রক্তসঞ্চালন (blood transfusion) দিতেই হয়। সুতরাং রক্তসঞ্চালেনের কুফলও এক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশী।

অপারেশনের পর রোগীর মানসিক অবস্থাও ঠিক থাকে না। এদের অপারেশনের পরে শুয়ে থাকতে হয় বেশী। রোগ মুক্তির সময় (convalescence period) অত্যন্ত বেশী লাগে। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে pulmonary infection, embolism হওয়ার ঘটনা বেশী দেখা যায়। এদের wound infection, urinary infection-ও বেশী হয়। লিভার এবং কিডনীর কার্য্যক্ষমতা সাময়িকভাবে কমে যায়।

রোগী এবং তার আত্মীয় স্বজনের মনোবলও অত্যন্ত কমে যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুনরুজ্জীবন (Resuscitation)

মৃতপ্রায় বা মৃত লোককে বাঁচানোর চেষ্টা বা পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টার নামই resuscitation। শ্বাসযন্ত্রের বা হৃৎপিণ্ডের অথবা উভয়েরই কাজ যদি হঠাৎ কোন কারণে বন্ধ হয়ে য়ায় তাহলে সেই অবস্থায় যদি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যায় তবে রোগীর বেঁচে ওঠা অসম্ভব নয়। তিন মিনিটের মধ্যেই কিন্তু ব্যবস্থা নিতে হবে নতুবা রোগী বেঁচে উঠলেও চিরকালের মত মস্তিষ্কে ক্ষতিসাধন হয়ে যেতে পারে।

Cardiac arrest হলে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহ হয় না; ফলে রোগীর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়, সংজ্ঞালোপ হয়। এটি অনেক কারণেই হতে পারে। হঠাৎ দুর্ঘটনায়, বুকে হঠাৎ চোট লাগলে, জলে ডুবে গেলে, জলন্ত বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়লে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আবার অপারেশনের টেবিলে অ্যানেস্থিসিয়ার সময় হঠাৎ cardiac arrest হতে পারে। অনেক সময় কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অত্যধিক ঘুমের ওষুধ এবং অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ব্যবহারের ফলে, খারাপ বা ভুল অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য, রোগীর অত্যন্ত অক্সিজেনের অভাব, কারবন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য এবং রক্তচাপ হ্রাস হলে হঠাৎ হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিছু ওষুধ—যেমন ক্লোরোফর্ম, হ্যালোথেন, ইথাইল ক্লোরাইড হঠাৎ cardiac arrest করতে পারে। শরীরে পটাশিয়াম বা ক্যালসিয়ামের অতিবৃদ্ধি ঘটলে, খুব বেশী acidosis বা alkalosis হলে, শরীরে জলের ভাগ খুব কমে গেলে এমনটি হতে পারে। কিছু অপারেশন—যেমন cervical dilatation, anal stretching, cardiac catheterisation, bronchoscopy ইত্যাদিতে, শরীরের তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলে বা খুব কমে গেলে, রোগীর আগে থেকে হার্টের অসুখ থাকলে হঠাৎ cardiac arrest হতে পারে।

সাধারণভাবে দুরকমের cardiac arrest হয়। একটিকে বলে cardiac asystole এবং অপরটি ventricular fibrillation।

Cardiac arrest হলে তা বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। হঠাৎ রোগীর

নাড়ী পাওয়া যায় না এমন কি femoral artery-তে বা carotid artery-তেও পাওয়া যায় না। বুকে কোন হৃৎস্পন্দন (heart sound) শোনা যায় না। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। চোখের মণি খুব প্রসারিত হয়ে পড়ে। রোগীর অপারেশনের জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়—ঐ জায়গা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। Electrocardiogram করলে বোঝা যায় ঠিক কী ধরনের cardiac arrest হয়েছে—cardiac asystole অথবা ventricular fibrillation।

রোগ নির্ণয় করার সংগে সংগে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। যদিও অচল হৃৎপিণ্ডকে চালু করা এবং বিকল শ্বাসযন্ত্রকে ঠিক করা একই সময়ে করতে হবে, তবুও সাধারণভাবে বোঝার এবং বোঝানোর জন্য এক এক ক'রে বলা হচ্ছে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালু করার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যেতে পারে তা নিম্নরূপ। প্রথমেই দেখা উচিত শ্বাসপ্রশ্বাসের রাস্তা ঠিক আছে কিনা। মুখের মধ্যে যদি লালা, রক্ত, বমি ইত্যাদি থাকে তা আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে। হাসপাতালে sucker মেশিনের সাহায্য নেওয়া হয়।
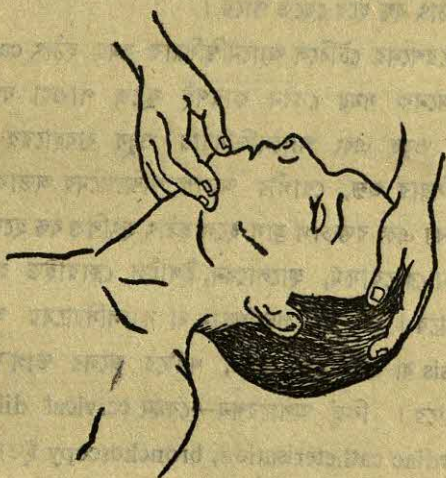
চিত্র-৫৫ : রোগীর মাথার ঠিকমত রাখার ভঙ্গি

অজ্ঞান অবস্থায় মানুষের জিভ নিচের দিকে ঝুলে প'ড়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের পথে অবরোধ সৃষ্টি করে—সুতরাং মাথা hyperextended এবং চোয়ালটি সামনের দিকে তুলে ধরে অবরোধ মুক্ত করা যায় (চিত্র নং ৫৫)

রোগীকে মোটামুটি একটি অপেক্ষাকৃত কঠিন জায়গায় চিৎ করে শোয়ানো দরকার। পা দুটি একটু উপরের দিকে তুলে রাখলে ভালো হয়।

এরপর যদি হাতের কাছে কিছু না থাকে তাহলে expired air ventilation আরম্ভ করতে হবে। সাধারণ বাতাসে প্রায় ২০% অক্সিজেন থাকে আর expired air-এ ১৫% অক্সিজেন থাকে। যে রোগী নিশ্বাসই নিচ্ছে না তার পক্ষে ১৫% অক্সিজেনই যথেষ্ট। এটি দুভাবে দেওয়া যায়। রোগীর হাঁ করা মুখে নিজের মুখ লাগিয়ে নিজের expired air জোর করে দেওয়া যেতে পারে—
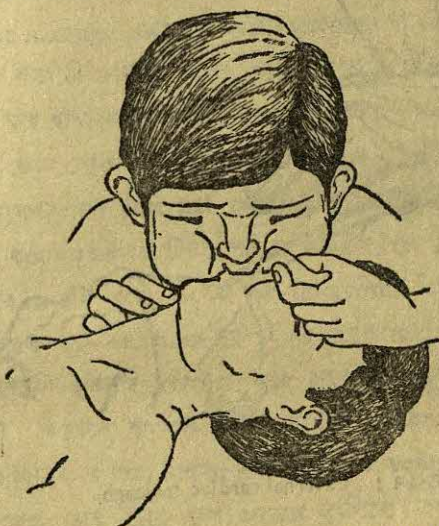
চিত্র-৫৬ : Mouth to mouth ventilation.

এটিকে বলে mouth to mouth ventilation (চিত্র নং ৫৬)। এটি করার সময় রোগীর নাকটি এক হাতে চেপে বন্ধ রাখা হয়। আবার অন্যভাবে রোগীর মুখটি বন্ধ রেখে রোগীর নাকে নিজের মুখ লাগিয়ে expired air দেওয়া যেতে পারে—এটিকে mouth to nose ventilation বলে। যাই হোক এইভাবে মিনিটে ১৫-১৬ বার দিয়ে যেতে হবে। একবার expired air রোগীকে দিয়ে নিজের মুখ সরিয়ে আনতে হবে—সেই সময় রোগীর ফুসফুস থেকে আপনা থেকেই হাওয়া বেরিয়ে (expiration) যাবে আর নিজে তখন জোরে শ্বাস নিতে পারবে। অবশ্য লম্বা airway tube পাওয়া গেলে তার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে (mouth to airway ventilation)

যেখানে ছোটখাট আনুষংগিক জিনিস পাওয়া যায় যেমন Pulmoflator,

Ambu bag ইত্যাদি—সেগুলির সাহায্যে পজিটিভ প্রেশারে সাধারণ বাতাস ভালোভাবে রোগীকে দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য হাসপাতালে Boyle অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিনের সাহায্যে ভালোভাবে endotracheal টিউব পরিয়ে শতকরা ১০০ ভাগ অক্সিজেন দিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালানো যেতে পারে। আর অনেক দিন এভাবে রোগীকে সাহায্য করতে হলে automatic ventilator ব্যবহার করা যায়।

চিত্র-৫৭ : External cardiac massage.

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে তা চালু করতে প্রথমেই করা উচিত external বা closed chest cardiac massage (চিত্র নং ৫৭)। মানুষের বুকের সামনে আছে sternum আর পিছনের দিকে আছে শিরদাঁড়া বা backbone। এই দুটির মাঝে অন্যান্য জিনিসের সংগে থাকে হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডের কাজ একবার সংকোচন এবং পরের বার প্রসারণ। মিনিটে মোটামুটি ৭০ বার এই সংকোচন আর প্রসারণ ঘটে। এখন হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিমভাবে আমরা তার সংকোচন আর প্রসারণ ঘটাতে পারি। বুকের sternum-এর নীচের অর্ধেকের উপর একটি হাত রেখে তার উপর আর একটি হাত দিয়ে, শরীরের ভার দিয়ে যদি backbone-এর দিকে চাপ দেওয়া যায়—sternum নীচের দিকে ১" থেকে ১½" নেমে যাবে এবং মধ্যকার হৃৎপিণ্ডও এর সংগে সংকুচিত হবে। আর sternum-কে ছেড়ে দিলেই আবার

হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ঘটবে। এটিকে অন্ততঃ মিনিটে ৬০ বার করে যেতে হবে। এই cardiac massage-এর সংগে mouth to mouth ventilation-ও চালিয়ে যেতে হবে। যদি দুজন লোক এই কাজ করে তবে ভাল হয়। একজন ৪ বার cardiac massage দিলে অপর জন ১ বার mouth to mouth ventilation করবে কিন্তু দুজনে একসংগেই massage এবং ventilation করবে না। আর যদি একজনকেই দুটি কাজ করতে হয় তবে ৮ বার ম্যাসাজ দিয়ে তাকেই আবার ২ বার শ্বাসক্রিয়া করতে হবে।

Cardiac massage এইভাবে দিলে sternum বা rib ভেঙে যেতে পারে, ফুসফুস, যকৃত ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবুও এটি অত্যন্ত সহজ এবং ভালো পন্থা, যার দ্বারা হঠাৎ বিকল হৃৎযন্ত্রকে সচল করা যায়। একটু জানা থাকলেই যে কোন লোক এটি করতে পারে।

অবশ্য হাসপাতালে internal cardiac massage দেওয়া যায়। এতে অতি অবশ্যই endotracheal টিউব পরিয়ে পজিটিভ প্রেশারে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালাতে হবে। বাম বুকে ৫ম বা ৬ষ্ঠ intercostal space-এ একটি বড় incision দিতে হয়—sternum-এর ১″ পর থেকে midaxillary line পর্যন্ত। Ribগুলি, ফুসফুস ইত্যাদি retract করে হৃৎপিণ্ডকে দেখতে হবে। তখনই বোঝা যাবে কিভাবে হৃৎপিণ্ড বিকল হয়েছে। Cardiac asystole হলে হৃৎপিণ্ড হবে একেবারে স্থির, নিশ্চল, শিথিল। আর ventricular fibrillation হলে মৃদু অথবা তার চেয়ে বেশী coarse হৃৎপিণ্ডের কম্পন দেখা যায়। সে কম্পন যথেচ্ছ রকমের—তার কোন ছন্দ নেই।

যাই হোক, হাতটি বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে হৃৎপিণ্ডকে হাতের তালুতে রেখে উপরের দিকে sternum-এর গায়ে চাপ দিয়ে হৃৎপিণ্ডকে ম্যাসাজ করতে হবে। এটি অন্ততঃ মিনিটে ৫০ বার করতে হবে।

এখন cardiac asystole আর ventricular fibrillation-এর চিকিৎসা আলাদা। Cardiac asystole হলে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এডরেনালিন (১ : ১০,০০০) ২ থেকে ৫ মি. লি. দেওয়া যেতে পারে। এতে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর tone ফিরে আসবে। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ১০% ৫ থেকে ১০ মি. লি. শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে। আর ventricular fibrillation হলে defibrillator-এর সাহায্যে electric shock দিয়ে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক করতে হবে। অবশ্য তার আগে এডরেনালিন

দিয়ে নিতে হবে এবং শরীরের অম্লতা (metabolic acidosis) দূর করার জন্য সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট দিয়ে নিতে হবে।

এই সব প্রক্রিয়া ছাড়াও শিরাপথে infusion দিতে হবে। দরকার হলে রক্তচাপ বাড়াবার জন্য noradrenaline বা methyl amphetamine দিতে হবে। Metabolic acidosis-এর চিকিৎসার জন্য সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট দিতে হবে।

এই সব করার পর নাড়ী আস্তে আস্তে ফিরে আসবে, হৃৎস্পন্দন শোনা যাবে, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হবে, চোখের মণি ছোট হয়ে স্বাভাবিক হবে—রোগীর জ্ঞানও ফিরে আসবে। কিন্তু এতসব করার পরও যদি শ্বাসপ্রশ্বাস না ফিরে আসে, হৃৎস্পন্দন না ফিরে আসে, চোখের মণি যদি প্রসারিত হয়েই থাকে তবে রোগীর অবস্থা খারাপই বলতে হবে।

অনেক সময় রোগী বেঁচে গেলেও নতুন উপসর্গ আসতে পারে। Cerebral oedema, pulmonary oedema, এমন কি kidney failure-ও হতে পারে। তখন বিধিমত এসবের চিকিৎসা করতে হবে।

মোটের উপর cardiac arrest-এর চিকিৎসায় সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে ৩ মিনিটের মধ্যেই রোগীর অন্ততঃ প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid treatment) —mouth to mouth ventilation এবং external cardiac massage দিতে হবে। এই চিকিৎসা করতে করতেই রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত এবং সেখানে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মত বিশেষ চিকিৎসা করা উচিত।

ষোড়শ অধ্যায়

নিয়ন্ত্রিত তাপহ্রাস ও অ্যানেস্থিসিয়া

সাধারণভাবে ৩৫° সেন্টিগ্রেডের নীচে দেহের তাপমাত্রা নেমে গেলে তাকে hypothermia বলে। যখন দেহের তাপমাত্রা আরও কমে ৩২.২ থেকে ২৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে, তখন মানবদেহের সমস্ত tissue metabolism অনেক কমে যায়। ক্রমশঃ রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ কমে যায়। এই অবস্থায় যদি মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনি এবং পায়ের রক্তসঞ্চালন সাময়িক-ভাবে বন্ধ রাখা হয়, তবে অক্সিজেনের অভাবজনিত কোন cellular damage হয় না। সুতরাং এই পদ্ধতি প্রয়োগে কিছু কিছু অপারেশন সাফল্যের সংগে করা যায় এবং এই সব অপারেশন cooling না ক'রে করলে অনিবার্যভাবে ক্ষতিসাধন করে। আধুনিককালে এই induced hypothermia বা নিয়ন্ত্রিত তাপহ্রাসের সাহায্য নিয়ে হৃৎপিণ্ডের অনেক অপারেশন করা হয়, যা আগেকার দিনে এই সব অপারেশনের কথা চিন্তাই করা যেত না। দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে tissue metabolism এত কমানো যায় যে যদি ১ ঘণ্টার মত হৃৎপিণ্ডকে অচল রাখা থাকে তবুও দেহ তা সহ্য করতে পারে।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Currie জ্বরের চিকিৎসা হিসাবে প্রথম hypothermia-র কথা বলেন। ঠাণ্ডা জলে রোগীকে রেখেই তিনি hypothermia করতেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে Allen ব্যথাহীনভাবে amputation করেন local refrigeration technique-এ। অবশ্য তারও অনেক আগে এই পদ্ধতিতে ব্যথাহীন amputation করা হয়েছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে Smith এবং Fay এই পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রচলন করেন। কিন্তু total body cooling করার বৈজ্ঞানিক কাজে Bigelow, Callahan এবং Hopps-এর অবদান যথেষ্ট। তাঁরা ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে surface cooling করে তাঁদের তথ্য পরিবেশন করেন। Surface cooling-এর অনেকগুলি অসুবিধা থাকার জন্য Boerema ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এবং Delorme ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে extracorporeal cooling-এর প্রবর্তন করেন।

Hypothermia করার প্রয়োগপদ্ধতি :

সাধারণতঃ দুই ভাবে hypothermia করা হয়। তার একটি surface cooling এবং অন্যটি extracorporeal cooling।

Surface cooling :

এটি অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি। এতে বিশেষ মূল্যবান অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাগে না। নিয়মমত রোগীর preanaesthetic assessment হওয়া দরকার। রোগীকে ভালো প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দেওয়া হয়। অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করা হয় থায়োপেণ্টোন এবং muscle relaxant ওষুধ শিরাপথে দিয়ে। Endotracheal intubation করা হয়। যথারীতি অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিনে সংযোগ করা হয়। এর পর রোগীকে ঠাণ্ডা পারিপার্শ্বিকে (cold environment-এ) রাখা হয়। অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় দুইটি জিনিস সব সময়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। রোগী যেন কাঁপুনি বা shivering না করে। আর vasodilatation হলে hypothermia হতে সুবিধা হয় কেননা এতে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে। Vasoconstriction যেন কখনই না হতে দেওয়া হয়।

Surface cooling নানা ভাবে করা যায়। খালি খোলা শরীরে বরফ ঢেকে দিয়ে শরীরের তাপহ্রাস করা যায়। রোগীর টেবিলে ভাঙা বরফ থাকে, তারই উপর রোগীকে শোয়ানো হয়। বরফ ব্যাগ দিয়ে গোটা শরীর মুড়ে ফেলা হয়। বরফ ব্যাগগুলি মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করা হয়।

রোগীকে একটি bath tub-এ রাখা হয়। ঐ tub-এ জল এবং বরফ দেওয়া হয়। এর তাপমাত্রা ৬° থেকে ১০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখা হয়। বরফ দিতে দিতে জল সব সময় নাড়তে হয়। বেশী তাপমাত্রা কমে গেলে রোগীর চামড়ার ক্ষতি হতে পারে।

এসব ছাড়াও ice water mattress, বা refrigerated blanketও ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে moderate hypothermia করার জন্য এবং hyperpyrexia চিকিৎসার জন্য air cooling পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে surface cooling-এ দেহের তাপমাত্রা ৩০° সেন্টিগ্রেড আনতে

৪৫ মিনিট থেকে ৩ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। মোটা লোকদের ক্ষেত্রে বেশী সময় লাগে। শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক কম সময় লাগে।

Surface cooling-এর অসুবিধা এই যে vasoconstriction করে এবং এর জন্য অনেক সময়ও লাগে। আবার এর ফলে রোগীর metabolic acidosis হয়। Vasoconstriction এবং কাঁপুনি কমানোর জন্য ক্লোরপ্রোমাজিন (chlorpromazine) ব্যবহার করা হয়। এটি প্রাক্-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে এবং পরেও supplemental dose-এ দেওয়া হয়। কাঁপুনি কমাতে হলে relaxant drug, ইথার বা narcotic ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। Deep অ্যানেস্থিসিয়া এগুলি কমাতে সাহায্য করলেও কার্যকালে তা করা হয় না।

Active cooling শেষ হবার পরও রোগীর দেহের আরও তাপহ্রাস ঘটতে থাকে। এটিকেই 'after drop' বলা হয়। এটি সাধারণতঃ ২° থেকে ৬° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। এর কারণ হিসাবে বলা হয় যে শরীরের core বা main body mass থেকে শরীরের চামড়ার দিকে তাপ বের হয়ে যাওয়ার জন্যই এটা ঘটে। সুতরাং পূর্বনির্ধারিত তাপহ্রাসের মাত্রা থেকে কিছু বেশী তাপমাত্রাতেই active cooling বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

রোগী যখন ঠিক নির্ধারিত তাপমাত্রায় আসে তখনই রোগীকে অপারেশন করতে দেওয়া হয়। এই সব রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং রক্তচাপ বারবার পরীক্ষা করা দরকার। এর সংগে thermocouple বা thermistor দিয়ে দেহের তাপমাত্রা monitoringও অবশ্য কর্তব্য। সাধারণতঃ mid-oesophageal তাপমাত্রাই নেওয়া হয়। E. C. G. এবং blood gas analysis করাও অত্যন্ত জরুরী। রোগীর metabolic acidosis হলে সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট শিরাপথে দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

অপারেশন হয়ে যাবার পর রোগীকে আবার তার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে হবে। Surface cooling-এর পর রোগীর নিজের থেকেই তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে অনেক সময় গরম কম্বল, গরম জল অথবা গরম বাতাসের সাহায্যে তাপমাত্রা বাড়ানো যায়। Rewarming খুব তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। এই সব warming device-এর তাপমাত্রা কখনও যেন ৪০° সেন্টিগ্রেডের বেশী না হয়। রোগীর দেহের তাপমাত্রা অন্ততঃ ৩৫° সেন্টিগ্রেড হলে এবং রোগীর জ্ঞান ফিরলে রোগীকে recovery room-এ পাঠানো হয়।

Extracorporeal cooling :

এই পদ্ধতি খুবই সন্তোষজনক। তবে এতে মূল্যবান অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাগে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ কলাকুশলী লাগে। এই পদ্ধতিতে শরীর থেকে রক্ত বাইরে আনা হয়। সেই রক্ত শরীরের বাইরে extracorporeal circulation-এর heat exchanger-এর মধ্যে তাপহ্রাস করা হয়। সেই ঠাণ্ডা রক্ত আবার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে রোগীর শরীরের তাপ-হ্রাস ঘটে। এই cooling method খুব কার্যকরী এবং সময়ও অনেক কম লাগে। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের শল্য চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়। এই cooling সাধারণতঃ দুই ভাবে করা যায়।

Veno-venous পদ্ধতিতে একটি ক্যাথেটার right auricular appendage দিয়ে superior venacava-তে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে রক্ত বের করে নেওয়া হয়। সেই রক্ত একটি cooling coil-এ ঠাণ্ডা করে তা আবার inferior venacava দিয়ে শরীরে পাঠানো হয়। এই পদ্ধতিতে শরীরের তাপহ্রাস খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণও করা যায়। এতে বিপদের আশংকাও কম থাকে। ২৮° সেন্টিগ্রেডে তাপমাত্রা কমিয়ে এনে ৫ থেকে ১০ মিনিটের মত নিরাপদ রক্তপ্রবাহ বন্ধ বা circulatory arrest করা যায়। অবশ্য তাপমাত্রা ২৫° সেন্টিগ্রেডের নীচে নামলে ventricular fibrillation হওয়ার আশংকা থাকে।

Cardiopulmonary by-pass পদ্ধতিতে hypothermia, ১০ মিনিটের বেশী circulatory arrest করতে গেলে করা হয়। এতে হৃৎপিণ্ডকে রক্তপ্রবাহ থেকে একেবারে আলাদা করে ফেলা হয় এবং অন্য vital organs-এ রক্তপ্রবাহ বজায় রাখা হয়। এখানে heart-lung machine ব্যবহার করা হয়। এরই সাহায্যে pump দিয়ে রক্তসংবহন (circulation) করা হয় এবং oxygenator দিয়ে রক্তের gaseous exchange ঠিক রাখা হয়। রোগীকে আগেই হেপারিন (heparin) দিয়ে নেওয়া হয় যাতে রক্ত জমাট বাঁধতে না পারে। পরে অবশ্যই প্রোটামিন সালফেট (protamine sulphate) দিয়ে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে আনা হয়। এখানেও একটি heat exchanger থাকে যেটি দিয়ে রক্ত প্রত্যক্ষভাবে ঠাণ্ডা হতে পারে। এই পদ্ধতিতে রোগীর তাপমাত্রা অনেক নীচে এমন কি ১৫° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নামানো যেতে পারে।

Extracorporeal cooling-এ তাপহ্রাস খুব তাড়াতাড়ি হয়। সহজে আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরিয়ে আনা যায়। শরীরের তাপমাত্রা অনেক নীচে দরকার মত নামানো যেতে পারে। 'After drop' এতে হয় না। কাঁপুনি বা shivering প্রায় হয়ই না—হলেও খুব কম হয়। এই cooling-এ peripheral nerve damage, fat necrosis বা পুড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তবে এতে কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। এই cooling coil-এ রক্ত জমাট বাঁধতে দেখা যায় এবং তা রোগীর শরীরে চলে যেতে পারে। অনেক সময় রক্তকণিকা ভেঙে যায়—haemolysis হয়। যান্ত্রিক কারণে হঠাৎ পাম্প খারাপ হয়ে গেলে রোগীর প্রাণসংশয় হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগে আধুনিক মূল্যবান যন্ত্রপাতি লাগে। এতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং কুশলী team work-এর একান্ত প্রয়োজন।

Extracorporeal cooling-এর পর rewarming-এর জন্য heat exchanger-এর ব্যবহার করা যেতে পারে।

Hypothermiaতে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার পদ্ধতি :

আগেই বলা হয়েছে এসব রোগীকে ক্লোরপ্রোমাজিন (chlorpromazine) এবং পেথিডিন (pethidine) দিয়ে premedication দিলে ভালো হয়। শিরাপথে থায়োপেণ্টোন (thiopentone) এবং সাক্সামেথোনিয়াম (suxamethonium) দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া সুরু করা হয়। Endotracheal intubation ক'রে নাইট্রাস অক্সাইড, অক্সিজেন এবং হ্যালোথেন দিয়ে spontaneous ventilation-এ রোগীকে রাখা যায়। হ্যালোথেন vasodilatation-এ সাহায্য করে এবং তার ফলে তাপহ্রাস ঘটে। Hypothermiaতে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ অনেক কম লাগে। অবশ্য মাঝে মাঝে muscle relaxant দিয়ে controlled ventilation-এ রাখা যায়। এতে রোগীর কাঁপুনি বা shivering হওয়ার সুযোগ থাকে না।

রোগীর অপারেশন ছাড়া যদি কখনও তাপহ্রাসের দরকার হয় তবে ক্লোরপ্রোমাজিন এবং পেথিডিন মাংসপেশীর মধ্যে এবং প্রয়োজন বোধে শিরাপথে ইঞ্জেকশন দিয়েই করা যায়। Hyperpyrexiaর চিকিৎসায় যে moderate cooling করা হয় সেটি এভাবেই করা চলে।

মোটের উপর রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া light plane-এ রাখা উচিত এবং

যথাসম্ভব peripheral vasodilatation করার ব্যবস্থা করা হয়। কাঁপুনি এবং রক্তনালী সংকোচন সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে হবে।

রোগীর দেহের তাপমাত্রা, নাড়ী, রক্তচাপ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কোন সময়ে রোগী খারাপ হয়ে যেতে পারে—ventricular fibrillation হতে পারে। এসব যথাসময়ে বুঝতে হবে এবং পর্যাপ্ত তাৎক্ষণিক চিকিৎসা করতে হবে।

দেহের অত্যধিক তাপহ্রাসে (Hypothermiaতে) রোগীর শরীরের প্রতিক্রিয়া :

দেহের তাপমাত্রা হ্রাসের সংগে হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা (cardiac function), cardiac output, রক্তচাপ এবং রক্তপ্রবাহ কমতে থাকে। Hypothermia শুরুর সময় নাড়ী এবং রক্তচাপ কিছু বাড়তে পারে যেহেতু সেসময় কিছু peripheral vasoconstriction হওয়াই স্বাভাবিক। ৩৪° সেন্টিগ্রেডের নীচে তাপ মাত্রা হলে রক্তনালীর প্রসারণ (vasodilatation) হতে থাকে, ফলে রক্তচাপও কমতে থাকে। ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত রোগীর myocardium যথেষ্ট ভালোভাবেই তার কাজ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আরও বেশী তাপহ্রাস হলে myocardial failure হতে শুরু করে এবং ২৪° সেন্টিগ্রেডে ventricular fibrillation হওয়ার যথেষ্ট আশংকা থাকে।

৩০° সেন্টিগ্রেডের নীচে তাপমাত্রায় হৃৎস্পন্দনের ছন্দপতন (arrhythmia) হতে পারে। এই সব arrhythmia এবং ventricular fibrillation নানা কারণেই হতে পারে—যেমন শরীরে কারবন ডাই-অক্সাইডের অভাব বা আধিক্য, পটাশিয়ামের অভাব বা আধিক্য অথবা ক্যালসিয়ামের অভাব বা আধিক্য। এসবের যে কোন একটি কারণেই রোগীর নাড়ীর ছন্দপতন ঘটাতে পারে। করোনারি ধমনীতে রক্তপ্রবাহ (coronary blood flow) এবং করোনারি perfusion কমার জন্য myocardial irritability বেড়ে যায়। এই অবস্থায় ventricular fibrillation হলে electrical defibrillation করা একন্ত দরকার। Myocardial tone যদি না থাকে তবে ১ থেকে ৩ মি. লি. (১ : ৩০০০) এডরেনালিন (adrenaline) দেওয়া উচিত।

রক্তের viscosity বেড়ে যায় এবং সূক্ষ্ম রক্তনালীর মধ্যে sludging হতে পারে। দেহের তাপমাত্রা বেশী হ্রাস হলে thrombocytopenia এবং

haemoconcentration হয়। রক্তের eosinophil এবং leucocyte count কমে যায়। Coagulation process খুবই মন্থর হয়ে পড়ে, fibrinogen-ও কমে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রোগীর লিভারের অসুখ থাকলে রক্তের prothrombin মাত্রা কমে গিয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ করতে পারে। Extracorporeal coolingএও অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হতে পারে।

Hypothermia-তে সমস্ত শরীরের বিপাক এবং enzyme function অত্যন্ত কমে যাওয়ায় লিভারের স্বাভাবিক কাজে কিছু কিছু গণ্ডগোল হতেই পারে। কিডনির স্বাভাবিক কাজও কমে যায়। দেহের তাপহ্রাসের সংগে glomerular filtration rate এবং কিডনির রক্তপ্রবাহ (renal blood flow) কমে যায়। তবে খুব বেশী তাপহ্রাস না হলে প্রস্রাব মোটামুটি ঠিক থাকে।

Hypothermia-তে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কমে যায়। অক্সিজেন dissociation curve বাম দিকে সরে যায় সুতরাং জীবকোষে অক্সিজেন যায় খুব, কম যদিও প্লাজমায় দ্রবীভূত অক্সিজেন অনেক বেশী থাকে। এই tissue oxygenation কমার অনেক কারণ থাকে—যেমন, রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসই কম হয়, রক্তচাপ কম থাকে, রক্তনালীর সংকোচন থাকতে পারে, রক্তের viscosity অত্যন্ত বেশী থাকে। যাই হোক, ভালোভাবে controlled ventilation ক'রে, আস্তে আস্তে cooling ক'রে এবং haemodilution ক'রে tissue oxygenation যতটা সম্ভব ভালো করার চেষ্টা করতে হবে। ২৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস সাধারণতঃ থেমে যায়।

রোগীর দেহের তাপহ্রাসের ফলে metabolic acidosis হয়। Hypothermia-তে শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যায়, কারবন ডাই-অক্সাইড রক্তে বেড়ে যায়। রক্তের প্লাজমাতে কারবন ডাই-অক্সাইড বেশী দ্রবীভূত হয়। বেশী ল্যাকটিক এসিড শরীরে তৈরী হয়। আবার কিডনিও সে সময় ঠিকমত অম্লতা প্রতিরোধ করতে পারে না। এই সব কারণেই শরীরের অম্লতা বৃদ্ধি হতে পারে। রোগীর রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

Hypothermia-তে non-depolarizing muscle relaxant-এর কার্যকারিতা কমে যায় কিন্তু depolarizing ওষুধের কার্যকারিতা বেশ বেড়ে যায়।

শরীরে তাপহ্রাসের সংগে সংগে বিপাকও কমতে থাকে। ১° সেন্টিগ্রেড তাপহ্রাসে ৬ থেকে ৭% বিপাক কমে। লিভার এবং কিডনির কাজও ব্যাহত

১২

হয় তাই থায়োপেন্টোন, muscle relaxant ইত্যাদি ওষুধ খুব সাবধানে দেওয়া উচিত। হেপারিন, ল্যাকটিক এসিড, সাইট্রেট ইত্যাদির বিপাকও অত্যন্ত ব্যাহত হয়। Hypothermia-তে রোগীর সাধারণতঃ রক্তে শর্করার আধিক্য ঘটে এবং তার ফলে cellular dehydration হতে পারে।

সাধারণভাবে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় মানুষের মস্তিষ্ক ৩ মিনিটের মত অক্সিজেনের অভাব সহ্য করতে পারে। কিন্তু ২৮° সেন্টিগ্রেডে ৫ থেকে ১০ মিনিটের মত complete circulatory arrest মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারে আর ১৫° সেন্টিগ্রেডে তা বেড়ে হয় প্রায় ৫০ মিনিট। Hypothermia-তে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ (cerebral blood flow), brain volume, এবং cerebro-spinal fluid pressure কমে যায়। ২৮° থেকে ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

Induced hypothermia খুব একটা নিরাপদ পদ্ধতি হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় এর জটিল উপসর্গ (complications) সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত থাকা প্রযোজন।

১। হৃৎপিণ্ডজনিত জটিলতা (Cardiac disturbances)—Ventricular fibrillation সব থেকে বিপজ্জনক অবস্থা। এছাড়াও ventricular tachycardia এবং dysrhythmia হতে পারে। Myocardial irritability অত্যন্ত বেশী থাকে। এটি প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ কয়েকটি দিকে নজর রাখা উচিত। তাপ-হ্রাস ধীরে ধীরে করাই শ্রেয়, হঠাৎ তাপমাত্রা কমিয়ে আনা ভালো নয়। ভালো-ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালানো দরকার। Acidosis-এর চিকিৎসা করতে হবে। সব সময় শরীরের তাপমাত্রার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। Critical তাপমাত্রা ২৮° সেন্টিগ্রেড—এটি মনে রাখা উচিত। কোন cardiac depressant ওষুধ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়।

২। এই সব রোগীর রক্তক্ষরণের একটা প্রবনতা দেখা দিতে পারে। তার ফলে অস্বাভাবিক রক্তপাতে জীবন সংশয় হতে পারে।

৩। Irreversible brain damage হতে পারে, যদি খুব বেশী সময় মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ বন্ধ রাখা হয়।

৪। লিভার, কিডনি, ফুসফুস ইত্যাদিতে অনেক সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

৫। Local tissue injury—চামড়ায় cold injury অনেক সময়েই হতে

পারে। Subcutaneous fat necrosis সাধারণতঃ surface cooling-এর পর হয়। অত্যধিক তাপহ্রাসে ২৫° সেন্টিগ্রেডে cold haemagglutination হতে পারে।

এত সব উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও কিছু অপারেশনের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের শল্যচিকিৎসায় এই তাপহ্রাস পদ্ধতির অবদান অনেক। আগে যে সব অপারেশনের কথা ভাবা যেত না, এখন এই পদ্ধতিতে তা সাফল্যের সংগে করা হচ্ছে। মোটামুটি ভাবে নিয়ন্ত্রিত তাপহ্রাস নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে করা হয়।

১। কিছু হৃৎপিণ্ডের শল্য চিকিৎসায়ঃ Atrial septal defect-এর অপারেশনে তাপহ্রাস পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার হয়।

২। কিছু মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসায় : যেমন aneurism অপারেশনে। হাইপোথারমিয়া এক্ষেত্রে brain volume এবং C. S. F. প্রেসার কমায়। এতে রোগীর রক্তচাপ কমে গেলেও রোগী নিরাপদে থাকে।

৩। কিছু রক্তনালীর শল্য চিকিৎসায় : Aortic aneurism অপারেশনে, arterial grafting-এ, organ transplantation-এ।

৪। কিছু অসুখের চিকিৎসা হিসাবে তাপহ্রাস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। Malignant hyperpyrexiaতে এভাবে তাপহ্রাস করা যেতে পারে। Hryper-thyroid toxic crisis-এর ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের সংগে তাপহ্রাস করা হয়। কিছু neurological অসুখে যেমন poliomyelitis-এর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আছে। Head injury অথবা ischaemic cerebral damage এর পরে নিয়ন্ত্রিত তাপহ্রাস করলে cerebral oedema হওয়ার বিশেষ আশংকা থাকে না। Extensive shock-এ, cardiac arrest-এর পর after-treatment হিসাবে নিয়ন্ত্রিত তাপহ্রাস (hypothermia) করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অ্যানেস্থিসিয়ার সময় অনভিপ্রেত দেহের তাপহ্রাস (Inadvertent hypothermia) :

শিশুদের অ্যানেস্থিসিয়া এবং অপারেশনের সময় এই অনভিপ্রেত দেহের তাপহ্রাস হতে পারে। বিশেষতঃ যখন বাতানুকুল অপারেশন থিয়েটারে বেশ ঠাণ্ডা

পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অপারেশন করা হয়। শিশুদের তাপনিয়ন্ত্রন ক্ষমতা খুব কম—এদের মস্তিষ্কস্থিত তাপনিয়ন্ত্রন কেন্দ্র (heat regulating centre) খুব পরিণত থাকে না। এদের subcutaneous fat অত্যন্ত কম থাকে। এরা প্রয়োজনে শরীরের তাপ সৃষ্টি করতে পারে না। এরা exercise বা shivering করে তাপ বাড়াতে পারে না। অবশ্য এদের শরীরের brown fat থাকে—তা দিয়ে কিছু তাপ সৃষ্টি করতে পারে।

অবশ্য খুব বৃদ্ধ এবং খুব রোগাদের ক্ষেত্রেও অ্যানেস্থিসিয়া এবং অপারেশনের সময় অস্বাভাবিকভাবে তাপহ্রাস ঘটতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ার সময় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর vasodilatation হয় ফলে তাপহ্রাসে সাহায্য হয়। অ্যানে-স্থিসিয়া রোগীর সমস্ত বিপাক কমিয়ে দেয়, সে সময় মস্তিষ্কস্থিত তাপনিয়ন্ত্রন কেন্দ্রও অবদমিত থাকে এবং রোগীর কোন শারীরিক কার্যক্ষমতা বা muscular activity থাকে না—এ সবই রোগীর তাপহ্রাস করতে সাহায্য করে। রোগীর সে সময় কোন পরিধান থাকে না। বড় অপারেশনে বিশেষতঃ বুকের এবং পেটের অপারেশনে, সময় যদি অনেকক্ষন লাগে তবে body cavity এবং viscera ঠাণ্ডা পারিপার্শ্বিকে থেকে রোগীর তাপহ্রাস ঘটায়। খুব ঠাণ্ডা fluid বা রক্ত যদি শিরাপথে দেওয়া হয় তবে দেহের তাপমাত্রা কমে। Muscle relaxant-এর ব্যবহার এবং কৃত্রিম শ্বাসকার্য (controlled ventilation) তাপহ্রাসে সাহায্য করে। বিশেষতঃ premature এবং small-for-date শিশুদের এই অনভিপ্রেত তাপহ্রাস বেশী হয়। অপারেশনের সময় শিশুদের পিঠের নীচে ভিজে ডায়াথার্মি প্যাড দেওয়া হয়-এতেও শিশুর যথেষ্ট তাপহ্রাস ঘটে।

এই অনভিপ্রেত তাপহ্রাসের ফলে শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রোগী ফ্যাকাশে দেখতে হয়। Cyanosis থাকে, রক্তচাপ কমে যায়। হাত পায়ের মাংসপেশী শিথিল হয়ে পড়ে। নাড়ী এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি দ্রুত হয়। Pupil প্রসারিত হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে বেশ shivering বা কাঁপুনি হয়।

এই hypothermia-তেও cardiac arrhythmia, acidosis এবং অত্যধিক রক্তক্ষরণের প্রবনতা দেখা যায়। এদের অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ বেশ কম লাগে সুতরাং এদের তুলনামূলকভাবে ওষুধের মাত্রা অনেক বেশী হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। শরীরের সর্বসমেত বিপাক কমে যাওয়ার জন্য এবং লিভার ও কিডনির কাজ কিছু ব্যাহত হওয়ার জন্য অনেক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ শরীরে ঠিকমত নষ্ট হতে এবং শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। এদের অক্সিজেন

consumption-ও কমে যায় কিন্তু কাঁপুনি হলে তা অনেক বেড়েও যেতে পারে। রোগীর রক্তে শর্করার আধিক্য (hyperglycaemia) হতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ (cerebral blood flow) এবং অক্সিজেনের ব্যবহার (oxygen consumption) কমে যায়। তবে mild hypothermia-তে nervous system খুব উত্তেজিত থাকে এবং খিঁচুনী বা convulsionও হতে পারে। এদের blood volume কমে যায়। রক্তের বেশ কিছু জলীয় ভাগ tissue space-এ চলে যায় ফলে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং haemoconcentration ঘটে।

সাধারণতঃ anoxia, acidosis, central এবং peripheral circulatory failure-এ রোগী মারা যায়।

এই অনভিপ্রেত দেহের তাপহ্রাস (hypothermia) যাতে না ঘটে তার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

১। অপারেশন থিয়েটারের বাতাসের তাপমাত্রা এবং relative humidity (আদ্রতা) নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে যাতে অযথা রোগীর তাপহ্রাসে সাহায্য না করে। নবজাতকদের অপারেশনের সময় থিয়েটারের শীততাপনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

২। Infusion দেওয়ার জন্য fluid গুলি দেহের তাপমাত্রার কাছাকাছি এনে তবেই শিরাপথে দেওয়া উচিত। অত্যধিক ঠাণ্ডা রক্ত blood bank থেকে এনেই রোগীকে তা দেওয়া উচিত নয়। ৪° সেন্টিগ্রেডের ৫০০ মি. লি. রক্ত শিরাপথে রোগীকে খুব তাড়াতাড়ি দিলে শরীরের তাপমাত্রা ১° সেন্টিগ্রেড কমে যেতে পারে।

৩। Closed circuit-এ অ্যানেস্থিসিয়া দিলে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে যে জলীয় বাষ্প নষ্ট হয়, তা কমাতে সাহায্য করে। রোগীর দেহের তাপ সংরক্ষণ করতেও সাহায্য করে।

৪। অপারেশন টেবিলে রোগীকে পর্য্যাপ্ত draping করতে হবে। শিশুদের মাথার surface area তাদের শরীরের তুলনায় বেশী, সুতরাং মাথাটিকে সবসময় ঢেকে রাখা উচিত।

৫। রোগীর দেহের তাপমাত্রা সব সময় monitoring-এর দরকার। রোগীর দেহের অল্প তাপহ্রাস হলেই তা যদি তৎক্ষনাৎ বোঝা যায়-তবে অবিলম্বে তার প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা করা যায়।

৬। অনেক সময় রোগীকে একটি water mattress-এ রাখা হয়। যদি তাপহ্রাস ঘটে তবে উষ্ণ জল তার মধ্যে প্রবাহ করা হয় এবং যদি তাপবৃদ্ধি ঘটে তবে ঠাণ্ডা জল প্রবাহিত হতে দেওয়া হয়। এর ফলে রোগীর দেহের তাপমাত্র স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য হয়।

এই অনভিপ্রেত তাপহ্রাসের চিকিৎসা খুব সাবধানে করা উচিত। খুব তাড়াতাড়ি active warming করা উচিত নয়, কেননা এতে cardiac irregularities এবং এমন কি মৃত্যুও ঘটাতে পারে। প্রথমে কম্বল, গরম জলের বোতল ইত্যাদি দিয়ে আস্তে আস্তে রোগীকে গরম করা উচিত। রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে। Metabolic acidosis-এর চিকিৎসা হিসাবে শিরাপথে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট দিতে হবে। এদের steroid দিলে উপকার হয়। রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ শিরাপথে infusion দেওয়া দরকার। রোগীর রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor দেওয়া হয় নচেৎ অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাসের ফলে কিডনি এবং মস্তিষ্কের প্রভৃত ক্ষতি হতে পারে।

দুর্ঘটনাজনিত দেহের তাপহ্রাস (Accidental hypothermia):

সাধারণতঃ শীতকালে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে এই দুর্ঘটনাজনিত তাপহ্রাস হতে পারে। বিশেষতঃ খুব শিশু এবং বেশী বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এটি হতে পারে। খুব অভাবগ্রস্ত লোকেরা যারা রাস্তায় বা গাছের নীচেই জীবনধারণ করে, নেশাগ্রস্ত লোকেরা, অপুষ্টি জনিত অসুস্থ লোকেরা, অত্যন্ত কাহিল বা exhaustion হলে, বিকৃত মস্তিষ্ক লোকেরা প্রচণ্ড শীতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না তার ফলে তাদের hypothermia ঘটতে পারে। যে সব লোকের basal metabolism এমনিতেই অত্যন্ত কম যেমন myxoedema এবং hypopituitarism-এর রোগীরা, সহজেই তারা অস্বাভাবিক তাপহ্রাসের কবলে পড়ে।

বারবিচুরেট এবং ঘুমের ওষুধের বিষক্রিয়ায় দেহের অত্যধিক তাপহ্রাস ঘটে। এতে রোগীর খুব বেশী vasodilatation হয়, রোগী অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, এদের বিপাক অত্যন্ত কমে যায় এবং মস্তিষ্ক খুবই অবদমিত অবস্থায় থাকে। এসবই তাপহ্রাসের সহায়ক। জলে ডোবা রোগীদের ক্ষেত্রে শরীরের তাপহ্রাস হতেই পারে। Cerebrovascular accident হলে বা massive myocardial infarction হলে রোগীর দেহের তাপমাত্রা অত্যধিক কমে যায়।

সাধারণভাবে ৩০° বা ৩১° সেন্টিগ্রেড দেহের তাপমাত্রাকে এই hypothermia-র নিরাপদ এবং বিপদ মাত্রার মাঝামাঝি ধরা যেতে পারে। এই তাপমাত্রার উপরে রোগী তার তাপমাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার সব রকম চেষ্টা করে, কিন্তু তার নীচে রোগী তা পেরে ওঠে না এবং তখন তাপমাত্রা হ্রাস হতেই থাকে। Respiratory depression, anoxia, acidosis, central এবং peripheral circulatory failure হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। Dysrhythmia এবং ventricular fibrillation প্রায়শই দেখা যায়।

এই দুর্ঘটনাজনিত তাপহ্রাসের চিকিৎসা রোগ নির্ণয়ের সংগে সংগেই করা উচিত। তাপহ্রাসে রোগীর অক্সিজেনের metabolic demand খুব কম এবং মস্তিষ্কও অনেকক্ষণ অক্সিজেনের অভাব সহ্য করতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে রোগীর হৃৎস্পন্দন থেমে গেলেও বেশ কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে অনেক সময় ভাল, সুচারু এবং দ্রুত চিকিৎসার ফলে রোগীর পুনরুজ্জীবন ঘটতে দেখা যায়।

রোগীর মুখ, নাক ভাল করে পরিষ্কার করে ১০০% অক্সিজেন দিতে হবে। একটি শিরাপথে infusion দেওয়া দরকার। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধ দিতে হবে।

যদি রোগীর cardiac arrest হয়ে থাকে তবে প্রথমেই closed chest cardiac massage আরম্ভ করতে হবে। Ventricular fibrillation থাকলে defibrillation করা অত্যাবশ্যক। শিরাপথে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিলে myocardial tone ফিরে আসে। Metabolic acidosis-এর জন্য শিরাপথে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট দেওয়া হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এবং steroid-ও দিতে হবে।

এই সব রোগীকে প্রথমদিকে passive rewarming করা দরকার। রোগীকে কম্বল বা কাপড় চোপড়ে ভালভাবে ঢেকে রাখলে রোগীর শরীরের তাপ বের হতে পারে না উপরন্তু বাইরের ঠাণ্ডাও রোগীর শরীরে যেতে পারে না।

এর পর active rewarming করার দরকার হতে পারে। এটি দুরকমের হয়—external এবং internal। External rewarming করা হয় রোগীকে একটি hot water bath-এ রেখে অথবা water blanket ব্যবহার ক'রে। এসব যদি হাতের কাছে না থাকে তবে গরম জলের বোতল বা electric blanket ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় রোগীর চামড়া পুড়ে

যেতে পারে। সুতরাং সেদিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত এবং heating device-এর তাপ কখনও ৪০° সেন্টিগ্রেডের বেশী রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

খুব বেশী ধরনের শরীরের তাপহ্রাস ঘটলে internal active cooling এর দরকার হতে পারে। Extracorporeal rewarming খুবই কার্যকরী পদ্ধতি। এতে শরীরের রক্ত বাইরে এনে heat exchanger-এর মধ্যে দিয়ে গরম ক'রে আবার শরীরে প্রবাহিত করা হয়। অনেক সময় heart-lung মেশিনের সাহায্যও নেওয়া হয়। কিন্তু এসব জিনিষ সব হাসপাতালে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অন্য ভাবেও internal cooling করা যেতে পারে। উষ্ণ নর্মাল স্যালাইন দিয়ে gastric irrigation-এ ভাল ফল পাওয়া যায়। এইভাবে intrathoracic irrigation এবং peritoneal lavage-ও দেওয়া যেতে পারে। Infusion fluid ঈষদুষ্ণ করে শিরাপথে দেওয়া যায়। এই rewarming-এর প্রথমদিকে হঠাৎ রোগীর শরীরের অম্লতা বেড়ে যেতে পারে—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

নিয়ন্ত্রিত রক্তচাপহ্রাস ও অ্যানেস্থিসিয়া

অপারেশনের সময় রক্তপাত হয়ই তবে বড় বড় অপারেশনে এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন haemangioma, aneurism বা vascular surgery-তে এত অধিক রক্তপাত ঘটে যে রোগীর shock হয়, এমনকি জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে অপারেশনের সময় যদি রোগীর রক্তচাপ কমিয়ে রাখা হয় তবে অনিবার্য কারণেই রক্তপাত কম হবে এবং রোগীর অবস্থা তত খারাপ হবে না। পরে অবশ্যই রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রায় এনে দিতে হবে। এটিই controlled hypotension বা নিয়ন্ত্রিত রক্তচাপহ্রাস।

অপারেশনের সময় যে অতিরিক্ত রক্তপাত ঘটে তার অনেক কারণ থাকতে পারে। তার কয়েকটি কারণ অবশ্যই অ্যানেস্থিসিয়া সংক্রান্ত। রোগীর অজ্ঞান অবস্থায় vasomotor tone অনেক কমে যায়, ফলে ত্বক এবং মাংসপেশীর রক্তনালীতে প্রসারন ঘটে, অপরদিকে কিডনি এবং splanchnic area-তে রক্তনালীর সংকোচন ঘটে। এমন অনেক অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ আছে যেগুলি রক্তচাপ বাড়ায় যেমন ইথার, সাইক্লোপ্রোপেন, কেটামিন ইত্যাদি এবং তার ফলে বেশী রক্তপাত ঘটে। এই রক্তপাত আরও বেড়ে যেতে পারে যদি রোগীর শ্বাসক্রিয়ায় বাধা (respiratory obstruction) থাকে। কোন কারণে শরীরে কারবন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলেও প্রথমদিকে যথেষ্ট রক্তচাপ বেড়ে যায়। অ্যানেস্থিসিয়ার circuit-এ বেশী resistance থাকলেও রক্তপাত বেশী হয়। Light plane অ্যানেস্থিসিয়াতে অপারেশন করলে ক্ষতস্থান থেকে বেশী রক্তপাত হয়।

অ্যানেস্থিসিয়ার কারণ ছাড়াও অন্য কারণে রক্তপাত বেশী হতে পারে। যে কোন কারণে venous congestion হলে যেমন হার্টের অসুখে, ফুসফুসের অসুখে, অত্যধিক infusion এবং রক্ত সঞ্চালনের ফলে—রক্তপাত বেশী হয়। যে সব রোগীর বিপাকের হার অত্যন্ত বেশী, যারা platelet deficiencyতে, লিভারের অসুখে, uraemia বা polycythaemiaতে ভোগে, মাংসপেশী, গ্ল্যাণ্ড বা ক্যানসারের অপারেশনে, হৃৎপিণ্ডের অপারেশনে, বা রক্তনালীর অপারেশনে

বেশী রক্তপাতই স্বাভাবিক। কিছু রোগীর রক্তক্ষরণের প্রবনতা থাকে যেমন congenital haemorrhagic disorders, অসম রক্ত সঞ্চালন (incompatiable blood transfusion) হলে, অত্যধিক রক্ত সঞ্চালন (massive blood transfusion) হলে—এসব ক্ষেত্রে অপারেশনের আগেই রোগীকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে Gardner সর্বপ্রথম arteriotomy ক'রে নিয়ন্ত্রিতভাবে রক্তচাপ হ্রাস (controlled hypotension) করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে Griffiths এবং Gillies total spinal block করে ইচ্ছাকৃত ভাবে রক্তচাপ কমিয়ে অপারেশনে সাহায্য করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে Bromage প্রথম high extradural block করে controlled hypotension করেন। এর পর থেকে ganglionic blocking ওষুধ দিয়ে খুব ভালোভাবে রক্তচাপ কমানোর উপায় প্রবর্তন হয়। এর জন্য Enderby এবং Davidson এর নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে short acting ganglionic blocking ওষুধ arfonad-এর ব্যাপক ব্যবহার চালু হয়। বর্তমানে sodium nitroprusside এই একই কারণে বহুল ব্যবহৃত হয়।

এই hypotensive অ্যানেস্থিসিয়া পদ্ধতি খুব সাবধানে বিশেষজ্ঞ অ্যানেস্থিটিষ্টের তত্ত্বাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। কেন না এটি খুব নিরাপদ পদ্ধতি নয়। রক্তচাপ যদি অস্বাভাবিক ভাবে অত্যন্ত কমে যায় এবং তা যদি অনেকক্ষন স্থায়ী হয়, তবে রোগীর vital organs যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার, কিডনি এবং মস্তিষ্কে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতি এমন ভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন ভাল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (controllability) থাকে, ইচ্ছেমত এবং সহজে স্বাভাবিক রক্তচাপ মাত্রায় ফিরিয়ে আনা যায় এবং রক্তচাপ কখনো যেন ৬০ মি. মি. মার্কারীর (systolic) নীচে না নামে।

এই hypotensive অ্যানেস্থিসিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হোল একটি ভাল প্রায় রক্তশূন্য অবস্থা শল্যচিকিৎসার জন্য পাওয়া। সুতরাং যে সব ক্ষেত্রে প্রচুর রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে ক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণতঃ বড় বড় টিউমারের এর অপারেশনে, aneurism-এ, arterio-venous fistulaতে, hemimandibulectomyতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে যেখানে সুষম শল্যচিকিৎসার প্রয়োজনে একেবারে রক্তশূন্য অপারেশন ক্ষেত্রের (dry operative field) দরকার হয়

যেমন microsurgery-তে, hypotensive অ্যানেস্থিসিয়া করার দরকার হয়। এখানে রক্তপাত খুব বেশী হয়ই না কিন্তু অল্প রক্তই শল্যচিকিৎসায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

অনেক সময় বিপজ্জনক রক্তচাপবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

হাইপোটেনশিভ অ্যানেস্থিসিয়ায় অপারেশন করলে কিছু বাড়তি স্থবিধে পাওয়া যায়। ভালভাবে dissection করা যায়, সুস্থ এবং রোগাক্রান্ত কোষে ভালভাবে চিনে নিতে পারা যায়, রক্তনালী এবং নার্ভ গুলিকে সুন্দর ভাবে চেনা যায়। ফলে অপারেশন বেশ তাড়াতাড়ি হয় এবং অনেকাংশে নিখুঁত হবার সম্ভাবনা থাকে। নতুবা বেশী রক্তপাতের ফলে শল্যচিকিৎসকের পক্ষে সূক্ষ্ম কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে রক্তপাত কম সুতরাং রক্ত সঞ্চালন (blood transfusion) এদের কম লাগে এবং এর আনুষংগিক উপসর্গও এদের স্বাভাবিক কারনেই কম হয়। তবে হাইপোটেনশিভ অ্যানেস্থিসিয়ায় অপারেশন করলে যতটা রক্তপাত হয় ততটাই রক্ত সঞ্চালন করা বিধেয়। মস্তিষ্কের অপারেশনের সময় brain vloume বেশী কমে যায় ফলে চিকিৎসার স্থবিধে হয়।

তবে সব সময়েই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকলে হাইপোটেনশিভ অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া উচিত নয়। Fluid এবং রক্তের পূর্বব্যবস্থা না থাকলে করা উচিত নয়, কেন না দরকারে এসব দিতে না পারলে বিপত্তি ঘটতে পারে। রোগীর হৃৎপিণ্ডজনিত, কিডনি জনিত, লিভার-জনিত, বিপাকজনিত, এবং মস্তিষ্কজনিত অসুখ থাকলে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয়। রোগীর বেশী রকমের রক্তাল্পতা থাকলে, hypovolaemia থাকলে, endocrine disorder থাকলে একই কথা প্রযোজ্য। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রেও এভাবে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া উচিত নয়। যাদের শ্বাসকষ্ট আছে, ফুসফুসের অসুখ আছে তাদেরও এই অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া নিরাপদ নয়।

Hypotensive অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি ঃ

১। Arteriotomy ঃ এই পদ্ধতি এখন আর ব্যবহার করা হয় না। এতে রোগীর শরীর থেকে কিছু রক্ত বের করে নেওয়া হয় যতক্ষণ না পূর্বনির্ধারিত রক্ত-চাপের মাত্রায় আসে। এতে রক্তচাপ কমে প্রধাণতঃ circulatory blood

volume কমানোর ফলে। একটি পূর্ণবয়স্ক সাধারণ মানুষের ১০০ মি. লি. রক্ত বের করে নিলে তার রক্তচাপ ক'মে প্রায় ১০০ মি. মি. মার্কারীতে দাঁড়ায়। তারপর দরকার মত ২০০ মি. লি. করে রক্ত বের করা হয়। রক্তচাপ দরকার মত কমলে অপারেশন করা হয়।

এই ভাবে বের করে নেওয়া রক্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে acid citrate dextrose solution-এ রাখা হয় এবং অপারেশনের পরে আবার দেহে সঞ্চালন করা হয়। এই পদ্ধতি খুব ভাল নয় এবং এতে বিপদও আছে। এতে রক্তচাপ ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

২। Total spinal block : অনেকে high spinal block করে hypotensive অ্যানেস্থিসিয়া দেন। এই block প্রথম থোরাসিক vertebra পর্যন্ত যায় এবং ফলে total sympathetic paralysis হয়। Peripheral vasodilatation হয়, blood pooling হয় এবং রক্তচাপ কমে যায়।

এতে অবশ্যই রক্তশূন্য অপারেশনের ক্ষেত্র (bloodless operative field) পাওয়া যায় এবং খুব ভাল nuscular relaxation হয়। কিন্তু এতে ভাল নিয়ন্ত্রণ (controllability) এবং reversibility থাকে না। অনেক সময় অত্যধিক রক্তচাপ কমে গিয়ে রোগীর ক্ষতি করে। এই block-এ রোগী অত্যন্ত কষ্ট এবং অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, শ্বাসপ্রশ্বাসও ব্যাহত হতে পারে। শরীরে অক্সিজেনের অভাবও ঘটতে পারে—তাই অনেক সময় light general অ্যানেস্থিসিয়া এই block দিলেও দিতে হয়। এছাড়া spinal অ্যানেস্থিসিয়ার যেসব ঝুঁকি আছে তাও এক্ষেত্রে থাকবে।

৩। High epidural block ঃ বিশেষ ভাবে যখন pelvis এ অপারেশন হয়, prostate অপারেশন, বা panhysterectomy করা হয় তখন epidural অ্যানেস্থিসিয়াতে অপেক্ষাকৃত কম রক্তপাত হয়। এখানেও peripheral resistance কমার জন্য রোগীর রক্তচাপ কমে। তবে এক্ষেত্রেও ঠিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা (controllability) এবং পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা (reversibility) থাকে না। ঠিকমত predict করাও সম্ভব হয় না।

৪। Drug induced hypotension (ঔষধ প্রয়োগে রক্তচাপহ্রাস) : এক্ষেত্রে autonomic ganglia অথবা adrenargic নার্ভকে block করে vasodilatation করা হয় এবং তারই ফলে রক্তচাপ কমে। যেসব ওষুধ এই জন্য ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য, যেমন—hexametho-

nium, pentamethonium, pentolinium, trimetaphan এবং phenactropinium। এদের মধ্যে ট্রাইমেটাফান খুবই সাফল্যের সংগে বহুল ব্যবহৃত।

ট্রাইমেটাফান একটি short acting thiophanium group-এর ওষুধ। এটির ganglion blocking effect-এর ফলে রোগীর রক্তচাপ কমে। এটি peripheral vessels-এর উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রসারন ঘটায়। এটি শরীর histamine নিঃসরণ করায়। অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় শিরাপথে drip দিয়ে দেওয়া হয়। সাধারনতঃ ০'১% solution-এ আস্তে আস্তে drip দিয়ে দেওয়া হয়। বার বার ইঞ্জেকশন দিয়েও রক্তচাপ কমানো যেতে পারে—সেক্ষেত্রে ৫% solution ব্যবহার করা হয়—২'৫ থেকে ৫ মি. গ্রাম হিসাবে। সাধারনতঃ খুব অল্প সময়েই প্রয়োজনমত রক্তচাপ কমে যায়। সব থেকে বেশী মাত্রা যেন কখনও ১ গ্রামের বেশী না হয়। এটি কখনও কখনও tachyphylaxis, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি এবং দীর্ঘস্থায়ী রক্তচাপ হ্রাস করতে পারে। কিছুটা cholinesterase দিয়ে নষ্ট হবার পর কিডনি দিয়ে বেরিয়ে যায়।

Hexamethonium একটি ganglion blocking ওষুধ। এদিয়েও hypotensive অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যায়। এটি শিরাপথে ২০ থেকে ৫০ মি. গ্রা. দেওয়া হয়। রক্তচাপ মনোমত না কমলে ৫ মিনিট পর আবার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এই ওষুধে অত্যধিক নাড়ীর গতি বেড়ে যায় এবং তার ফলে রক্তচাপহ্রাস রাখা কষ্টকর হয়। হেক্সামেথোনিয়াম ব্যবহার করার আগে একটি প্রাথমিক মাত্রা test dose দিয়ে দেখে নেওয়া উচিত কেননা এটি বিশেষ ক্ষেত্রে hypersensitive reaction করতে পারে। তার ফলে অত্যধিক এবং অস্বাভাবিকভাবে রক্তচাপ কমে যেতে পারে।

Pentolinium'ও ভালভাবে রক্তচাপ কমায়। এটিও ganglion blocking ওষুধ, তবে হেক্সামেথোনিয়াম থেকে ৫ গুণ কার্যকরী এবং এটি দীর্ঘস্থায়ীও বটে। প্রথমদিকে ৩ থেকে ২০ মি. গ্রা. শিরাপথে দেওয়া হয় এবং রক্তচাপ বেশ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এই রক্তচাপ হ্রাস আরও ভাল হয় যদি ঠিকমত posture এবং controlled ventilation এর সাহায্য নেওয়া হয়। এটি নাড়ীর গতি খুব একটা বাড়ায় না। একবার ইঞ্জেকশনে প্রায় ৪৫ মিনিট কার্যকরী থাকে। কিন্তু রক্তচাপ স্বাভাবিক হতে অনেক ঘণ্টা দেরী হতে পারে।

এই সব ganglion blocking ওষুধ ছাড়াও বর্তমানে sodium nitro-

prusside এই হাইপোটেনশিভ অ্যানেস্থিসিয়ায় সাফল্যের সংগে ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি রক্তনালীর smooth muscle-এর ওপর প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে এবং বেশী রকমের vasodilatation করে। এটির myocardium-এর উপর কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। তবে এটি নাড়ীর গতি বৃদ্ধি করতে পারে। এটি drip methodএ ০'০১% solution-এ ব্যবহার করা হয়। দেওয়ার ১½ মিনিটের মধ্যেই রক্তচাপ কমতে শুরু করে এবং drip শেষ করার ৬ মিনিটের মধ্যেই রক্তচাপ আবার স্বাভাকি মাত্রায় ফিরে আসে। Sodium nitroprusside ওষুধের মোট মাত্রা (total dose) যেন কখনই ৩ থেকে ৩'৫ মি. গ্রা./কে জি র বেশী না হয়। বেশী মাত্রায় দিলে শরীরে কিছু degraded product যেমন cyanide এবং thiocyanate জমে ওঠে এবং শরীরে ক্ষতি সাধন করতে পারে। রোগীর লিভারের অসুখ থাকলে বা ভিটামিন B_{12} অভাব ঘটিত অসুখ থাকলে বা অপুষ্টিজনিত অসুখ থাকলে sodium nitroprusside ব্যবহার না করাই ভাল।

৫। **Halothane—tubocurarine combination :**

এটিও hypotensive অ্যানেস্থিসিয়ার একটি ভালো পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রোগীকে জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয় নাইট্রাস অক্সাইড, অক্সিজেন এবং হ্যালোথেন দিয়ে। মাঝে মাঝে টিউবোকিউর্যারিন—muscle relaxant হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হ্যালোথেন খুব ভালভাবে vasodilatation করে এবং তার ফলে রক্তচাপও কমে। টিউবোকিউর্যারিন এই রক্তচাপহ্রাসকে আরও প্রভাবিত করে, কেননা এটিরও খানিক ganglion blocking effect আছে। হ্যালোথেনের concentration ইচ্ছামত বাড়ানো বা কমানো যায় মনোমত রক্তচাপ মাত্রা ঠিক রাখার জন্য। এর সংগে posture এবং controlled ventilatlon-এর সাহায্য নিলে আরও ভাল হয়।

Hypotensive অ্যানেস্থিসিয়ার একটি নির্ধারিত পদ্ধতি ঃ

রোগীকে অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার অনেক আগেই ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। দরকার মত routine laboratory investigations করা দরকার। রোগীর রক্তহীনতা থাকলে তার পর্যাপ্ত চিকিৎসা করতে হবে। রোগীর রক্তের group পরীক্ষা করা দরকার এবং অপারেশনের ব্যাপকতা অনুযায়ী রক্তের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

রোগীকে ভাল premedication দেওয়া হয়। সাধারণতঃ পেথিডিন এবং প্রোমেথাজিন দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে এট্রোপিন না দেওয়াই ভালো, কেননা এটি নাড়ীর গতি বৃদ্ধি করে। রোগীর নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হলে রক্তচাপ হ্রাস ঠিক মত করা শক্ত হয়।

অ্যানেস্থিসিয়া আরম্ভ করা হয় শিরাপথে থায়োপেণ্টান এবং টিউবোকিউর‍্যারিন দিয়ে। গ্যাল্যামিন (gallamine) দেওয়া হয় না কেননা এটি নাড়ীর গতি বৃদ্ধি করে। উপরন্তু টিউবোকিউর‍্যারিন রক্তচাপ হ্রাস করাতে সাহায্য করে কারণ এর ganglion blocking effect আছে এবং এটি histamine নিঃসরণ করে। এরপর endotracheal intubation করা হয়—সে সময় রোগী যেন না কাশে বা দম বন্ধ করে।

অ্যানেস্থিসিয়া সাধারণতঃ চালু রাখা হয় নাইট্রাশ অক্সাইড, অক্সিজেন এবং টিউবোকিউর‍্যারিন দিয়ে। Controlled ventilation করা হয়। Intermittent positive pressure ventitation করলে রোগীর venous return কম হয় ফলে রক্তচাপ কমতে সাহায্য হয়।

এর পর রোগীকে অপারেশনের জন্য প্রয়োজনমত position করা হয়। যদি অন্য অসুবিধা না থাকে তবে যেন অপারেশনের জায়গা শরীরের অন্য জায়গার তুলনায় একটু উঁচু থাকে। এতে অপারেশন টেবিলকে উপরের দিকে বা নীচের দিকে কাৎ বা tilt করে রাখা হয়। ৩° টেবিল উপরে তুললে বা ২·৫ সে. মি. লম্বাভাবে তুললে রক্তচাপ আনুমানিক ২ মি. মি. মার্কারী কমে যায়। এইভাবে ৩° টেবিল নীচের দিকে কাৎ (tilt) করলে ২ মি. মি. রক্তচাপ বেড়ে যায়।

একটি drip শিরাপথে চালু রাখা হয়। Trimetaphan (Arfonad) ·১% solution রোগীকে দিতে আরম্ভ করা হয়। প্রথমদিকে প্রায় ১০০ ফোঁটা প্রতি মিনিটে। রোগীর রক্তচাপ বার বার দেখতে হবে। যখন নির্ধারিত রক্তচাপের ১০ মি. মি. বেশী থাকে তখনই drip কমিয়ে দিতে হবে-মিনিটে প্রায় ৫০ ফোঁটা বা তারও কম। রক্তচাপ মনোমত কমলেই অপারেশন করতে দেওয়া হয়। রোগীর নাড়ীর গতিবৃদ্ধি হলে শিরাপথে propanolol দেওয়া যেতে পারে।

এই হাইপোটেনশিভ অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় রোগীকে সব সময়ে ভাল পর্য্যবেক্ষণে রাখা উচিত। এ সময় রোগীর নাড়ী, রক্তচাপ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের

দিকে নজর রাখতে হবে। দরকারের চেয়ে বেশী সময় যেন রোগী রক্তচাপ-হ্রাসে না থাকে তাও দেখতে হবে। শিরাপথে infusion বা রক্ত সঞ্চালন (blood transfusion) দিতে হবে। মনে রাখতে হবে রোগীর রক্তচাপ এই hypotensive phase-এ কখনই ৬০ থেকে ৭০ মি. মি. মার্কারীর নীচে না নামে।

অপারেশনের পরে রোগীর রক্তচাপ আবার স্বাভাবিক পর্য্যায়ে নিয়ে আসতেই হবে। Arfonad drip আগেই বন্ধ করে দিতে হবে। গ্লুকোজ বা গ্লুকোজ-স্যালাইনের infusion rate বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনমত অপারেশন টেবিল horizontal position-এ আনতে হবে। এর পরও যদি রক্তচাপ স্বাভাবিক না হয় শিরাপথে ৫ থেকে ১০ মি. গ্রা. মেথোক্সামিন (methoxamine) দেওয়া যেতে পারে। রোগীর যতটা রক্তপাত হয় অন্ততঃ ততটা রক্ত transfusion দেওয়া উচিত।

অপারেশনের পরেও রোগীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। রোগীর নাড়ী, রক্তচাপ এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক আছে কিনা বার বার দেখতে হবে। রোগীর প্রস্রাব ঠিকমত হলে বুঝতে হবে কিডনি মোটামুটি ভালই আছে। হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ভালভাবে বুঝতে হলে একটি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করে দেখা দরকার। রোগীর cerebral function ঠিক আছে কিনা, তার জ্ঞান বুদ্ধি, বিচার বিবেচনা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি ঠিক আছে কি না তাও যথাযথ দেখা উচিত।

Hypotensive অ্যানেস্থিসিয়া দিতে গেলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং সুনিয়ন্ত্রিত team work-এর দরকার হয়। এই পদ্ধতিতে সুফল পেতে গেলে ঠিকমত পরীক্ষা করে রোগী নির্বাচন করতে হয়। এই অ্যানেস্থিসিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অ্যানেস্থিসিয়ার আগে এবং পরে রোগীকে বিশেষ পর্য্যবেক্ষনে রাখা একান্ত দরকার। সুচারুভাবে অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী পরচর্য্যা করাও অত্যন্ত জরুরী। Hypotensive অ্যানেস্থিসিয়া একমাত্র তখনই করা উচিত যখন এর সাহায্যে রোগীর এবং অপারেশনে নিশ্চিত উপকার করা যাবে এবং এর সংগে তার স্বীকৃত সম্ভাব্য বিপদগুলোও এড়িয়ে যাওয়া যাবে।

এই hypotensive অ্যানেস্থিসিয়ার কয়েকটি নতুন উপসর্গ হতে পারে : অপারেশনের পর অত্যধিক রক্তক্ষরণ (reactionary haemorrhage) হতে

হতে পারে। Central retinal thrombosis হয়ে দৃষ্টি শক্তি লোপ পেতে পারে। Kidney failure, liver dysfunction, massive atelectasis এসবও হতে পারে। এতে হঠাৎ হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার বা cardiac arrest হওয়ারও আশংকা থাকে। এই পদ্ধতিতে বিফলতাও অনেক সময় হয় অর্থাৎ ঠিক সময় রক্তচাপ ঠিক কমে না। এই বিফলতা সাধারণতঃ কয়েকটি কারণে হতে পারে। যে কোন কারণে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হলে, ঠিকমত ganglion blocking না হলে অথবা pheochromocytoma-র মত অসুখ থাকলে অকৃতকার্য্য হওয়ার অবকাশ থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইনটেনশিভ কেয়ার

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হওয়ার ফলে এখন অনেক কঠিন অসুখ থেকে রোগীর মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আগেকার দিনে যে সমস্ত অসুখে রোগীর মৃত্যু প্রায় অবধারিত ছিল, এখন অনেক ক্ষেত্রে সুচিকিৎসার ফলে তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এই সমস্ত অত্যন্ত কঠিন অবস্থার রোগীর চিকিৎসা সাধারণ ওয়ার্ডে সাধারণভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। করোনারী থ্রম্বোশিস এবং ব্যাহত শ্বাসক্রিয়ার রোগীর ক্ষেত্রে, বিষক্রিয়ায় অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যত্ন পরিচর্য্যা এবং চিকিৎসার জন্য ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে এই রোগীদের ভর্তি করা প্রয়োজন। বড় বড় কঠিন অপারেশনের পর, হার্টের এবং রক্ত-নালীর অপারেশনের পর, organ transplantation-এর পর রোগীকে বিশেষ-ভাবে এই সব ইউনিটে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে চিকিৎসা করা উচিত। আমাদের দেশেও বড় বড় হাসপাতালে ইদানীং ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিট গড়ে উঠেছে এবং এর ফলে কত অমূল্য প্রাণ যে রক্ষা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

এখানে সমস্ত হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ড থেকে সংঘাতিকভাবে অসুস্থ রোগীদের একত্রে এই ইউনিটে পর্য্যাপ্ত তত্বাবধানে রাখা হয়। এরা সাধারণ রোগীদের থেকে স্বাভাবিক কারণেই বেশী যত্ন পায়। এই সব ইউনিটে বেশী রোগীর ভিড় থাকে না। রোগী পিছু পর্য্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে এরা থাকে—যে কোন রকমের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পেতে এই সব রোগীর কোন অসুবিধে থাকে না। বহুরকমের মূল্যবান যন্ত্রপাতি এই সব ইউনিটে সব সময়েই প্রস্তুত রাখা হয়। Ventilator cardiac monitor, suction apparatus, defibrillator, অক্সিজেন থেরাপির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব সময়েই এখানে মজুত থাকে।

এই সব ইউনিট চালানো অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। যেহেতু অত্যন্ত খারাপ ধরণের রোগীই এখানে চিকিৎসিত হয়, স্বাভাবিক কারনেই এখানে অন্য ওয়ার্ডের তুলনায় রোগীদের মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশী। চিকিৎসক এবং নার্সদের অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সতর্কতার সংগে এখানে কাজ করতে হয়।

সাধারণভাবে সমগ্র হাসপাতালের রোগীর শতকরা ২ হিসাবে এই ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটের বিছানার সংখ্যা নিরূপণ করা হয়। ৫০০ বেডের হাসপাতালে ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে শয্যা সংখ্যা হবে ১০।

সাধারণ রোগী সাধারণ ওয়ার্ডে যতটা জায়গা পায় এরা প্রায় তার দ্বিগুণ পায়। ২০০ থেকে ২৫০ বর্গ ফুট প্রতি রোগীর জন্য floor space ধরা হয়। প্রত্যেক রোগীর অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত রাখা হয়। Compressed air দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক শয্যার জন্য বেশ কয়েকটি ইলেকট্রিক পয়েন্ট রাখা হয়—যে কোন সময়ে তা ব্যবহার করার জন্য। সাধারণভাবে রোগীরা একই ঘরে থাকতে পারে—একদিকে পুরুষ এবং অন্যদিকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা চলে। তবে বীজাণু সংক্রামিত রোগীর জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা রাখা উচিত। করোনারী রোগীর জন্য নিরিবিলি আলাদা ছোট ঘর (cubicle) রাখা দরকার।

এই সব ইউনিটে আলাদা অফিস, কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং নার্সদের থাকার ব্যবস্থা রাখা অবশ্য কর্তব্য। আবাসিক চিকিৎসকের জন্য আলাদা সংলগ্ন ঘর রাখা উচিত। পুরো ইউনিট শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (air conditioned) হওয়া বাঞ্ছনীয়। ল্যাবরেটারীতে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা এই ইউনিটেই রাখতে হবে। দামী যন্ত্রপাতি রাখার জন্য ভালো store room রাখা দরকার। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের জন্য আলাদা ঘর এবং ভাল লাইব্রেরী থাকা উচিত। সমস্ত ঘর পর্য্যাপ্ত আলোবাতাস যুক্ত হওয়া দরকার।

এই ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে ভালভাবে যাচাই করে তবেই রোগী ভর্তি করা উচিত। সাধারণভাবে দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে বা বুকে আঘাতপ্রাপ্ত রোগী, মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে, ফুসফুসে বা বড় বড় ধমনীতে অপারেশনের পরে, যে কোন কারণে cardiac arrest হলে, এবং যে সব ক্ষেত্রে রোগীকে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য্য চালানো দরকার—তারাই এই ইউনিটে ভর্তির অগ্রাধিকার পায়। নানাধরনের বিষক্রিয়ার চিকিৎসাও এই ইউনিটে হওয়া উচিত। Bulbar poliomyelitis, status epilepticus, status asthmaticus ইত্যাদি অসুখের চিকিৎসা এখানেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সব রোগীর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য্য চালানোর জন্য, ঠিকমত রক্ত সঞ্চালনের জন্য, রোগীর পুষ্টি (nutrition) বজায় রাখার জন্য, fluid

এবং electrolyte ঠিকমত ব্যবহার করার জন্য, রোগীর হৃদযন্ত্র এবং রক্তপ্রবাহ (circulation) ঠিক রাখার জন্য অ্যানেস্থিসিয়া বিশেষজ্ঞদেরই দায়িত্ব সব থেকে বেশী। তাই এই সব ইউনিটে অবেদনবিত্তাবিশারদ (anaesthetist) কেই clinical incharge করা হয়।

Surgery, medicine, E. N. T., biochemistry ইত্যাদির বিশেষজ্ঞরাও এই ইউনিটে যুক্ত থাকেন এবং প্রয়োজন হলেই এঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়। Resident medical officerই দৈনন্দিন রোগীর দেখাশোনা করেন বিশেশজ্ঞদের পরামর্শমত। রোগী ভর্তির অধিকার একমাত্র তারই থাকা উচিত।

এই সব রোগীর যত্ন এবং পরিচর্যা অত্যন্ত দরকারী। সাধারণ ওয়ার্ডে যে পরিচর্যা করা হয় এখানে তার থেকে আরও সুচারু হওয়া দরকার। যেহেতু এখানে সব রোগীই অত্যন্ত জটিল এবং মরণাপন্ন সুতরাং এক্ষেত্রে সর্বক্ষণের সতর্কতা প্রয়োজন। অনেক হাসপাতালে এ বিষয়ে নার্সদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেহেতু এই সব নার্সদের দায়িত্ব অনেক—এঁদের ভালভাবে নির্বাচন করা উচিত।

ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে যে সব রোগের বিশেষ ভাবে চিকিৎসা করা হয় সেগুলির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

একটি অচৈতন্য রোগীর পরিচর্যা ঃ

রোগী যে কারণেই অজ্ঞান হোক না কেন প্রাথমিকভাবে রোগীর কয়েকটি বিশেষ চিকিৎসা করা উচিত।

প্রথমেই রোগীর শ্বাসনালী (airway) ঠিক বাধামুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে। মুখ এবং নাক ভালভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে। কোন secretion, foreign body, রক্ত ইত্যাদি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। একটি oropharyngeal airway টিউব মুখে পরিয়ে দেওয়া উচিত। অজ্ঞান অবস্থায় রোগীর জিভ এবং epiglottis নীচের দিকে ঝুলে পড়ে এবং তার শ্বাসনালী অবরুদ্ধ (airway obstruction) হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই airway টিউব দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। রোগীকে ভাল আলোবাতাসযুক্ত জায়গায় রাখা উচিত। রোগীর মাথা পেছনের দিকে বাঁকিয়ে (hyperextend ক'রে) রাখলে এবং চোয়ালটি সামনের দিকে তুলে ধরলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধে হয়।

রোগীকে পাশ ফিরিয়েও রাখা যায়। অনেক সময় রোগীর পায়ের দিকটি একটু তুলে রাখলে রক্তপ্রবাহের সুবিধে হয়।

রোগী যদি ঠিকমত শ্বাসপ্রশ্বাস না নিতে পারে তবে যথোপযুক্ত endo-tracheal intubation করে Boyle অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসকার্য্য চালানো যেতে পারে। অনেকদিন ধরে কৃত্রিম শ্বাসকার্য্য চালাতে হলে automatic ventilator-এর সাহায্য নেওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, অনেক দিন ধরে কৃত্রিম শ্বাসকার্য্য চালানোর জন্য অথবা ঠিকমত tracheobronchial toilet করার জন্য tracheostomy করার দরকার হতে পারে। এই সব tracheostomy করা রোগীদের বিশেষভবে যত্ন নেওয়া উচিত। ঠিকমত বার বার suction করে শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখতে হবে। ভেতরের tracheostomy টিউব মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করা দরকার। আর পুরো tracheostomy টিউবটি ২ দিন অন্তর পরিবর্তন করা হয়। রোগীর বীজাণু সংক্রমন যাতে না হয় তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যেতে হবে। এণ্ডোট্রেকীয়াল টিউব বা tracheostomy টিউব পাল্টানোর সময় সাবধানে বীজাণুমুক্ত অবস্থা বজায় রেখে করতে হবে।

এই সব রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ এবং দেহের তাপমাত্রার দিকে নজর রাখতে হবে। বার বার রোগীকে পরীক্ষা করে তা একটি তালিকায় লিখে রাখা উচিত। রোগীর painful stimuli দিলে কোন সাড় আছে কিনা, light reflex আছে কি না, pupil এর মাপ কেমন—এসব ভাল ভাবে দেখা দরকার। রোগীর মুখের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে। চোখে যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য কয়েক ফোঁটা liquid paraffin দেওয়া হয়। রোগীর মূত্রাশয়ে একটি indwelling ক্যাথেটার দিয়ে রাখা দরকার। রোগীকে শিরাপথে অথবা Ryles টিউব দিয়ে খাবার (feeding) দেওয়া হয়। রোগীর fluid, electrolyte এবং acid base balance যাতে ঠিক থাকে তাও দেখতে হবে। রোগীর দেহের তাপমাত্রা কখনই বেশী বাড়তে বা কমতে দেওয়া উচিত নয়। হঠাৎ তাপবৃদ্ধি ঘটলে বরফ ব্যাগ (ice bag) ব্যবহার ক'রে এবং বরফ জলে শরীর মুছিয়ে দিয়ে তাপ কমানো উচিত। আবার তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে slow controlled warming করা দরকার।

এরপর কেন রোগী অজ্ঞান হয়েছে তার যথাযথ কারণ নির্ণয় করা দরকার এবং কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

বারবিচুরেট বিষক্রিয়া :

আধুনিক যুগে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা এক বিরাট সমস্যা। নানা রকমের ঘুমের ওষুধের মধ্যে barbiturate group-এর ওষুধ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বারবিচুরেট বিষক্রিয়া তখনই হয় যখন এটি বেশী পরিমাণেআত্মহত্যার জন্য স্বেচ্ছায় লোকে খায়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ভুলক্রমে বা না জেনে দুর্ঘটনাক্রমে বেশী ওষুধ খেলেও বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

বারবিচুরেট ওষুধ নানা প্রকারের হয়। যে সব ওষুধের ক্রিয়া শরীরে অনেকক্ষণ থাকে তাদের long acting বলা হয়, যেমন phenobarbitone, barbitone ইত্যাদি। আবার যাদের ক্রিয়া খুব কম সময়ের জন্য থাকে তাদের ultra short acting বলে যেমন থায়োপেন্টোন, মেথোহেক্সিটোন, thialbarbitone ইত্যাদি। আর মাঝামাঝি medium acting ওষুধ যেমন quinalbarbitone, butobarbitone, pentobarbitone ইত্যাদি। Ultra short acting ওষুধগুলি সাধারণতঃ অ্যানেস্থিসিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং মুখে খাওয়ানো হয় না। Long acting এবং medium acting ওষুধ সাধারণতঃ ঘুমের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং বেশীর ভাগ এরাই বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঠিক কতটা ওষুধ খেলে মৃত্যু ঘটে তা বলা কঠিন, তবে medium acting ওষুধ ৪ থেকে ৬ গ্রাম এবং long acting ওষুধ ৫ থেকে ৮ গ্রাম খেলে (lethal dose) মৃত্যু ঘটে।

বারবিচুরেট বিষক্রিয়া নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। সাধারণতঃ বাড়ীর লোকেই বলে রোগীর ঘুমের ওষুধ খাওয়া কথা—খালি ওষুধের শিশিও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। অত্যধিক ওষুধের প্রভাবে রোগী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—এমন কি পরে অজ্ঞানও হয়ে যায়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যায়—রক্তচাপ কমে যায়, নাড়ীর গতি বেড়ে যায়। অবশেষে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে স্থিরনিশ্চিত হওয়া যায়। Long acting barbiturate-এর ক্ষেত্রে রক্তে বারবিচুরেট মাত্রা যদি ১০ মি. গ্রা / ১০০ মি. লি. বা তার চেয়ে বেশী হয় আর medium acting ওষুধের ক্ষেত্রে যদি ৩ মি. গ্রা. / ১০০ মি. লি. বা তার উপর হয়, তবে বুঝতে হবে—ওষুধের বিষক্রিয়া ভালোই হয়েছে এবং তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা একান্ত দরকার।

রোগীর level of consciousness কোন পর্য্যায়ে আছে তা দেখতে হবে।

নিজে থেকে হাত পা নাড়ছে কি না—চিমটি দিলে সাড়া দিচ্ছে কিনা অথবা হাত পা শিথিল হয়ে গেছে কি না তাও দেখতে হবে। চোখের pupil ছোট বা বড় হয়ে গেছে কিনা তাও দেখা দরকার।

রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক না থাকলে মুখ এবং শ্বাসনালী পরিষ্কার করে প্রয়োজনবোধে এণ্ডোট্রেকীয়াল টিউব পরিয়ে পজিটিভ প্রেশারে অক্সিজেন দিতে হবে। Ventilator থাকলে তারও সাহায্য নেওয়া হয়।

শিরাপথে স্যালাইন বা গ্লুকোজ সলিউশন দিতে হবে। রোগীর নাড়ীর গতি এবং রক্তচাপের দিকে নজর রাখতে হবে। যদি রোগী ওষুধ খাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই ধরা পড়ে তবে পাকস্থলীতে Ryles টিউব পরিয়ে তা বের করে আনতে হবে এবং gastric lavage দিতে হবে।

রোগীকে ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে রেখে চিকিৎসা করা দরকার। রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করে বারবিচুরেট মাত্রা দেখা দরকার। রক্তের gas analysis এরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

বারবিচুরেট বিষক্রিয়ার কোন প্রতিষেধক (antidote) নেই সুতরাং supportive treatment-এর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং যাতে রোগীর শরীর থেকে তাড়াতাড়ি বারবিচুরেট বেরিয়ে যেতে পারে—তারই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রথম থেকেই forced diuresis বা জোর করে ওষুধের সাহায্যে বেশী প্রস্রাবের ব্যবস্থা করতে হবে—যাতে বারবিচুরেট প্রস্রাবের সংগে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী (long acting) ওষুধগুলি ভালভাবে বেরিয়ে যায়—কেননা এগুলি খুবই কম protein-bound এবং অবিকৃতভাবে প্রসাবের সংগে বেরিয়ে যায়। আবার প্রস্রাব যদি ক্ষারীয় (alkaline) হয় তবে আরও ভাল হয়। Forced diuresis-এর জন্য frusemide বা mannitol দেওয়া হয়। অত্যধিক প্রস্রাবের ফলে শরীরের পটাশিয়াম কমে যেতে পারে। সব সময়েই নজর রাখতে হবে যাতে শরীরের জলের ভাগ অত্যধিক কমার জন্য রোগীর না shock হয়। এরজন্য শিরাপথে infusion চালিয়ে যেতেই হবে। Intake এবং output chart রাখতে হবে।

আরও একভাবে শরীর থেকে বারবিচুরেট বের ক'রে দেওয়া যেতে পারে—তা হল dialysis ক'রে। এটি দুরকমে করা হয়—peritoneal dialysis এবং haemodialysis।

Peritoneal dialysis খুব বেশী ফলদায়ক নয়-তবে forced diuresis-এর সংগে করা যেতে পারে। তবে যখন forced diuresis করেও রক্তের বারবিচুরেট মাত্রা কমানো যায় না অথবা forced diuresis-এ রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে-তখনই haemodialysis করার একান্ত দরকার।

বারবিচুরেট বিষক্রিয়ায় রোগীর দেহের তাপমাত্রা সাধারণতঃ কমে যায় তবে সময় বিশেষে তাপমাত্রা বেড়েও যেতে পারে (reactive pyrexia)। সব সময়ে রোগীর দেহের তাপমাত্রা সাধারণ মাত্রায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। শরীরের তাপ কমে গেলে শরীরকে গরম রাখতে হবে আর জ্বর হলে শরীরকে ঠাণ্ডা করতে হবে। এসব ছাড়াও আনুষংগিক চিকিৎসা যেমন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধ, hydrocortisone ইত্যাদির দরকার হতে পারে।

কীটনাশক ওষুধের বিষক্রিয়া ঃ

আধুনিককালে কৃষিকাজের জন্য নানারকমের রাসায়নিক জিনিষের ব্যবহার হয়। এদের মধ্যে কিছু শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ মেরে ফেলার জন্য এবং কিছু গাছের পোকামাকড় মারার জন্য ব্যবহার করা হয়। এদের প্রায় সবগুলিই বিষাক্ত। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে এগুলি ব্যাপক এবং বহুল ব্যবহৃত। আধুনিক চাষবাসের কাজে প্রত্যেক চাষীই কমবেশী এই সব ওধুধ ব্যবহার করে থাকেন। এই ওধুধগুলি অতি অল্প পরিমানেই মানুষের শরীরে গেলে মৃত্যু ঘটাতে পারে। ভুলক্রমে এটি কেউ খেয়ে ফেলতে পারে, স্প্রে করার সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে শরীরে যেতে পারে আবার অনাবৃত শরীরে লাগলে চামড়া দিয়েও শরীরে যেতে পারে এবং তার ফলে মানুষ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। আবার আত্মহত্যার কারণেও স্বেচ্ছায় এই সব ওষুধ খাওয়ার ঘটনা নিতান্ত কম নয়।

কীটনাশক ওষুধগুলি সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয় ঃ

১। ক্লোরিনেটেড ওষুধ যেমন D. D. T. এবং ঐজাতীয় ওষুধ

২। অর্গানো-মার্কারী জাতীয় ওষুধ

৩। অর্গানো-ফসফরাস জাতীয় ওষুধ

অরগানো ফসফরাস জাতীয় ওষুধগুলির মধ্যে প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন, ডাইফ্লস, ডেমেটন ইত্যাদির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাজারে ফলিডল, ডিমেক্রন ইত্যাদি নামে এই সব ওষুধ পাওয়া যায়। এই ওষুধ শরীরে

cholinesterase নামক enzyme-টিকে একেবারে নষ্ট করে ফেলে। আর এই cholinesterase-এর কাজ হচ্ছে শরীরের acetylcholine-কে নষ্ট করে ফেলা। সুতরাং এই অর্গানোফসফরাস ওষুধের বিষক্রিয়ায় শরীরে acetylcholine অত্যধিক বেড়ে যায় এবং তারই ফলে শরীরে নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়।

অরগানোফসফরাস বিষক্রিয়ায় প্রথমদিকে রোগীর ক্ষুধা একেবারে চলে যায়। বমি বমি ভাব এমনকি বমিও হতেও পারে। পেটে মোচড় দেওয়া ব্যথা হয়। অত্যধিক ঘাম নিঃসরণ নয়। হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট হয়। অত্যাধিক থুতু এবং কফ হতে থাকে। মাংসপেশীতে টান ধরে—মাংসপেশীতে twitching হতে পারে এবং পরে মাংসপেশীর শিথিলতা আসে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যে সব মাংসপেশী দায়ী সেইগুলিতেও শিথিলতা আসে, ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হয়। শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। Cyanosis হতে পারে। নাড়ীর গতি কম হতে থাকে, রক্তচাপ কমে আসতে থাকে। রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। খিঁচুনী হতে পারে।

প্রথমত এই সব রোগীর রোগ নির্ণয় ঠিকমত করা উচিত। সাধারণতঃ এই সব ওষুধের ব্যবহার সম্বন্ধে রোগী বা তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে জানা যায়। কী ধরণের ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে খালি শিশি থেকে তা জানা যায়। রোগীর রক্তপরীক্ষার পর রোগ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হওয়া যায়।

এই সব রোগীকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা উচিত। তার নাড়ী, রক্তচাপ এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। রোগীর জ্ঞান আছে কিনা এবং তা কী পর্য্যায়ের তাও দেখতে হবে।

এইসব রোগীর চিকিৎসার জন্য কয়েকটি বিশেষ দিকে নজর রাখা উচিত। প্রথমতঃ রোগের উপসর্গ অনুযায়ী তার চিকিৎসা করা, দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে যাতে শরীরে আর ওষুধ বেশী না যায় এবং তৃতীয়তঃ এই বিশেষ রোগের এট্রোপিন এবং pralidoxime দিয়ে বিশেষ চিকিৎসা।

রোগীকে ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে রেখে চিকিৎসা করা উচিত। রোগের উপসর্গ অনুযায়ী supportive treatment করতে হবে। রোগীকে শিরাপথে infusion দিতে হবে। মুখ এবং শ্বাসনালীতে অত্যধিক রস নিঃসরণ হয় সুতরাং বারবার তা পরিষ্কার করে দিতে হবে, যাতে রোগী ভালভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে। যদি শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যাপ্ত না থাকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য্য চালাতে হবে। প্রয়োজনে এণ্ডোট্রেকীয়াল টিউব পরিয়ে Boyle অ্যনোস্থিসিয়ার মেশিন দিয়ে

শতকরা ১০০ ভাগ অক্সিজেন পজিটিভ প্রেশারে দিতে হবে। আর এসব না থাকলে Ambu bag বা pulmoflator দিয়ে বাতাসের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য্য চালানো যেতে পারে। বড় হাসপাতালে automatic respirator-এর সাহায্য নেওয়া হয়। রোগীর খিঁচুনী হলে শিরাপথে ডায়াজিপাম দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

রোগীর দেহে যাতে আরও বেশী ওষুধ না যেতে পারে তার জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। রোগীর চামড়া বা ত্বক দিয়ে যদি সংক্রমন হয়, তবে দূষিত পোষাক পরিচ্ছদ খুলে ফেলতে হবে। রোগীর সারা দেহ অ্যালকোহল বা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট সলিউশন দিয়ে ভালভাবে মুছিয়ে দিলে উপকার হয়। যদি রোগী ওষুধ খেয়ে আসে তবে প্রথামত নর্মাল স্যালাইন দিয়ে gastric lavage করতে হবে।

অরগানো-ফসফরাস বিষক্রিয়ার বিশেষ চিকিৎসা করা হয় এট্রোপিন ও pralidoxime দিয়ে। এট্রোপিন সালফেট দিলে রোগীর অনেক উপসর্গ কমে যায় কিন্তু এট্রোপিন কখনও মাংসপেশীর শিথিলতা দূর করতে পারে না এবং রক্তের cholinesterase level-কে আবার স্বাভাবিক করে দিতে পারে না। সেই দুটি কাজ করার জন্য অবশ্যই pralidoxime দিতে হবে।

রোগীকে এট্রোপিন সালফেট ২ মি. গ্রা. ১০ মিনিট অন্তর অন্তর শিরাপথে দিতে হবে যতক্ষণ না এট্রোপিনের বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তা বোঝা যায় চোখের মণি প্রসারিত হলে, নাড়ীর গতি খুব দ্রুত হলে এবং মুখ জিভ একেবারে শুকনো হয়ে গেলে। এট্রোপিন ঠিকমত ঠিকসময়ে না দিলে pulmonary oedema হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। Pralidoxime ১ থেকে ২ গ্রাম খুব আস্তে শিরাপথে দেওয়া হয়। Pralidoxime দিলেও এট্রোপিন দিয়ে যেতে হবে এবং পরবর্তী কয়েকদিনও অল্প পরিমাণে দিয়ে যাওয়া ভালো। Pralidoxime না পেলে অগত্যা শুধু এট্রোপিনই দিতে হবে এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য্য চালিয়ে যেতে হবে এবং এতে অনেক সময়ই উপকার পাওয়া যায়।

ক্লোরিনেটেড ওষুধ যেমন ডি ডি টি ২০ গ্রামেরও বেশী খেলে বিষক্রিয়া হয়। মাংসপেশীতে টান ধরে, খিঁচুনী হয় এবং শ্বাসকার্য্য ব্যাহত হয়। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা বিধেয়। পাকস্থলী পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। খিঁচুনীর জন্য ডায়াজিপাম বা বারবিচুরেট দিতে হবে।

অরগানোমার্কারী জাতীয় ওষুধের বিষক্রিয়ায় বমি হয়, পেটে ব্যথা হয়।

রক্ত বমি এবং রক্ত পায়খানাও হতে পারে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয়। kidney failureও হয়। এক্ষেত্রেও উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। তবে বেশী বিষক্রিয়ায় dimercaprol ইঞ্জেকশন দিলে বিশেষ উপকার হয়।

ঘুমের ওষুধের (Narcotic) বিষক্রিয়া ঃ

সাধারণতঃ আফিম, মরফিন বা পেথিডিন দিয়েই এই ধরণের বিষক্রিয়া হয়। এটি ভুল করে বেশী পরিমানে খেলে বা ইঞ্জেকশন দিলে বিষক্রিয়া হয়। অনেকে আত্মহত্যার কারণেও এইসব ওষুধ ব্যবহার করে।

এই বিষক্রিয়ায় রোগী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, পরে অজ্ঞান হয়ে যায়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অত্যন্ত কমে যায়। এই ব্যাহত শ্বাসক্রিয়ার জন্য রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং cyanosis হয়। হৃৎপিণ্ডের কাজও শ্লথ হয়ে পড়ে। রোগীর নাড়ী দ্রুত হয়, রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যেতে পারে। চোখের pupil খুব ছোট-pinpointed হয়ে পড়ে। শেষে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

এই বিষক্রিয়ার প্রথম এবং প্রধান চিকিৎসা হোল রোগীকে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য্য চালানো। দরকার হলে এণ্ডোট্রেকীয়াল টিউব পরিয়ে পজিটিভ প্রেশারে কৃত্রিম শ্বাসকার্য্য চালাতে হবে।

এই বিষক্রিয়ার বিশেষ প্রতিষেধক (specific antagonist) আছে যেমন —nalorphine বা levallorphan tartrate। এই ওষুধ ঠিকমত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রথমে খুব অল্প মাত্রায় ২·৫ মিলি গ্রাম শিরাপথে ১০ থেকে ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর দেওয়া হয় যতক্ষণ না শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। এই চিকিৎসার সময় রোগীকে খুব ভাল পর্য্যবেক্ষণে রাখা দরকার। Nalorphine বেশী মাত্রায় respiratory depression করতে পারে, তাই levallorphan অধিকতর নিরাপদ এবং কার্য্যকরী। এর সংগে আনুষংগিক উপসর্গের চিকিৎসাও বিধিমত করতে হবে।

অন্যান্য ঘুমের ওষুধের বিষক্রিয়া :

সাধারণতঃ tranquilliser group-এর ওষুধ যেমন ক্লোরপ্রোমাজিন, প্রোমেথাজিন, ট্রাইফ্লুওপ্রোমাজিন, ডায়াজিপাম এবং ক্লোরডায়াজিপক্সাইড ইত্যাদি ওষুধের অপপ্রয়োগে এবং বেশী পরিমাণে খেলে বা ইঞ্জেকশন নিলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

এই সব বিষক্রিয়ায় রোগী অঘোরে ঘুমায়, পরে সংজ্ঞালোপ পেতে পারে। রোগীর রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যায়। নাড়ীর গতি দ্রুত হয় এবং রোগীর shock হয়। মাংসপেশীসমূহ শিথিল হয়ে পড়ে। Phenothiazine group-এর ওষুধে রোগীর দেহের তাপমাত্রা অত্যন্ত কমে যেতে পারে। মাংসপেশীর twitching, extrapyramidal signs এবং agranulocytosis হতে পারে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসও শ্লথ হয়ে পড়ে।

রোগী এই সব ওষুধ মুখ দিয়ে খেলে নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ভালভাবে gastric lavage দিতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাস যদি ঠিকমত পর্য্যাপ্ত না নেয় তবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য্য চালাতে হবে। শিরাপথে fluid দেওয়া একান্ত দরকার। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধ এবং steroid দেওয়া যেতে পারে। Diuretics যেমন frusemide দিয়ে বেশী প্রস্রাব করালে ভাল হয়, কেননা এতে শরীর থেকে ওষুধ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই সবের সংগে আনুষংগিক উপসর্গের জন্য supportive treatment করতে হবে।

কারবন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া ঃ

Coal gas থেকে, অটোমোবাইল ইঞ্জিনের exhaust fume থেকে অথবা ঘরে আগুন লাগা অবস্থায় বন্দী হয়ে পড়লে এই বিষক্রিয়া হতে পারে। এই বিষক্রিয়ার ফলে লোহিত রক্তকনিকার হিমোগ্লোবিন কারবন-মনোক্সাইডের সংগে মিশে carboxy haemoglobin হয়, ফলে হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে অক্সিজেন ঠিকমত বাহিত হতে পারে না। রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এই সব রোগীকে ১০০% অক্সিজেন দিতে হবে। দরকার হলে endotracheal intubation করে Boyle অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিনের সাহায্যে পজিটিভ প্রেশারে কৃত্রিম শ্বাসকার্য্য চালানো দরকার।

Hyperbaric অক্সিজেন এই সব রোগীর ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রদ। কেননা এই পদ্ধতিতে প্লাজমায় দ্রবীভূত বেশী অক্সিজেন বাহিত হয়ে অক্সিজেনের অভাব খানিকটা মেটায়। আবার এত প্রেশারের অক্সিজেন লোহিত রক্তকণিকা থেকে কারবন মনোক্সাইড বের করে দিতেও সাহায্য করে।

এই বিষক্রিয়ায় রোগীর acidosis হয়। Metabolic acidosis-র জন্য সোডিয়াম বাইকার্বোনেট শিরাপথে দিতে হবে। আর respiratory

acidosis ভালভাবে শ্বাসকার্য্য চালালেই ঠিক হয়ে যায়। উপরন্তু জরুরী জীবনরক্ষাকারী আনুষংগিক চিকিৎসা (snpportive treatment) চালিয়ে যেতে হবে।

Acute myocardial infarction :

Myocardial infarctionএ আক্রান্ত রোগীর acute stage-এর যে কোন সময়ে হঠাৎ cardiac arrest হতে পারে। সুতরাং এই সব রোগীর ইনেটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি ক'রে খুব ভাল ভাবে পর্য্যবেক্ষণে রাখা উচিত। এদের সব সময় হৃৎস্পন্দন, নাড়ীর গতিপ্রকৃতি, রক্তচাপ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর রাখা উচিত। এদের যে কোন সময়ে dysrhythmia হতে পারে। এদের cardiac এবং respiratory resuscitation করার জন্য সব সময়েই তৈরী থাকতে হবে। এই সব রোগীর electrocardiogram, arterial blood pressure, central venous pressure এবং blood gas analysis এর monitoring-এর দরকার। এদের defibrillation, cardiac pacing এবং কৃত্রিম শ্বাসকার্য করার জন্য যন্ত্রপাতি হাতের কাছে তৈরী রাখতে হবে।

এই সব রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম একান্ত দরকার। ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে আলাদা ছোট ঘরে এদের রাখলে ভাল হয়। রোগী আধশোয়া অবস্থায় থাকলেই ভাল থাকে, কেননা একেবারে শুয়ে থাকলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।

অসহ্য বুকের ব্যথার জন্য রোগীকে মরফিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। রোগী খুব shock-এ থাকলে তা শিরাপথেও দেওয়া যেতে পারে। রোগীকে ঠিকমত অক্সিজেন দেওয়া দরকার। রক্তচাপ কম হয়ে গেলে তা বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধও দিতে হয়। শিরাপথে infusionও দিতে হবে। Corticosteroid দিলে এই shockএ বেশ উপকার পাওয়া যায়।

Cardiac arrhythmia থাকলে তার জন্য নানাধরণের ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে যেমন propanolol, শিরাপথে lignocaine, procainamide, quinidine ইত্যাদি। Heart failure থাকলে digitalis দেওয়া যেতে পারে।

রোগীর শরীর যাতে বেশী fluid retention না হয় তার জন্য diuretics

দেওয়া হয়। Frusemide বা শিরাপথে mannitol এসব ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রদ। Metabolic acidosis থাকলে শিরাপথে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

রোগী যাতে প্রচুর ঘুমুতে পারে তার জন্য পেথিডিন এবং প্রোমেথাজিন দেওয়া যেতে পারে। রোগীর যাতে কোন রকমের ভয় ভাবনা, tension না হয় তাও দেখতে হবে।

Acute rcnal failure :

এই সব রোগীও ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসা করা হয়। Acute renal failure নানা কারণে হতে পারে। Prerenal কারণগুলির মধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, অত্যধিক shock, dehydration, heart failure ইত্যাদি অন্যতম। Renal বা কিডনি সংক্রান্ত কারণগুলির অন্যতম acute tubular necrosis, acute glomerulonephritis এবং নানাধরণের ওষুধের বিষক্রিয়া যেমন ক্লোরোফর্ম, কারবণ টেট্রাক্লোরাইড ইত্যাদি। লিভারের গুরুতর অসুখে কিডনীর কাজও ব্যাহত হয় (hepatorenal syndrome)। এই সব রোগীর আগেই post-renal obstruction আছে কি না তা যথাযথ নির্ণয় করা দরকার।

Anuria বা প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। Prerenal কারণগুলি মোটামুটি সহজেই বোঝা যায় এবং এদের চিকিৎসাপদ্ধতিও বেশ সহজ। কিন্তু acute tubular necrosis হলে তা যথেষ্ট চিন্তার কারণ এবং তার চিকিৎসাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

এই সব রোগীকে কতটা fluid খেতে বা শিরাপথে দেওয়া হবে তা বিশেষভাবে দেখতে হবে। সারাদিন কতটা fluid শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে—প্রস্রাব, পায়খানা বা বমিতে, তার ঠিকমত হিসাব রাখতে হবে। Fluid loss-এর পরিমাণের সংগে ৪০০ মি. লি. fluid প্রত্যহ রোগীকে দেওয়া হয়। Intake এবং output chart রাখতে হবে। এই সব রোগীকে কখনোই অধিক জলীয় পদার্থ দেওয়া উচিত নয়।

দৈনিক সোডিয়ামের পরিমাণ ১ গ্রামের অধিক হওয়া উচিত নয়। শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ-বেশী হলে শরীরের জলের ভাগও বেড়ে যায়। হাত পা

ফুলে যেতে পারে। রক্তচাপ বাড়তে পারে এবং pulmonary oedema হতে পারে।

এই সব রোগীর শরীরে পটাশিয়াম অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং তা খুবই ক্ষতিকারক। সুতরাং রক্তের পটাশিয়াম নির্ণয় প্রত্যহই করা উচিত। এদের পটাশিয়াম বা পটাশিয়ামযুক্ত খাবার বা পানীয় মোটেই দেওয়া উচিত নয়। Hyperkalaemia চিকিৎসার জন্য গ্লুকোজ এবং ইনসুলিন বা ion exchange resin দেওয়া যেতে পারে। দরকার হলে dialysisও করতে হতে পারে।

রোগীর খাদ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পর্য্যাপ্ত পরিমানে শর্করা এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য দেওয়া উচিত। আমিষজাতীয় খাদ্য কখনোই দৈনিক ২০ গ্রামের বেশী হওয়া উচিত নয়। Anabolic steroid এই রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত দেওয়া যেতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ সব সময়েই দেওয়া বিধেয়, যাতে কোন বীজাণু সংক্রমন না হয়। Metabolic acidosis-এর জন্য শিরাপথে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দেওয়া হয়। Dialysis বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। দুইভাবে dialysis করা যায়।

১। Haemodialysis ঃ এতে রোগীর রক্ত শরীরের বাইরে এনে কৃত্রিম কিডনি যন্ত্রের সাহায্যে শোধন করা হয়। তারপর শোধিতরক্ত আবার শরীরে সঞ্চালন করা হয়। বিশেষ যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন ছাড়া haemodialysis করা যায় না।

২। Peritoneal dialysis : এটি অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি। একটি বিশেষ ধরণের solution রোগীর পেটে peritoneal cavity-র মধ্যে ক্যাথেটারের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয়। এই dialysis fluid-এ নির্ধারিত পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ল্যাকটেট এবং গ্লুকোজ থাকে। অবশ্য গ্লুকোজের পরিমান প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করা হয়। পটাশিয়াম সাধারণতঃ থাকে না তবে দরকার হলে দেওয়া যেতে পারে। রক্তের দূষিত পদার্থ এই solution শুষে নেয় এবং পরে এই দূষিত solution বাইরে বের করে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না plasma electrolyte এবং রক্তের urea স্বাভাবিক হয় ততক্ষণ এই dialysis চালাতে হয়। তবে এই পদ্ধতি haemodialysis-এর মত ভাল কার্যকরী নয়।

মৃগীরোগীর অবিরাম খিঁচুনী ; (Status epilepticus) :

এটি সাধারণতঃ epilepsy রোগের উপসর্গ হিসাবে হয়। তবে head injury-র পরেও এ অসুখ হতে পারে। এতে খুব ঘন ঘন রোগীর খিঁচুনী বা fit হয় এবং দুইটি fit-এর মধ্যে রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে না। ফলে রোগী একেবারে অচৈতন্য থাকে, অত্যধিক খিঁচুনী হয়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয়। রোগী কাহিল হয়ে পড়ে। নাড়ী খুব দ্রুত হয়, রক্তচাপও খুব কমে যেতে পারে। এই অবস্থায় রোগীকে ঠিক সময়ে এবং ঠিকভাবে চিকিৎসা না করলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাতে পারে। এদের যথাসম্ভব সত্বর হাসপাতালের ইনটেনশিভ-কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করে চিকিৎসা করা বিধেয়।

অবিলম্বে খিঁচুনী এবং fit বন্ধ করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। এই সব ওষুধের মধ্যে প্যারালডিহাইড, ডায়াজিপাম এবং লিগনোকেন শিরাপথে দিলে সুফল পাওয়া যায়। Phenytoin sodium ১০০ থেকে ২০০ মি. গ্রা. শিরাপথে দিলে খিঁচুনী বন্ধ হতে পারে। প্রয়োজনবোধে গ্যালামিন, টিউবোকিউর‍্যারিন বা প্যানকিউরোনিয়ামের মত muscle relaxant শিরাপথে দেওয়া হয়। ফলে দেহের মাংসপেশী সমূহ একেবারে শিথিল হয়ে হড়ে। তার পর endotracheal intubation করে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে পজিটিভ প্রেশারে শ্বাসকার্য চালানো উচিত।

ঘন ঘন fit হওয়ায় রোগীর দেহের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়। সুতরাং তাপমাত্রা স্বাভাবিক করার জন্য সবরকমের চেষ্টা করতে হবে। রোগীর অজ্ঞান অবস্থায় থাকার জন্য যে কোন সময়ে বমি বা অন্য জিনিষ শ্বাসনালীতে চলে যেতে পারে সুতরাং সে দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। Antiepileptic ওষুধ অনেক পরিমানে দেওয়ার জন্যও রোগী অচৈতন্য হয়ে থাকতে পারে।

এছাড়াও রোগীকে শিরাপথে infusion দিতে হবে। এ রোগের অন্য উপসর্গ হিসাবে pulmonary oedema বা cerebral oedema হতে পারে সুতরাং সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। Supportive treatment সব সময়েই দিয়ে যেতে হবে।

হাঁপানি রোগের অবিরাম শ্বাসটান (Status Asthmaticus) :

হাঁপানির শ্বাসকষ্ট ঘন ঘন এবং বিরামবিহীন হতে থাকলে তাকে status asthmaticus বলে। এতে ফুসফুসের ছোট ছোট bronchiolesগুলিতে

দীর্ঘস্থায়ী সংকোচন (spasm) হয় এবং সাধারণ চিকিৎসায় এই সংকোচন নিরাময় হয় না। রোগীর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়, শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে, দেহে কারবন ডাই-অক্সাইড অত্যন্ত বেড়ে যায়, cyanosis হয়, respiratory এবং metabolic acidosis হয় এবং অবশেষে cardiovascular এবং respiratory failure হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। এই সব রোগীর অত্যন্ত জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন।

হাঁপানির শ্বাসকষ্ট কমানোর জন্য দ্রুত কার্যকর bronchodilator ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। এই সব ওষুধের মধ্যে কয়েকটির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Aminophylline শিরাপথে দিলে ভালো কাজ হয়। Isoprenaline sulphate ২০ মি. গ্রা. জিভের তলায় দিতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে এর aerosol spray শ্বাসের সংগে দিলে অত্যন্ত কার্যকরী হয়। এডরেনালিন ০'৫ থেকে ১ মি.লি. (১ : ১০০০) ত্বকের নীচে ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়। তবে এটি বার বার দেওয়া উচিত নয়। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও এটি সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। এই সব রোগীর বেশীর ভাগকেই salbutamol এবং corticosteroid দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

এই সব রোগীর অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে চিকিৎসা করা খুবই দরকারী। ঠিকমত অক্সিজেন দেওয়া উচিত। রোগীর যেন কখনও অক্সিজেনের অভাব না ঘটে—কখনও যেন cyanosis না হয়। দরকার হলে ১০০% অক্সিজেন দিতে হবে। রোগী খুব কাহিল হয়ে পড়লে অথবা শরীরে কারবন ডাই-অক্সাইডের উত্তরোত্তর আধিক্য ঘটলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্যের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রোপানিডিড এবং সাক্সামেথোনিয়াম দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া দিয়ে endotracheal intubation ক'রে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালাতে হবে। অল্প ইথার বা হ্যালোথেন দেওয়া যেতে পারে, কেননা এগুলি সাধারণভাবে শ্বাস-নালীর প্রসারন ঘটায়। টিউবোকিউর‍্যারিন না দেওয়াই ভালো কেননা এটি সংকোচন ঘটাতে পারে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের গ্যাস ভালোভাবে আর্দ্র (humidification) করানো দরকার।

রোগীর যাতে dehydration না হয় তার জন্য শিরাপথে infusion দেওয়া হয়। বীজাণু সংক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। Metabolic acidosis-এর জন্য শিরাপথে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দেওয়া হয়। রোগীর রক্তচাপ কমে গেলে vasopressor ওষুধও দেওয়া হয়। এই সব রোগীর sedationও অত্যন্ত জরুরী। তবে এদের ক্ষেত্রে মরফিন দেওয়া উচিত নয়।

ক্লেরোল হাইড্রেট প্রোমেথাজিন বা ডাইফেন—হাইড্রামিন দেওয়া যেতে পারে।

টিটেনাস (Tetanus) ঃ

এটি clostridium tetani দ্বারা আক্রান্ত মূলত: central nervous system-এর অসুখ। এই অসুখে রোগীর চোয়াল বন্ধ হয়ে যায়—মুখ খুলতে পারে না। রোগীর কষ্ট হয়। শরীরের মাংসপেশীতে টান ধরে। ভালোভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে না—খিঁচুনি হয়। এই অসুখে আরও নানা রকমের উপসর্গ দেখা দিতে পারে—যেমন শরীরে অত্যধিক তাপবৃদ্ধি ঘটতে পারে, হৃৎপিণ্ড ভালোভাবে কাজ করতে পারে না, paralytic ileus, bulbar palsy এবং facial palsy'ও হতে পারে। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক লোকেরই আগে থেকে tetanus toxoid ইঞ্জেকশন নিয়ে রাখা উচিত। যে কোন কারণে কেটে ছিঁড়ে গেলে, দুর্ঘটনায় আঘাত পেলে ঐ জায়গা ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত, দরকার হলে শল্যচিকিৎসকের পরামর্শও নিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ—যেমন পেনিসিলিন, tetracycline; erythromycin ইত্যাদি এসময়ে অত্যন্ত দরকারী। রোগী immunised হলেও এসময়ে আবার tetanus toxoid দেওয়া উচিত। Antitetanus toxin ও অনেক সময় দেওয়া হয়।

এসব রোগীর চিকিৎসা অত্যন্ত সতর্কতার সংগে করা দরকার। একটি অন্ধকার নিরিবিলি ঘরে রোগীকে রাখা হয়। ভালো nursing care এক্ষেত্রে বিশেষ দরকার। রোগীকে ভালোভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। ক্লোরপ্রোমাজিন, প্রোমেথাজিন, ডায়াজিপাম, ক্লোরডায়াজিপক্সাইড, মেপ্রোবামেট ইত্যাদি ওষুধ এসব ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। রোগীকে কোনমতেই উত্তেজিত করা উচিত নয়। রোগীর খাদ্য এবং পুষ্টির দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। দরকার হলে টিউব দিয়ে অথবা শিরাপথে খাবার বা feeding দেওয়া উচিত।

রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস যদি পর্যাপ্ত না থাকে, যদি খিঁচুনি থাকে তবে রোগীকে curarise ক'রে endotracheal intubation করে কৃত্রিম শ্বাসকার্য বা পজিটিভ প্রেশার ventilation দিতে হবে। খিঁচুনি কমানোর জন্য বারবিচুরেট, ডায়াজিপাম, প্যারালডিহাইড ইত্যাদি ওষুধ বিশেষ কার্যকরী।

হঠাৎ রোগীর দেহের তাপমাত্রা বাড়তে পারে, তার চিকিৎসা বিধিমত করতে হবে। Cardiac dysrhythmia হতে পারে। দরকার হলে propranolol দিতে হতে পারে।

তাছাড়াও আনুষংগিক উপসর্গের জন্য supportive treatment করতে হবে।

গর্ভকালীন রক্তদুষ্টি (Toxaemia Pregnancy) :

গর্ভাবস্থায় এই সব রোগীর রক্তচাপ অত্যন্ত বেশী থাকে, হাত পা ফোলে, প্রস্রাবের সংগে এলবুমিন (albumin) অত্যধিক বেরিয়ে যায়। এই রোগে মাংসপেশীতে টান ধরে এবং খিঁচুনিও হতে পারে। এদের লিভার এবং কিডনির কার্যক্ষমতাও কমে যায়। গর্ভস্থ শিশুর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। হঠাৎ premature separation of placenta হতে পারে। রোগীর heart failure, pulmonary oedema অথবা cerebral haemorrhageএ মৃত্যু ঘটতে পারে।

এই সব রোগীকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত ভালো পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। রোগ যাতে প্রথম দিকে ধরা পড়ে এবং তার যথাযথ চিকিৎসা হয় সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বার বার antenatal care দরকার।

রোগীকে ভালো আলোবাতাসযুক্ত নিরিবিলি ঘরে রাখা উচিত। রোগীর যাতে কোন মানসিক অশান্তি না ঘটে, কোন রকমের ভয়-ভাবনা না থাকে তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। দরকার মত ডায়াজিপাম, ক্লোরডায়াজিপক্সাইড, প্রোমেথাজিন ইত্যাদি ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু এই সব রোগী বেশী রক্তচাপে ভোগে সেহেতু এদের রক্তচাপ কমানোর জন্য reserpine বা hydrallazine hydrochloride দেওয়া যেতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি রক্তচাপ কমানোর জন্য trimetaphan শিরাপথে দেওয়া হয়।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত induction of labour, forceps delivery অথবা Caesarean section-এর কথা চিন্তা করতে হবে, কেননা প্রসবের পর বেশীর ভাগ রোগী আরোগ্যলাভ করে। তবে fit বা খিঁচুনি প্রসবের পরও হতে পারে। খিঁচুনি বা রক্তচাপ কমানোর জন্য continuous lumbar epidural block বেশ ভালো কার্যকরী পন্থা।

খিঁচুনি বন্ধের জন্য ডায়াজিপাম শিরাপথে দেওয়া যায়। দরকার হলে muscle relaxant দিয়ে endotracheal intubation ক'রে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-কার্য চালানো যেতে পারে।

এর সংগে রোগীর অন্যান্য উপসর্গের বিধিমত চিকিৎসা করা হয়। রোগীর

শ্বাসপ্রশ্বাসের যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে। দরকার হলে অক্সিজেন দিতে হবে। রোগীর দেহের তাপমাত্রা এবং nutrition বা পুষ্টির দিকেও নজর রাখতে হবে।

Poliomyelitis (পোলিওমাইলাইটিস) :

পোলিওমাইলাইটিস কয়েক ধরনের হতে পারে। Spinal পোলিওমাইলাইটিসে respiratory paralysis হতে পারে, তবে upper respiratory tract-এ secretion খুব একটা বেশী হয় না। এই সব রোগীকে কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানোর দরকার হতে পারে। Bulbar পোলিওমাইলাইটিসে আক্রান্ত রোগীরা শ্বাস নিতে পারে বটে, তবে এদেরও সময় বিশেষে respiratory assistance-এর দরকার হয়। এদের upper respiratory tract-এ secretion খুব বেশী হয়। সুতরাং এদের উপুড় করে রাখলে ভালো হয়। বারবার suction করে শ্বাসনালী বাধামুক্ত রাখতে হয়।

Bulbospinal পোলিওমাইলাইটিসে আক্রান্ত রোগীর ভয় সব থেকে বেশী। রোগী ঢোক গিলতে পারে না, কথা বলতে কষ্ট হয়, বমি বা অন্য secretion, saliva শ্বাসনালীতে যে কোনো সময়ে চলে যেতে পারে। Aspiration হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। মুখের এবং গলার মাংসপেশীতে বেশ শিথিলতা হয়। এইসব রোগীকেও উপুড় করে শুইয়ে রাখতে হয়। ভালোভাবে বারবার মুখ পরিষ্কার করতে হয়। Tracheostomy করা এবং একটি cuffed টিউব পরানো একান্ত দরকার। অনেক সময় কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালাতে হয়। অবশ্য tracheostomy না করেই cuffed endotracheal টিউব পরিয়েও কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানো যেতে পারে।

এদের পুষ্টির দিকে বিশেষ নজর রাখা এবং তা বজায় রাখা একান্ত কর্তব্য। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধও দেওয়া হয়। আনুষংগিক উপসর্গের চিকিৎসা এবং supportive treatment দেওয়া হয়। এদের ভালো nursing care এবং physiotherapy অত্যন্ত জরুরী।

Polyneuritis (পলিনিউরাইটিস) :

এটিকে Guillian Barre syndromeও বলা হয়। এই অসুখেও রোগীর মাংসপেশীর শিথিলতা (muscular paralysis) হয়। রোগী আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে। ভালোভাবে খেতে পারে না—ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। Muscles of deglutition আক্রান্ত হয় বেশী। রোগীর মুখ দিয়ে অতিরিক্ত

লালা পড়তে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের মাংসপেশীসমূহ অপেক্ষাকৃত কম আক্রান্ত হলেও রোগীর যে কোন সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত (insufficiency) হতে পারে। তখন কৃত্রিম ভাবে শ্বাসকার্য চালানোর ব্যবস্থা করতে হয়। এদের শ্বাসনালীতে aspiration হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, তাই অনেক সময় tracheostomy করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এবং steroid দিয়ে চিকিৎসা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জলে ডোবা (Drowning) ঃ

জলে ডুবে মৃত্যু আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়। দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা আত্মহত্যার জন্যও জলে ডুবে মৃত্যু হয়। জলে ডুবিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার ঘটনাও কম নয়। সাধারণভাবে মানুষের মুখ আর নাক জলের মধ্যে ২ থেকে ৫ মিনিট ডুবে থাকলেই তার মৃত্যু ঘটে। অবশ্য সাধারণ জলে ৪ মিনিট আর লবণাক্ত জলে—সমুদ্রের জলে ৮ মিনিট ডুবে থাকলেই মৃত্যু অনিবার্য। জলে ডুবলেই যে মৃত্যু ঘটবে তার কোন কারণ নেই এবং তা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর—যেমন সে ব্যক্তি সাঁতার জানে কি না, তার শারীরিক ক্ষমতা সে সময় কেমন ছিল, শরীরে পোশাক কী ধরনের ছিল ইত্যাদি। জলের তাপমাত্রা, buoyancy, এবং জলের প্রকৃতির (লবণাক্ত বা সাধারণ) উপরও অনেকটা নির্ভর করে।

জলে ডুবে গেলে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ মুখ এবং শ্বাস বন্ধ করে রাখে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখে জল ঢুকে যায় এবং রোগী অনেক পরিমাণে জল খেয়ে ফেলে। এসময় বমি হতে পারে এবং তা শ্বাসনালীতে চলে যেতেও পারে। শেষে শ্বাসনালী দিয়েও ফুসফুসে জল যেতে থাকে। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীর ফুসফুসে জল না যেতেও পারে। তার কারণ হিসাবে বলা হয় যে শ্বাসনালীতে জল ঢোকার সংগে সংগেই তা সংকুচিত (laryngospasm) হয়ে পড়ে এবং এই সংকোচন রোগীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থাকে। ফলে, তাড়াতাড়ি উদ্ধারপ্রাপ্ত রোগীর ফুসফুস বেশ ভালো থাকে এবং এদের আশু চিকিৎসায় বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়।

রোগী যদি লোনা জলে—যেমন সমুদ্রে ডুবে যায়, তাহলে তার মৃত্যুর কারণ সাধারণতঃ pulmonary oedema, hypovolaemia এবং circulatory failure। আর সাধারণ জলে ডোবা রোগীর মৃত্যুর কারণ বেশীর ভাগই ventricular fibrillation। এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে জল ফুসফুস থেকে রক্ত

প্রবাহে চলে আসে, তাই এদের haemodilution এবং haemolysis হয়। তবে সব ক্ষেত্রেই রোগীর দেহে অক্সিজেনের অভাব ঘটে, দেহে কারবন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায় এবং acidosis হয়। ঠাণ্ডা জলে থাকার জন্য দেহের তাপ অস্বাভাবিক হ্রাস পেতে পারে—hypothermia হয়। এদের রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যায়, রোগীর shock হয়।

জলে ডোবা রোগীর চিকিৎসা খুবই দ্রুত হওয়া দরকার। এমন কি জল থেকে তোলার সময়েই তা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে নজর দিতে হবে, এর সংগে হৃৎপিণ্ডের কাজ স্বাভাবিক করতে হবে। দেহের acid base-এর সমতা রক্ষা করতে হবে। শরীরের অস্বাভাবিক তাপহ্রাসের জন্য রোগীর তাপমাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রথমেই রোগীর মুখ এবং শ্বাসনালী পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাতে হবে। হাতের কাছে কিছু না থাকলে mouth to mouth ventilation করা দরকার। Ambu bag বা pulmoflator থাকলে সুবিধা হয়। হাসপাতালে endotracheal টিউব পরিয়ে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে পজিটিভ প্রেশারে কৃত্রিম শ্বাসকার্য করা হয়।

পেটের উপরিভাগ epigastrium-এ সজোরে চাপ দিলে অনেক সময় মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে যেতে পারে। Ryle's টিউব পরিয়ে পাকস্থলী থেকে জল টেনে বের করে আনা যেতে পারে।

রোগীর নাড়ী যদি না পাওয়া যায় বা হৃৎস্পন্দন যদি বন্ধ হয়ে যায়, external cardiac massage তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করতে হবে। এর সংগে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজও চালিয়ে যেতে হবে।

শরীরের অস্বাভাবিক তাপহ্রাসের জন্য রোগীকে কাপড়, কম্বল ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। দরকার মত গরম জলের ব্যাগও দেওয়া যেতে পারে। Slow controlled warming করা দরকার। শরীরে অম্লতা থাকলে শিরাপথে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দিতে হবে।

রোগীর বুকের একটি x'ray করা অত্যন্ত দরকার। এতে ফুসফুসের অবস্থা ভালোভাবে বোঝা যায়। Pulmonary oedema থাকলে তার চিকিৎসা করা দরকার। Tracheobronchial toilet করতে হবে বার বার suction ক'রে। Frusemide বা mannitol দিয়ে অত্যধিক প্রস্রাব করালে শরীরে জলের ভাগ এবং তার সংগে ফুসফুসের জলও কমে যাবে। ১০০% অক্সিজেন দিয়ে পজিটিভ

প্রেশারে শ্বাসকার্য এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এবং বেশী পরিমাণে steroid দিলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।

সর্পদংশন (Snake Poisoning) :

সর্পদংশন এবং তার ফলে মৃত্যু আমাদের দেশে খুবই বেশী। সাপ সাধারণতঃ দু রকমের হয়—প্রথমটি বিষহীন আর দ্বিতীয়টি বিষধর। বিষধর সাপ মোটামুটি দু জাতের হয়—তার একটি colubridae বা কেউটে জাতীয় আর অপরটি viperidae বা বোড়াজাতীয়। সাধারণভাবে ১৫ থেকে ২০ মিলিগ্রাম কেউটে জাতীয় সাপের শুকনো বিষে এবং ৪০ মিলিগ্রাম বোড়া জাতীয় সাপের বিষে মানুষের মৃত্যু ঘটে। একটি কেউটে সাপ একটি মাত্র ছোবলে ২০০ থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম এবং একটি বোড়া সাপ ১৫০ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম তরলবিষ বের করে।

সাপের বিষের বিষক্রিয়া তার কয়েকটি উপাদানের জন্য দায়ী। এতে থাকে নানা রকমের proteolytic enzyme, phosphatidase এবং neurotoxin। বোড়া জাতীয় (viperine) বিষে proteolytic enzyme, haemolysin, thromboplastin ইত্যাদি বেশী থাকে। Histamine, acetylcholine এবং 5-hydroxytryptamine জাতীয় পদার্থ বেশী শরীরে বের হয়। এ সবের ফলে রক্তকণিকাগুলি ভাঙতে সুরু করে। রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা থাকে না। হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ এবং রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। কেউটে জাতীয় সাপের বিষে বেশী থাকে neurotoxin, agglutinin, cholinesterase ইত্যাদি। এগুলি স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ ক্ষতি করে। মাংসপেশীতে কিউর‍্যারির মত effect হয়—paresisও হয়। এই colubrine বিষে মানুষ শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার জন্যই মারা যায়। এদের হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে পড়ে। Viperine বিষে অত্যধিক haemolysis হওয়ার দরুন এবং রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা না থাকার জন্য অত্যধিক রক্তক্ষরণ হয়। এরা cardiac failure-এ মারা যায়।

সাপের বিষ শরীরের চামড়া ভেদ করে গেলে তবেই বিষক্রিয়া হয়, মাংসপেশীর মধ্যে বা রক্তের প্রবাহে গেলেও বিষক্রিয়া হবে। তবে মুখ দিয়ে খেলে তেমন বিষক্রিয়া না হতেও পারে। বিষাক্ত সর্পদংশনে আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ খেলে বাচ্চাও বিষক্রিয়ায় ভুগতে পারে। সাপের বিষ সাধারণতঃ প্রস্রাবের সংগে, বুকের দুধের সংগে এবং পাকস্থলীর গ্রন্থি দিয়ে মানুষের শরীর থেকে বের হয়ে যায়। সাপের বিষে জর্জরিত লোকের রক্তও কিন্তু খুব বিষাক্ত হয়ে পড়ে।

বিষহীন সাপের লালাতেও কিন্তু অনেক সময় এমন জিনিস থাকে তা থেকে শরীরের ক্ষতি করতে পারে। এদের কামড়ে সাধারণতঃ মৃত্যু হয় না তবে ক্ষতস্থান অন্যভাবে দূষিত হয়ে পড়লে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

সাপ কামড়ালেই যে মৃত্যু হবে এমন কোন কারণ নেই। বেশীর ভাগ সাপেরই বিষ নেই সুতরাং সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিষক্রিয়া করে না। বিষাক্ত সাপ কামড়ালেও সব সময় পুরো বিষ ঢেলে দিতে পারে না। অনেক সময় কাপড়চোপড়ে বিষ পড়ার দরুন শরীরে বেশী যেতে পারে না। আর পুরো বিষ ঢেলে দিলেও সেটি হয়তো মৃত্যু ঘটানোর মত পর্যাপ্ত নাও হতে পারে।

সাধারণতঃ মানুষ পায়ে বা হাতেই সাপের কামড় খায়। কামড়াবার ১০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টার মধ্যেই বিষক্রিয়া শুরু হয়। যেখানে কেউটে জাতীয় সাপের বিষক্রিয়া শুরু হতে এক ঘণ্টা লাগে, সেখানে বোড়া জাতীয় সাপের বিষক্রিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যেই দেখা যায়। অবশ্য অনেকে সাপে কামড়ালেই এমন কি বিষহীন সাপ হলেও অত্যধিক ভয় পেয়ে যায়—প্রচণ্ড মৃত্যুভয়ে রোগী নিঃসাড় হয়ে পড়ে। বিষক্রিয়ার প্রথম দিকে বমি বমি ভাব, বমি, ক্ষতস্থানে ব্যথা, ফোলা, লাল হয়ে ওঠা ইত্যাদি হতে পারে। রোগীর নাড়ীর গতি বেড়ে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও বেড়ে যায়, রক্তচাপ কমে আসতে থাকে—রোগীর shock হয়। এগুলি যে কোন সাপের বিষক্রিয়াতেই হতে পারে।

কেউটে জাতীয় সাপ কামড়ালে বিষদাঁতের দাগ ভালোভাবে দেখা যায় না—ব্যথা বা ফোলা কম হয়। কিন্তু বোড়া জাতীয় সাপের ক্ষেত্রে এগুলি খুব বেশী হয় এবং বিষদাঁতের দাগ ভালই দেখা যায়। ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

কেউটে জাতীয় সাপের বিষক্রিয়ায় মাংসপেশীর দুর্বলতা (muscular paresis) ঘটে, হাতে পায়ে জোর কমে যায়, কথা এড়িয়ে পড়ে, চোখ বুজে আসে (ptosis), চলন টলমলে হয়ে পড়ে। মাংসপেশীর শিথিলতা (paralysis) হয়। পরে রোগী ঢোঁক গিলতে পারে না, জিভ যেন ফুলে ওঠে, মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে আসতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হয়, cyanosis হয়, অচৈতন্য হয়ে পড়ে, খিঁচুনি (convulsion) হতে পারে। Respiratory failure-এ রোগীর মৃত্যু ঘটে।

Viperine (বোড়া জাতীয়) সাপের বিষক্রিয়ায় রক্তক্ষরণ জনিত উপসর্গই বেশী দেখা যায়। শরীরের অনেকস্থান থেকেই রক্তক্ষরণ হয়—নাক থেকে, কাশির

সংগে, বমির সংগে, প্রস্রাবের সংগে, পায়খানার সংগে রক্তপাত হতে থাকে। রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা থাকে না (coagulation defect)। অবশেষে cardiac failure, circulatory failure এবং kidney failure-এ রোগী মারা পড়ে।

বিষক্রিয়া বেশী হলে আধঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে, তবে কম হলে মৃত্যু ঘটতে কয়েকদিন লাগতে পারে। সাধারণতঃ কেউটে সাপের বিষে মৃত্যু হয় তাড়াতাড়ি এবং বোড়া সাপের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটতে ২ থেকে ৪ দিন লাগতে পারে। অবশ্য রোগীর বাঁচা বা মরা নির্ভর করে কতটা বিষ শরীরে গেছে, ভালো চিকিৎসা হয়েছে কি না, কতক্ষণ পরে চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে বা antivenine দেওয়া হয়েছে কি না। এমন অনেক সময় হয়—সাপ খুব বিষাক্ত হলেও নিজে খাওয়ার পর যদি মানুষকে কামড়ায়—মানুষের বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম—কেননা কামড়াবার আগেই তার বিষ অনেক নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

চিকিৎসার সময় সব সর্পদংশনই বিষাক্ত সাপের দ্বারা হয়েছে, মনে করেই চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। সর্পদংশনের চিকিৎসা সংগে সংগেই শুরু করতে হবে। কোন সময় নষ্ট না করে একটি টুর্নিকেট বাঁধা অত্যাবশ্যক, যাতে বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে যেতে না পারে। সাধারণতঃ যেখানে একটি হাড় আছে সেখানে বাঁধন দেওয়া উচিত। প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ৩০ সেকেণ্ডের জন্য বাঁধন একটু আলগা করা উচিত—যাতে রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে। অনেকের মতে venous tourniquet দেওয়া যেতে পারে। সর্পদংশনের জায়গা থেকে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি উপরে বাঁধন দেওয়া হয়—যাতে বিষ venous blood দিয়ে শরীরে না ছড়িয়ে পড়ে।

সর্পদংশনের ক্ষতস্থান পটাশিয়াম পারমাংগানেট মিশ্রিত জল নতুবা সাধারণ জল দিয়েই ধুয়ে ফেলতে হবে। দুচারটি বড় incision দিয়ে সে জায়গা কেটে দিলে রক্তের সংগে বিষ বেরিয়ে যেতে পারে। অন্যভাবে যদি বিষ শুষে নেওয়া যায় তাহলে খুব ভালো হয়। মুখে বা ঠোঁটে যদি কাটাছেঁড়া না থাকে, মুখ দিয়েও শুষে নেওয়া যায়। তারপরে মুখ ভালোভাবে পটাশিয়াম পারমাংগানেট মিশ্রিত জলে ধুয়ে ফেলা অবশ্যকর্তব্য।

রোগীকে বেশী নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। হাত বা পা একটু immobilisa-tion করে রাখলে ভালো হয়। অ্যালকোহল জাতীয় ওষুধ মোটেই দেওয়া উচিত

নয়। Polyvalent antisnake venom serum যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে শিরাপথে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। এই polyvalent serum না পেলে antivenine serum দেওয়া যেতে পারে। এগুলি সাপের কামড়ের বিশিষ্ট (specific) ওষুধ এবং সময় মত দিলে বহুলোকের প্রাণরক্ষা হয়।

রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপের দিকে ভালোভাবে নজর রাখা উচিত। শিরাপথে infusion দিতে হবে। দরকার মত glucose solution, প্লাজমা বা রক্তও দিতে হতে পারে। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধ, steroid ইত্যাদি দিতে হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, টিটেনাস প্রতিষেধক দিতে হবে। রোগীর বেশী যন্ত্রণা হলে বা ছটফট করলে উপযুক্ত ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা উচিত।

Antihistaminic ওষুধ দিয়ে অনেক সময় উপকার হয়। রোগীর খাদ্য এবং পুষ্টির দিকেও নজর দেওয়া উচিত। শরীরের তাপমাত্রা কমে গেলে উপযুক্ত গরম কম্বলে বা গরম জলের বোতল দিয়ে তাপ স্বাভাবিক রাখতে হবে।

রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিপথ (airway) যাতে পরিষ্কার থাকে তার জন্য বারবার suction করা উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হলে অক্সিজেন দিতে হবে। অবেদনবিদ্যাবিশারদ বা anaesthetist-এর পরামর্শমত endotracheal টিউব পরিয়ে পজিটিভ প্রেশারে শ্বাসকার্য চালাতে হবে। কেউটে জাতীয় সাপের বিষে curare effect থাকার জন্য প্রয়োজনবোধে neostigmine ইঞ্জেকশন দিতে হতে পারে। বোড়া জাতীয় সাপের বিষে—যেখানে অত্যধিক রক্তকণিকা ভেঙে যায়—haemolysis হয়—সেক্ষেত্রে exchange transfusion করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

মস্তিষ্কে আঘাতজনিত সংকটজনক অবস্থা (Acute Head Injury) ঃ

মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীর অনেক সময়েই intensive care-এর দরকার হয়। এ অবস্থায় রোগী অচৈতন্য থাকে। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হতে থাকে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। রক্তচাপ কম থাকতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হতে পারে। রোগীর জিভ নীচের দিকে ঝুলে পড়লে, শ্বাসনালীতে অবরোধ সৃষ্টি করতে পারে। আবার বমি বা অন্য secretion শ্বাসনালীতে গিয়ে aspiration করতে পারে।

এই সব রোগীর অবস্থা ঠিকমত বিচার-বিবেচনা (assessment) করা দরকার। প্রথমতঃ level of consciousness—রোগীর জ্ঞান থাকতে পারে—

অচৈতন্য বা মাঝামাঝি অবস্থাতেও থাকতে পারে। রোগীর কোন মাংসপেশীর শিথিলতা (paralysis) আছে কি না এবং যদি থাকে একদিকে বা দুদিকে, হাতে বা পায়ে, তা দেখতে হবে। সম্পূর্ণ flaccid কি না দেখতে হবে। নাড়ীর গতিপ্রকৃতি, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ এবং দেহের তাপমাত্রা বারবার দেখতে হবে। রোগীর pupil কেমন, তা প্রসারিত বা সংকুচিত অথবা দুদিকে দু রকম কি না তাও দেখতে হবে। এ সবই একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত। কেননা পরে এগুলি বিশ্লেষণ করলে রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান পাওয়া যায়।

এই সব head injuryর রোগীকে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে চিকিৎসা করা উচিত। রোগীকে একটি ভালো শক্ত বিছানায় শোয়ানো দরকার। প্রথমেই রোগীর মুখের এবং শ্বাসনালীর secretion ভালোভাবে suction ক'রে পরিষ্কার করা হয়। দরকার হলে একটি pharyngeal airway টিউব দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাসের অপ্রতুলতায় একটি cuffed endotracheal টিউব পরিয়ে Boyle মেশিনের সাহায্যে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালানো দরকার।

যদি কোন ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হয় তা অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে, দরকার হলে শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। একটি শিরাপথে infusion দেওয়া দরকার। রক্তচাপ ঠিক রাখতে fluid বা vasopressor ওষুধও দিতে হবে। একটি Ryle's টিউব পাকস্থলীতে পরিয়ে রাখা হয়। একটি indwelling ক্যাথেটার মূত্রাশয়ে রাখা হয়। চোখে liquid paraffin দিয়ে রাখা ভালো।

মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিণ চাপ খুব বেশী হলে রোগী অচৈতন্য থাকে। প্রথম দিকে রক্তচাপ বাড়ে এবং নাড়ীর গতি একটু কমে যায়। এক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসও অত্যন্ত কমে যায়। এদের কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালানো বা respiratory assistance অত্যন্ত জরুরী।

Middle meningeal haemorrhage হলে অত্যন্ত জরুরী শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এতে রোগী গভীর অচৈতন্য হতে থাকে, pupil ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকে, নাড়ীর গতি হ্রাস হয়, যে দিকে আঘাত লাগে তার উল্টো দিকে হাত, পা এবং মুখে ক্রমশঃ মাংসপেশীর দুর্বলতা এবং শিথিলতা দেখা দেয়। মাথার x'ray করলে হাড় ভাঙা আছে কিনা বোঝা যেতে পারে।

Carotid angiogram করলে রোগ নির্ণয়ে স্থবিধে হয়। এই রোগীকে জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়ার light plane-এ রেখে সত্বর শল্য চিকিৎসা করা বিধেয়।

Head injury রোগীর যদি cervical spine-এ fracture dislocation থাকে তবে তাদের respiratory failure এবং quadriplegia হতে পারে। এই সব রোগীর respiratory assistance লাগে।

Head injury রোগীর অনেক সময় tracheostomy করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে tracheostomy-র আলাদা পরিচর্যা এবং বাতাস ঠিকমত আর্দ্র (humidification) করা—এসব দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

রোগীর cerebral oedema থাকলে frusemide বা mannitol দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। মুখ দিয়ে glycerol দিলেও উপকার পাওয়া যায়। বেশী পরিমাণে steroid দিলেও ভালো হয়।

এই সব রোগীর দেহের তাপমাত্রা অত্যধিক বাড়তে পারে (hyperpyrexia)। সেক্ষেত্রে ice cooling ক'রে তাপমাত্রা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে হবে। Electric cooling blanket থাকলে ভালো হয়। প্রোমাজিন বা ক্লোর-প্রোমাজিন এ ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে, কেননা এগুলি দিলে কাঁপুনি (shivering) হয় না এবং এরা vasodilatation ক'রে শরীরের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

এদের অনেক সময় epileptic fits বা খিঁচুনি হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে শিরাপথে ডায়াজিপাম দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। আনুষংগিক উপসর্গের জন্য supportive treatment করতে হবে। সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য broad spectrum অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দরকার। এদের পুষ্টি এবং খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হওয়া উচিত। Nasogastric টিউব দিয়ে খাবার (feeding) দেওয়া হয়, অনেক সময় শিরাপথে parenteral feedingও দেওয়া হয়। এদের fluid দেওয়ার intake output chart রাখা একান্ত দরকার।

Chest Injury (বুকে আঘাত) ঃ

দুর্ঘটনাজনিত এই chest injury-তে রোগীর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয় এবং তার ফলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব (hypoxia) ঘটে। হৃৎপিণ্ডের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে—cardiorespiratory embarrassment হয়। রোগীর বুকের খাঁচায় —পাঁজর ভেঙে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়—রোগী ভালোভাবে শ্বাস

নিতেও পারে না। রোগীর tracheobronchial tree-র secretionও ভালো-ভাবে কেশে বের করে দিতে পারে না এবং এই সমস্তই রোগীর ফুসফুসে জমতে থাকে।

এর সংগে রোগীর মাথায় এবং ঘাড়ে আঘাত (head injury এবং neck injury) থাকতে পারে। আবার abdominal injury—যেমন spleen বা liver ruptureও এই সংগে থাকতে পারে। সুতরাং রোগীর সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার। দরকার মত মাথার, বুকের এবং পেটের x'ray করা আবশ্যক।

রোগীর শ্বাসপথে বা pleural cavityতে রক্তপাত ঘটলে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়। আবার রক্ত, বমি বা অন্য secretion রোগীর শ্বাসের সংগে ফুসফুসে চলে যেতে পারে। রোগীর নাড়ীর গতি অতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ অত্যন্ত কমে যায়—রোগীর shock হয়। শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে—কারবন ডাই-অক্সাইড অত্যন্ত বেড়ে যায়, acidosis হয়। ঠিকসময়ে ঠিকমত চিকিৎসা না করলে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে।

রোগীর মুখ এবং শ্বাসনালী ভালোভাবে suction করে পরিষ্কার করে দিতে হবে। Pharyngeal airway টিউব দিতে হয়। রোগীর যদি অত্যধিক ব্যথাবেদনা হয়, যদি শ্বাসকষ্ট হয়, যদি রক্তের কারবন ডাই-অক্সাইড মাত্রা বাড়তে থাকে এবং যদি বুকের paradoxical movement হয় তবে কৃত্রিম-ভাবে শ্বাসকার্য চালানো দরকার। একটি cuffed endotracheal টিউব পরিয়ে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে পজিটিভ প্রেশারে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালাতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে tracheostomy করার দরকার হতে পারে। এতে রোগীর dead space কমে, রোগীর work of breathing খানিক কমে এবং aspiration হওয়ার আশংকা থাকে না।

শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী haemothorax থাকলে ভালোভাবে তা নিষ্কাশন করে দিতে হবে। Pneumothorax থাকলে একটি water seal drain দেওয়া অত্যাবশ্যক। Lung injury থাকলে তা সংস্কার সাধন করতে হবে। Flail chest হলে flail segmentকে স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় রেখে সুদৃঢ় করতে হবে। এসব ছাড়াও diaphragmatic rupture বা হৃৎপিণ্ড বা বড় বড় রক্তনালীর ক্ষতি হলে যথাযথ শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

রোগীর ব্যথা-বেদনা উপশমের জন্য ব্যথানাশক (analgesic) ওষুধ

দেওয়া যেতে পারে। Continuous thoracic epidural analgesia এই ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। এটি ব্যথার উপশম করায়, রোগীকে ভালোভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে সাহায্য করে এবং রোগী ভালোভাবে কাশতেও পারে। Intercostal blockও অনেক সময় ভালো কাজ দেয়।

এসব ছাড়াও অন্যান্য supportive treatment দেওয়া হয়। শিরাপথে infusion দেওয়া হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া হয়। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধ, steroid লাগতে পারে। প্রয়োজনে রক্তসঞ্চালন (blood transfusion) দিতে হবে। মোটের উপর গুরুতর chest injury হলে hypoxia এবং hypovolaemiaর চিকিৎসাই প্রধান এবং এটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

নবজাতকের পরিচর্যা (Resuscitation of Newborn)

মাতৃজঠরে যখন শিশু থাকে তখন তার অস্তিত্ব তার মায়ের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে—মায়ের ভালোমন্দ শিশুর ভালোমন্দের শরিক হয়। প্রসবের পরে যেইমাত্র শিশুর umbilical cord বাঁধা হয় এবং কেটে ফেলা হয় তখন সেই শিশু একটি পৃথক জীবন্ত সত্তায় পরিণত হয়। সম্পূর্ণ নূতন এক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শিশু অনেক সময়েই ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। এই সব নতুন অবস্থায় শিশুকে পর্যাপ্ত যত্ন এবং পরিচর্যা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

শিশু মাতৃজঠরে নিঃশ্বাস নেয় না এবং নেওয়ার দরকারও হয় না কিন্তু জন্মের পরই তাকে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হবে। কিন্তু কিছু অস্বাভাবিক কারণে শিশুর সেই শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হতে পারে ঃ

১। প্রসবের ঠিক আগে খুব বেশী পরিমাণে sedative এবং narcotic ওষুধ দিলে মায়ের সংগে গর্ভস্থ শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যায়।

২। যদি মাকে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয়ে থাকে, তবে খুব বেশী পরিমাণে অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের ফলে শিশুর ক্ষতি হয়।

৩। Premature separation of placenta হলে।

৪। শিশুর জন্মগত কোন রোগ—যেমন agenesis of lung, ইত্যাদি থাকলে, respiratory centre ভালোভাবে develop না করলে।

৫। অনেকক্ষণ ধরে প্রসব করার ফলে।

৬। মায়ের যদি প্রসবের আগে বিপজ্জনকভাবে রক্তচাপ হ্রাস হয়।

৭। শিশু যদি premature হয়।

৮। শিশুর শ্বাসনালীতে রক্ত, mucus বা amniotic fluid গিয়ে বাধা সৃষ্টি করলে।

প্রসবের পর শিশুর অবস্থা নিরূপণের জন্য একটি Apgar scoring system ব্যবহার করা হয়: শিশুর হৃৎস্পন্দন (heart rate), শ্বাসপ্রশ্বাস (respiratory effort), মাংসপেশীর সবলতা (muscle tone), রং (colour) এবং প্রতিবর্তী উত্তেজনা (reflex irritability) এই কয়টি বিষয়ে দেখা হয়। এদের ভালোমন্দ অনুযায়ী ০, ১, ২ score দেওয়া হয়। সুতরাং সব থেকে বেশী score ১০ পর্যন্ত হতে পারে।

সাধারণভাবে ০ score দেওয়া হয় যখন হৃৎস্পন্দন পাওয়া যায় না; শ্বাস-প্রশ্বাসের লক্ষণ নেই; মাংসপেশী একেবারে শিথিল, রোগীর রঙ নীল অথবা সাদা; reflex irritability—কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

Score ১ ধরা হয় যখন হৃৎস্পন্দন—প্রতি মিনিটে ১০০-র কম; শ্বাসক্রিয়া খুবই দুর্বল, খুব আস্তে কাঁদে; muscle tone কম, হাত-পা অল্প flexed, রঙ—নীল; reflex irritability—কিছু নড়াচড়া আছে।

Score ২ ধরা হয় যখন হৃৎস্পন্দন—১০০ প্রতি মিনিটে বা তারও বেশী, শ্বাসক্রিয়া ভালো। রঙ—গোলাপী (pink), reflex irritability—ভালো। নিজে থেকে নড়াচড়া করে।

জন্মানোর ১ মিনিটের মধ্যেই শিশুকে ভালোভাবে এই scoringএর সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। শিশুর score ৭ থেকে ১০-এর মধ্যে হলে খুব ভালো—কোন respiratory assistance লাগে না। শুধু দেখতে হয় যাতে রোগীর শ্বাস-নালী বাধামুক্ত থাকে। কিন্তু score যদি ৭-এর কম হয়, শিশুকে respiratory assistance এবং ভাল যত্ন এবং পরিচর্যা দিতে হবে।

এখন Caesarean section ক'রে জাত একটি শিশুর কী ভাবে পরিচর্যা করা উচিত সে সম্বন্ধে কিছু অবহিত থাকা প্রয়োজন।

Caesarean section ক'রে শিশুটিকে জঠর (uterus) থেকে বের করার সময়

শল্যচিকিৎসক শিশুটিকে একটু পাশ ফিরিয়ে এবং ৪৫° মাথা নিচু (head down tilt) অবস্থায় বাইরে আনবেন এবং incision level-এর একটু নীচে রাখবেন। এতে মায়ের শরীর থেকে যথেষ্ট রক্ত শিশুর শরীরে থাকবে। মাথাটি নীচের দিকে রাখা হয় যাতে কোন secretion, amniotic fluid ইত্যাদি শিশুর শ্বাসনালীতে না চলে যেতে পারে। এর পর cordটি খুব যত্ন সহকারে clamp ক'রে কাটতে হবে। তারপর শিশুটিকে নার্সের হেফাজতে দেওয়া হয়।

প্রথমেই শিশুটির মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে। একটি নরম সরু বীজাণুমুক্ত রবারের ক্যাথেটার দিয়ে খুব ধীরে suction করলে ভালো হয়। শিশুটিকে সাধারণতঃ বাঁ দিকে পাশ ফিরিয়ে এবং মাথা নিচু (head down tilt) করে রাখা হয়। যদি শিশু না কাঁদে—নাকে ক্যাথেটার দিয়ে অক্সিজেন দিতে হবে। শিশুর পায়ের চেটোতে (sole-এ) অল্প চাপড় (slapping) দিলে অনেক সময় শিশু শ্বাস নিতে আরম্ভ করে এবং কাঁদে।

এর পরও যদি শিশু না কাঁদে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। খুব সরু endotracheal টিউব সংগে সংগে পরাতে হবে এবং ১০০% অক্সিজেন দিয়ে পজিটিভ প্রেশারে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালাতে হবে। অক্সিজেন আর্দ্র (humidified) হলে ভালো হয়। যদি intubation-এর ব্যবস্থা না থাকে—mouth to mouth ventilation করা অত্যন্ত জরুরী। তবে খুব সাবধানে দেওয়া উচিত, কেননা এভাবে বা মাস্ক দিয়ে শ্বাসক্রিয়া চালানো হলে পাকস্থলীতে অনেক গ্যাস দিয়ে ক্ষতি করে এবং এতেই স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস আরও ব্যাহত হতে পারে।

রোগীর হৃৎস্পন্দন যদি ভালো না পাওয়া যায়—তবে external cardiac massage দেওয়া উচিত। এটি হাত দিয়ে sternumকে অবনত (depress) ক'রে করা হয়—মিনিটে প্রায় ৬০ বার।

এই সংকটপূর্ণ সময়ে রোগীর তাপমাত্রা যাতে ঠিক থাকে তার দিকে নজর রাখতে হবে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রসবঘরে শিশুর দেহের তাপমাত্রা অত্যধিক কমে যেতে পারে। সুতরাং একটি শুকনো তোয়ালের সাহায্যে শিশুকে জড়িয়ে রাখা উচিত। এ সময় শিশুর metabolic acidosis হয়। তার চিকিৎসার জন্য সোডিয়াম বাইকার্বোনেট শিরাপথে দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে রক্ত সঞ্চালন করতে হতে পারে।

শিশুর এই respiratory depression যদি narcotic ওষুধের জন্য হয় তবে তার নির্দিষ্ট প্রতিষেধক (specific antidote)—nalorphine বা levallorphan শিরাপথে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

নবজাত শিশুদের ইনটেনশিভ কেয়ার বা সুপরিচর্যা ঃ

নবজাত শিশুদের যত্ন এবং পরিচর্যা অত্যন্ত সুচারুভাবে হওয়া দরকার। একটু অবহেলা বা অজ্ঞতা শিশুর জীবন বিপন্ন করতে পারে। শিশুকে একটি পরিচ্ছন্ন আলোবাতাসযুক্ত ঘরে রাখা উচিত। সব সময়ের পরিচর্যা করার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার।

শিশু দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ একটু অদ্ভুত ধরণের। এদের মস্তিষ্কের hypo-thalamus-এ তাপনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি ঠিক পরিণত থাকে না। এদের শরীরের ত্বকের নীচে চর্বি (subcutaneous fat) কম থাকে। ঘাম নিঃসরণ এবং কাঁপুনির (shivering) ক্ষমতা থাকে অত্যন্ত কম। এই সব কারণে শিশুরা নিজেদের তাপনিয়ন্ত্রণ সূক্ষ্মভাবে করতে পারে না। Brown adipose tissue শিশুদের শরীরে যথেষ্ট থাকে এবং এটি ভাল তাপ উৎপাদন করে। এই চর্বি সাধারণতঃ বগলে, ঘাড়ে, বুকের এবং পেটের মধ্যে থাকে। এই চর্বি হলদে রঙের সূক্ষ্ম কোয়া কোয়া ভাবে সাজানো—এতে যথেষ্ট রক্ত প্রবাহ এবং স্নায়ুতন্ত্র থাকে। শরীরে কাঁপুনী না করেও প্রয়োজনে এটি যথেষ্ট তাপ উৎপাদন করে—এটিই এ চর্বির বিশেষত্ব। খুব ছোট এবং premature শিশুদের ক্ষেত্রে এই চর্বি খুব কম থাকে। এই সব নানা কারণে শিশুরা যাতে অহেতুক তাপমোচন (heat loose) করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। শিশুকে ঠিকমত ঢেকে রাখা উচিত। বিশেষতঃ মাথায় একটি টুপি পরানো ভালো কেননা গোটা শরীরের তুলনায় এদের মাথার surface area বেশী হয়।

একটু অল্প কারণেই এদের দেহের অক্সিজেনের অভাব ঘটে সুতরাং অনিবার্য ভাবেই অক্সিজেন দিতে হবে। একটি নাকের ক্যাথেটার দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া যায়। তবে এদের অক্সিজেন tent-এ রাখলেই ভালো হয়। কোন কারণে res-piratory assistance-এর দরকার হলে endotracheal টিউব পরিয়ে অ্যানে-স্থিসিয়ার মেশিন এবং paediatric set-এর সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস করানোই নিরাপদ। শিশুদের ১০০% অক্সিজেন বহুক্ষণ ধরে দিলে তার বিপদও আছে। Retrolental fibroplasia হতে পারে। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে ১০০% অক্সিজেন যতক্ষণ না

দিলে নয় ততক্ষণই দেওয়া উচিত। অন্য সময় ৬০% থেকে ৭০% অক্সিজেন দেওয়া যায়।

শিশুদের acidosis অল্পেই হতে পারে। Metabolic acidosis-এর জন্য সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট শিরাপথে দেওয়া হয়। আর respiratory acidosis-এর জন্য ভালোভাবে শ্বাসকার্য চালানো দরকার।

এদের পুষ্টি এবং খাদ্য ভালোভাবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত দেওয়া উচিত। যাতে কোন বীজাণু সংক্রমণ না হয়, gastroenteritis না হয় তা দেখা উচিত। এদের cross infection হওয়ার আশংকাও থাকে খুব বেশী। সুতরাং নাভির ক্ষত (cord stump) ভালোভাবে বীজাণুমুক্ত আচ্ছাদন (antiseptic dressing) করে রাখা উচিত। বীজাণু সংক্রমণ হলে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে।

এই সব শিশুর যদি অপারেশনের প্রয়োজন হয় তবে আগে থেকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। এদের অপারেশনের আগে বেশীক্ষণ না খাইয়ে রাখা উচিত নয়, এতে শরীরে শর্করার পরিমাণ অত্যধিক কমে যেতে পারে। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে ৩ ঘণ্টার বেশী না খাইয়ে রাখা হয় না। অবশ্য এতেই এদের পাকস্থলী খালি হয়ে যায়। অপারেশনের আগে এদের ভিটামিন K ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় কেননা শিশুদের লিভার কোষ তখনও পুরোপুরি কার্যক্ষম হয় না।

উনবিংশ অধ্যায়

অসহ্য ব্যথা দূরীকরণের উপায়

ব্যথা-বেদনা এবং যন্ত্রণা দূরীকরণের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রথমে কী কারণে ব্যথা হচ্ছে তা নির্ণয় করা এবং তার যথাযথ চিকিৎসা করা। যে সব ক্ষেত্রে acute pain হয় সেক্ষেত্রে সেগুলির কারণ নির্ণয় এবং চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু বহুদিনের ব্যথাবেদনার কারণ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা অত সহজ এবং সরল হয় না। এমন কি অনেক সময় চিকিৎসক হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ তিনটি কারণে এদের চিকিৎসা খুবই কঠিন। প্রথমতঃ, অসুখের কারণ নির্ণয় করা গেলেও চিকিৎসা হয়তো অসম্ভব। Inoperable cancer অসুখে এই রকম হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, হয়তো যন্ত্রণার কারণ একেবারেই নির্ণয় করা গেলো না সুতরং চিকিৎসাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ, এমন অনেক সময় হয় যখন রোগ নির্ণয় হলেও সাধারণ চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। এইসব কারণের যে কোন একটি ঘটলেই রোগীর চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, তখন একমাত্র ব্যথা বা pain থেকেই রোগীকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং সেটি তখন একটি মানবিকতার প্রশ্ন হিসাবেই দেখা দেয়।

Chronic intractable pain নানা কারণেই হতে পারে। মাথাব্যথা, post herpetic neuralgia, trigeminal neuralgia, neuritis, causalgia, coccydinia, arthritis, migraine, spondylosis ইত্যাদি অসুখে রোগীর অসহ্য ব্যথা হয়। Phantom limb-এর জন্য, ক্যানসার হলে, radiation চিকিৎসার পরে এ ধরনের বহুদিনস্থায়ী ব্যথা হওয়া (chronic pain) খুবই সাধারণ। আবার thalamic pain, muscle spasm-এর জন্য বেদনা, peripheral vascular insufficiency-র জন্য ব্যথা—এগুলিও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

আজকাল ক্যানসার আমাদের দেশে একটি বড় স্বাস্থ্য-সমস্যা। এই ক্যানসারে অনেক সময় chronic pain-এর উদ্ভব হয়। অপারেশন, ঔষধপত্র অথবা radiotherapy ক'রে অনেকসময় ক্যানসার নিরাময় সম্ভব এবং তাতে রোগীর ব্যথাবেদনাও দূরীভূত হয়। কিন্তু যখন ক্যানসার শেষ পর্যায়ে আসে অথবা শল্য চিকিৎসার অযোগ্য হয়ে পড়ে তখনও রোগীর সেই যন্ত্রণাও অত্যন্ত বেশী

এবং অসহ্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় এদের ব্যথা কমানোর বা দূরীকরণের চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত।

সাধারণতঃ pelvis, colon, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কে ক্যানসার হলেই রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা হতে পারে। Pelvis-এর ক্যানসার হলে রোগীর cervix, bladder, prostate অথবা rectum আক্রান্ত হতে পারে। রোগের প্রকোপ অনুযায়ী যন্ত্রণার বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা নানা ধরনের হতে পারে। Cancer cervix-এ আক্রান্ত রোগিনীর যন্ত্রণা নানা কারণে হতে পারে। Radiation দেওয়ার ফলে রোগীর চামড়ায় ক্ষত হয়ে ব্যথা হতে পারে। যদি এতে রোগীর মূত্রাশয় বা মূত্রনালী আক্রান্ত হয় রোগীর প্রস্রাব হতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। রোগীর আনুষংগিক hydronephrosis হলে ব্যথা হয়। Ileac thrombosis হলে, rectum আক্রান্ত হলে, cervix-এ যদি প্রদাহ এবং ক্ষত হয় তবে অসহ্য ব্যথা হয়। এর সংগে রোগীর কোমরেও ব্যথা-বেদনা হয়। রোগীর হাড়ে যদি metastases হয়, lumbosacral plexus যদি আক্রান্ত হয় তবে রোগীর অসহনীয় যন্ত্রণা হতে পারে।

একটি ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর যে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় তা সাধারণভাবে চারটি কারণে হতে পারে। যদি রোগীর thoracic wall পর্যন্ত ক্যানসারের বিস্তৃতি ঘটে, যদি brachial plexus আক্রান্ত হয় তবে রোগী প্রচণ্ড ব্যথায় ভোগে। এদের শল্য চিকিৎসার পরও ব্যথা হতে পারে। এই অসুখে যদি vertebral column আক্রান্ত হয় তবে vertebral body collapse করতে পারে এবং intervertebral foramen-এ nerve root compression হয়ে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। Breast cancer হলে chest wall-এ অথবা brachial plexus-এ অথবা vertebral column-এ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

মোটের উপর এই ক্যানসারজনিত যন্ত্রণা কয়েকটি কারণে হতে পারে। টিউমার যদি নার্ভের উপর চাপ সৃষ্টি করে, যদি রক্তনালীর উপর অস্বাভাবিক চাপ দেয়, যদি নার্ভ এবং রক্তনালী নিজেরাই ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে যন্ত্রণার আধিক্য ঘটে। Gastrointestinal tract-এ অথবা genitourinary tract-এ অবরোধ সৃষ্টি করলে যন্ত্রণা বেশী হয়। টিউমারে প্রদাহ, জীবাণু সংক্রমণ, পচন (necrosis) হলে এবং টিউমার পিণ্ডে (mass) অত্যধিক টান বা tension হলে বেশী যন্ত্রণা হয়।

এই সব নানা ধরনের chronic intractable pain-এর চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার কারণ নির্ণয় করা দরকার। রোগীর অসুখের ঠিকমত বিবরণ—ইতিবৃত্ত জানতে হবে। ব্যথা ঠিক কী ধরনের, কখন, কোথায় এবং কেমন করে ব্যথা আরম্ভ হয়, ব্যথার বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি, কী ভাবে ব্যথার উপশম হয়, কতদিন ধরে ব্যথা হচ্ছে—আরও কোন উপসর্গ আছে কিনা—এসবই ভালোভাবে জানা দরকার। রোগীর রাত্রে ঘুম হয় কি না—ব্যথায় ঘুম ভেঙে যায় কিনা তাও জানা দরকার। রোগীর মানসিক অবস্থা কেমন তাও জানা দরকার।

এরপর রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রোগীর সব system-ই বিধিমত পরীক্ষা করতে হবে। কোন hyperaesthesia, মাংসপেশীর দুর্বলতা, মাংসপেশীর টান ইত্যাদি আছে কিনা তা দেখতে হবে। শরীরের ঠিক কোন অংশে ব্যথা, চাপ দিলে ব্যথা লাগে কি না দেখতে হবে। কিছু laboratory investigation করা দরকার। বিশেষতঃ ক্যানসারে কয়েকটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক। Serum alkaline phosphatase, isoenzyme, serum calcium, serum amylase ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা উচিত। প্রয়োজনবোধে x'rayর সাহায্যও নেওয়া হয়।

Chronic pain-এর কারণ নির্ণয় করে তার চিকিৎসা দরকার। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসা, chemotherapy ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু যখন কোন চিকিৎসাতেই কাজ হয় না তখন তার একমাত্র ব্যথাবেদনা যন্ত্রণার উপশম করাই একান্ত দরকার। এই ব্যথা উপশম অনেক ভাবে করার চেষ্টা করা হয়। নানাধরনের ওষুধ প্রয়োগ ক'রে, রোগীর মানসিক চিকিৎসা ক'রে, শল্যচিকিৎসার সাহায্য নিয়ে অথবা অন্য physical methods-এর সাহায্য নিয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়।

ব্যথা উপশমকারী ওষুধ ঃ

এই সব ওষুধের মধ্যে মরফিন, পেথিডিন, পেন্টাযোসিন ইত্যাদি ওষুধ খুবই ব্যবহার করা হয়। এই সব ব্যথানাশক (analgesic) ওষুধ একেবারে ব্যথা অনুভূতি দূর করতে না পারলেও রোগী ব্যথা সহ্য করার বেশী ক্ষমতা পায়। Aspirin, paracetamol, codeine, dextropropoxyphene ইত্যাদি রোগীর ব্যথা অনেক উপশম করতে পারে। এগুলি রোগীকে মুখে খেতে

দেওয়া হয়। মরফিন বা পেথিডিন খুব ভালো ব্যথানাশক ওষুধ—এগুলি ইঞ্জেকশনের সাহায্যে দেওয়া হয়। কিন্তু বহুদিন এবং অনেক বেশী মাত্রায় এর ব্যবহার করলে কিছু ক্ষতি হতে পারে—রোগীর নেশায় পরিণত হতে পারে। এ সব দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময় মরফিন বা পেথিডিনের সংগে phenothiazine ওষুধ মিশিয়ে দিলে বেশী উপকার হয়। Phenothiazine ওষুধের মধ্যে প্রোক্লোরপেরাজিন, প্রোমেথাজিন, পারফেনাজিন, প্রোমাজিন, ক্লোরপ্রোমাজিন ইত্যাদির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডায়াজিপাম যদিও ব্যথানাশক নয় তবে এতে রোগীর ভয়-ভাবনা, anxiety ইত্যাদি কমতে সাহায্য করে। হ্যালোপেরিডল দিলেও অনেক উপকার হয়। এই সব ওষুধের বিপদ এবং সীমাবদ্ধ অবস্থা (limitation) থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বেশী মাত্রায় এই ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। তবে সব সময়েই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।

অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ঃ

এই সব ওষুধের মধ্যে নাইট্রাস অক্সাইড এবং ট্রাইক্লোরোএথিলিন খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। নাইট্রাশ অক্সাইড ভালো ব্যথাবেদনা উপশম করতে পারে। অক্সিজেনের সংগে 'entonox' হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। ট্রাইক্লোরোএথিলিন কম concentration-এ দিলে রোগী অ্যানেস্থিসিয়া ছাড়াই ভালোভাবে ব্যথাবেদনা উপশম করতে পারে। রোগী নিজেই এ পদ্ধতি নিতে পারে—সেজন্য Cyprane inhaler বা Tecota inhaler পাওয়া যায়। এতে বিপদের সম্ভাবনাও খুব কম। ক্যানসার জাতীয় রোগীর যন্ত্রণা সব সময়েই হতে থাকে সুতরাং অন্য ওষুধ ব্যবহার করলেও মাঝে মাঝে রোগী এই অ্যানেস্থিয়ার ওষুধ ব্যবহার ক'রে সুফল পায়।

Subarachnoid block :

ক্যানসারের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য অ্যালকোহল, ফেনল অথবা chlorocresol দিয়ে spinal block করা যেতে পারে। অধুনা saline ইঞ্জেকশনও সাফল্যের সংগে দেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য অভিজ্ঞ এবং দক্ষ অ্যানেস্থিটিষ্টের সাহায্য প্রয়োজন। Absolute অ্যালকোহল ব্যবহার করে কয়েকমাস পর্যন্ত ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র posterior nerve rootletsকেই block করা হয়—anterior motor root-কে বাদ দেওয়া হয়।

এতে শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে খুব ভালো সাফল্য আসে। তবে অনেক সময় motor weakness, rectal এবং bladder disturbances হতে পারে।

অনেক সময় phenol দিয়েও subarachnoid block করা হয়। ফেনল সাধারণতঃ glycerine-এর সংগে মিশিয়ে ৫% solution করে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং এতে বেশ তাড়াতাড়ি nerve root-এ fixation হয়। এই পদ্ধতি সাধারণত: ক্যানসারের যন্ত্রণা লাঘবের জন্যই দেওয়া উচিত। একই রোগীকে প্রয়োজনবোধে অনেকবার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে অন্যান্য উপসর্গ সাধারণতঃ কম হয় তবে motor weakness, bladder damage, urinary dysfunction ইত্যাদি হতে পারে।

খুব ঠাণ্ডা স্যালাইন দিয়েও subarachnoid block করলে যন্ত্রণা লাঘব হতে দেখা যায়। এতে sensory loss খুব একটা হয় না। এই পদ্ধতিতে lumbar puncture ক'রে খানিক cerebrospinal fluid বের করে নেওয়া হয় এবং তার পর ২০ থেকে ৮০ মি. লি. ice cold saline ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তবে সাধারণ তাপমাত্রার ৭.৫% স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিলেও ভাল কাজ পাওয়া যেতে পারে এবং এতে রোগী প্রায় ১০০ দিনের মত যন্ত্রণা বুঝতে পারে না।

Barbotage :

ক্যানসারের ব্যথায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। Lumbar puncture করে ২০ মি. লি. cerebrospinal fluid একবার বের করে আবার তা ইঞ্জেকশন করা হয়। এইভাবে অন্ততঃ ১৫ বার বা তারও বেশী বার করতে হবে। সাধারণ তাপমাত্রাতেই এটি করা হয় তবে তাতে কোন কাজ না হলে cerebrospinal fluidকে ঠাণ্ডা করে অবার ইঞ্জেকশন দিলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে ঠিক কীভাবে যন্ত্রণা লাঘব হয় তা বোঝা কঠিন। তবে এই barbotage যদি level of pain-এর জায়গায় করা হয় তবে স্থানীয় চাপ সৃষ্টির জন্য যন্ত্রণা লাঘব সম্ভব হতে পারে।

Epidural block :

১০% phenol in glycerine epidural ইঞ্জেকশন দিয়ে ক্যানসারজনিত যন্ত্রণা কমানো যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতি খুব বেশী প্রচলিত নয়। এর প্রায়োগিক জটিলতা (technical difficulty) আছে অনেক। Pelvis-এর

ক্যানসারে ৫% benzyl alcohol in oil ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণতঃ caudal route-এ। তবে এটিও বিশেষ প্রচলিত পদ্ধতি নয়।

তবে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে continuous epidural ইঞ্জেকশন খুব সাফল্যের সংগেই ব্যবহার হয়। ব্যথা-বেদনা এবং যন্ত্রণা যদি খুবই বেশী ধরনের হয় এবং অন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে যদি ব্যথামুক্তি না ঘটে তবে continuous epidural analgesia পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতি খুবই সাবধানে এবং বীজাণুমুক্ত সতর্কতায় করা উচিত নতুবা বীজাণু সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ভালো পর্যবেক্ষণে রেখে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে এক মাস বা তারও বেশী এই epidural ক্যাথেটার ঠিক মত রাখা যায়। প্রয়োজন হলে ক্যানসার রোগীর শেষ অবস্থাতেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।'

Cranial এবং peripheral nerve blocks :

Cancer larynx-এর শেষ পর্যায়ে অ্যালকোহল দিয়ে superior laryngeal block করলে রোগীর যন্ত্রণা অনেক লাঘব হয়। ফুসফুসের ক্যানসারে অনেক সময় intercostal nerve block করলে উপকার পাওয়া যায়। মাথা এবং ঘাড়ের ক্যানসারে অ্যালকোহল অথবা ফেনল দিয়ে nerve destruction করা একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এতে খুব দক্ষতার সংগে ইঞ্জেকশনের স্থচটি ঠিক জায়গায় নিতে হয় এবং অনেক সময় x'ray-এর সাহায্য নিলে স্থবিধে হয়।

Trigeminal neuralgia-র সব থেকে ভালো চিকিৎসা—অপারেশন করে nerve root-কে ছেদন (section) করা। কিন্তু তার পরেও রোগীর যন্ত্রণা থাকতে পারে—একে anaesthesia dolorosa বলে। এক্ষেত্রে nerve stimulator দিয়ে চিকিৎসা করলে উপকার পাওয়া যায়। অ্যালকোহল দিয়ে neurolysis করা যায়, তবে পরে regeneration হতে পারে এবং আবার যন্ত্রনার উদ্ভব হতে পারে। অনেক সময় gasserian ganglion block ক'রে বা neurolysis ক'রে ব্যথার উপশম করা হয়। আবার অন্যভাবে gasserian ganglion-এ একটি মোটা স্থচ দিয়ে radiofrequency current দেওয়া হয়, ফলে সেই তাপে ganglion নষ্ট হয়ে যায় এবং যন্ত্রণামুক্তিও ঘটে।

Upper abdomen-এর ক্যানসারে, যেখানে পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, লিভার বা পিত্তস্থলী আক্রান্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে যন্ত্রনা লাঘবের জন্য অ্যালকোহল দিয়ে coeliac plexus block করা হয়। এটি যদি ভালভাবে block করা যায় তবে

বেশীর ভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই যন্ত্রণানাশ হয়। এতে বিশেষ কোন অন্য উপসর্গ দেখা দেয় না।

মাথায় এবং ঘাড়ের ক্যানসারে cranial nerve এবং cervical plexus block-এর সংগে cervical ganglion block বা neurolysis অনেক সময়ই দরকার হতে পারে। তবে এই পদ্ধতি খুব সাবধানে x'ray-এর সাহায্য নিয়ে করা উচিত।

Lumbar sympathetic block করে ক্যানসারের যন্ত্রণায় খুব একটা কাজ হয় না, তবে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ব্যবহার করে spinal block করলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

Intermittent claudication-এ lumbar paravertebral block বা lumbar plexus block করা হয়। এতে সাধারণতঃ ৭·৫% phenol in myodil ব্যবহার করা হয় এবং এর ফলে ব্যথামুক্তি অনেক দিন স্থায়ী থাকে।

এই সব destructive neurolysis খুব সাবধানে করা উচিত। যত কম sensory function নষ্ট হয় ততই ভাল। Motor function-এর কোন ক্ষতি করা উচিত নয়। এই সব পদ্ধতি প্রয়োগের আগে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ test dose হিসাবে দিয়ে দেখা উচিত ঠিক জায়গায় ঠিক ভাবে block হচ্ছে কিনা। Sensory loss ঠিকমত যাচাই করে তবেই ফেনল বা অ্যালকোহল দেওয়া উচিত। এই পদ্ধতি সাময়িকভাবে যন্ত্রণার উপশম ঘটায় এবং কয়েক মাস অন্তর এই পদ্ধতি প্রয়োগের দরকার হতে পারে। এর উপসর্গগুলি মনে রেখে রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার।

শল্য চিকিৎসা ঃ

ক্যানসারজনিত যন্ত্রণার উপশমের জন্য অনেক সময় neurosurgical অপারেশনের দরকার হয়। এই সব অপারেশন খুব একটা সহজ নয় এবং এর অনেক কুফলও আছে। এগুলি খুব ভেবেচিন্তে নির্বাচিত ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। Percutaneous cordotomy একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এতে spinal cord-এর anterolateral tract-এ direct current অথবা radiofrequency current দিয়ে ক্ষত করা হয়। এখানে percutaneous route ব্যবহার করা হয়। আবার strontium beta necrosis করেও cordotomy করা যায়। এটি অপারেশনের তুলনায় অনেক নিরাপদ পদ্ধতি এবং খুব খারাপ রোগীকেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

Extradural space-এ ক্যানসারের metastasis হলে অনেক সময় decompressive laminectomy করা হয় এবং সেক্ষেত্রে ব্যথাবেদনার উপশম ঘটে।

Transnasal pituitary injection করে ক্যানসারজনিত যন্ত্রণার চিকিৎসা আধুনিককালে হচ্ছে। সাধারণ ক্যানসারের শেষ পর্যায়ে খুব খারাপ অবস্থায় রোগীকে প্রচণ্ড যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দিতেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। নাকের মধ্য দিয়ে সূচ ঢুকিয়ে pituitary region-এ অবিমিশ্র (absolute) অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। Pituitary adenolysis করতে ০·৬ থেকে .২ মি. লি. অ্যালকোহল লাগে। এতে অনেক কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে—যেমন ptosis, diplopia, hemianopia, meningeal irritation ইত্যাদি। এই পদ্ধতি প্রয়োগের পরে diabetis insipidus, hypoadrenalism, hypothyroidism হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এটি ঠিক কি ভাবে কাজ ক'রে ব্যথা উপশম ঘটায় তা ঠিক জানা যায় নি। এই ব্যথা উপশম hormone dependent টিউমারে যেমন হয়, তেমনি অন্য টিউমারের ক্ষেত্রেও ভালো ফল হয়। আসলে pain pathway-এর কোন জায়গায় thalamus, hypothalamus এবং brain stem-এর কোন সংযোগ মাধ্যমের ওপর কাজ করেই ব্যথামুক্তি ঘটায়। এই পদ্ধতিতে যন্ত্রণালাঘব খুব তাড়াতাড়ি, সম্পূর্ণভাবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

Electrical stimulation :

Melzack এবং Wall-এর মতবাদ অনুসারে বড় myelinated A delta fibres যদি বেশী উত্তেজিত বা stimulate করা যায় তবে C fibre দিয়ে কোন impulse যেতে পারে না। এটি বাধাপ্রাপ্ত হয় সাধারণতঃ spinal cord-এর dorsal horn-এ substantia gelatinosa-র লেভেলে। এর ফলে রোগীর ব্যথা অনুভূতি কম হয়। এই মতবাদ কাজে ব্যবহার করে অনেক সময়েই ব্যথা অনুভূতি কমান হয়। রোগীর ব্যথার জায়গায় বা তার কাছাকাছি জায়গায় vibration ক'রে, percussion ক'রে অথবা কোন রকমের counter irritation ক'রে সাফল্যের সংগে ব্যথা উপশম করা যেতে পারে। Counter irritation সাধারণতঃ করা হয় বরফ ব্যবহার করে অথবা ব্যথানাশক স্প্রে ব্যবহার করে। এগুলি খুবই সহজ এবং নিরাপদ পদ্ধতি। চিকিৎসার প্রথম দিকে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

Electrical nerve stimulation করে বহুদিনের পুরোনো যন্ত্রণার চিকিৎসা করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি electrode রোগীর ব্যথার জায়গায়, চামড়ায় অথবা তার নীচে (subcutaneous) রাখা হয়। শরীরের যে dermatome-এ ব্যথা সেখানে electrode রাখাই ভালো। তারপর সেইখানে electric stimulation একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে major peripheral nerve, major plexusকেও এই ভাবে stimulate করা হয়। প্রয়োজনবোধে spinal cord-এর dorsal column এবং এমন কি মস্তিষ্কের নির্বাচিত ক্ষেত্রেও stimulate করা হয়। এই পদ্ধতি খুবই ভালভাবে ব্যথা নিবারণ করতে পারে। এতে অন্যান্য উপসর্গ খুবই কম হয় এবং তার বেশীর ভাগই চামড়ায় প্রদাহের জন্য। এই পদ্ধতি যদি রোগীকে আগে থেকেই শিখিয়ে দেওয়া যায় তবে রোগী দরকার মত তা ব্যবহার করতে পারে। এই সব বহুদিনের chronic ব্যথার চিকিৎসাও বহুদিন ধরে চলে সুতরাং রোগীর ডাক্তারের পরামর্শমত এই সব পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা বাঞ্ছনীয়।

সম্মোহন (Hypnosis):

এই hypnosis পদ্ধতিতে রোগীর ভয়, ভাবনা মানসিক চাপ দূর হয়। রোগী ভালোভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। ব্যথাবেদনার উপশম হয় এবং এমন কি অ্যানেস্থিসিয়াও হয়। এতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এবং মানসিক বিপর্যয় থেকে রোগীর মন প্রশান্ত হয়। এই trance-like state পুরাতন সমস্ত ব্যথাবেদনার রোগীদের পক্ষে খুবই উপকার হয়। এই সম্মোহন খব সাবধানে এবং দক্ষতার সংগে করা উচিত। সম্মোহন করে কোমরে ব্যথা (low back pain) এবং muscular spasm সাফল্যের সংগে চিকিৎসা করা হয়।

Psychotherapy:

এই chronic pain-এর রোগীদের বেশীর ভাগই মানসিক বৈকল্যে ভোগে। সুতরাং psychotherapy এদের পক্ষে খুবই উপযোগী। রোগী যাতে তার নিজের উপর আস্থা ফিরে পায় তা দেখা উচিত। রোগীর সংগে ডাক্তারের, নার্সের, আত্মীয়স্বজনের ভালো সম্বন্ধ এবং যোগাযোগ থাকা দরকার। রোগীর অনুভব এবং আবেগ সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করা উচিত। এক-একজন এক এক ভাবে ব্যথাবেদনা সহ্য করতে পারে। সবার সহ্য করার ক্ষমতা সমান থাকে

না। রোগীর ব্যক্তিত্বের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। রোগীর শুধু অসুখের কথা না ভেবে 'পুরো' অসুস্থ মানুষটির কথা ভাবা দরকার।

যোগ এবং ধ্যান (Yoga and meditation) :

যোগ এবং সমাধি ঠিকমত অভ্যাসে শারীরিক এবং মানসিক অনেক বৈকল্য আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। বিশেষতঃ ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা, ভয়-ভাবনা ইত্যাদি সমূলে বিনাশ হতে পারে। এই যোগের ফলে শরীরে এবং মনে ভালো শিথিলতা হয় এবং সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক চাপ দূরীভূত হয়। এই যোগাভ্যাসের ফলে মাংসপেশীর টান (muscle spasm), ঘাড়ে ব্যথা (cervical pain), কোমরে ব্যথা (low back pain) ইত্যাদি একেবারে ভালো হয়ে যেতে পারে। এতে শারীরিক পটুতা বাড়ে, মনও দৃঢ় হয়। ব্যথাবেদনা সহ্য করার ক্ষমতাও বাড়ে।

Audioanalgesia :

অনেক সময় গান, বাজনা, রেডিও, টেলিভিশন রোগীর মনকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং রোগীর tension কমে। এতে ব্যথাবেদনার অনুভূতি কমে এবং সহ্য করার ক্ষমতাও বাড়ে। এটি পরীক্ষিত সত্য যে chronic pain-এর রোগীর ব্যথানাশক ওষুধের প্রয়োজন এতে কমে যায়। যে সব গান রোগীর মনকে শান্ত করে সেই সব গানই রোগীর জন্য নির্বাচন করা দরকার।

আকুপাংচার (Acupuncture) :

আধুনিককালে আকুপাংচার এই সব ব্যথাবেদনার চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি বহুদিনের চৈনিক চিকিৎসাপদ্ধতি। এ পদ্ধতি acute বা chronic উভয় ব্যথাবেদনা, যন্ত্রণা উপশমের জন্যই ব্যবহার করা যায়। যে সব ক্ষেত্রে neurolysis বা অপারেশন করেও ভালো ফল পাওয়া যায় না অথবা এ সব করা তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক—সেক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি প্রয়োগ সহজেই করা যায়। এটি ঠিক কী ভাবে ব্যথা উপশম করে তা বলা কঠিন। তবে এই পদ্ধতি large fibre pain inhibiting system-এর উপর কাজ করে। আকুপাংচার সূচ ফোটানোর ফলে স্থানীয় সে জায়গায় encephalin এবং endomorphan তৈরী হয় এবং সেগুলি শরীরে প্রবাহিত হয়ে ব্যথা উপশম

করতে পারে। এই আকুপাংচার পদ্ধতিতেও কিছু suggestion এবং hypnosis প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মোটের উপর chronic pain-এর রোগীর চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন। রোগীকে ঠিকমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কারণ নির্ণয় করা দরকার, তারপর বিধিমত চিকিৎসা করা উচিত। রোগীর অসুখ সম্বন্ধে যেমন চিন্তা করতে হবে—তেমন তার psychological, emotional এবং social factorগুলিও দেখতে হবে। এদের ভালো চিকিৎসার জন্য multidisciplinary approach হওয়া দরকার। অন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক, শল্য চিকিৎসক, psychiatrist, physiotherapist—সবারই পরামর্শ নেওয়া উচিত। পর্যাপ্ত nursing care এদের দরকার। আত্মীয়স্বজনদের যথেষ্ট সহানুভূতির সংগে এদের বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

বিংশ অধ্যায়

কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাসকার্য

মানুষের শ্বাসকার্য প্রধানতঃ তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকেরই একটি respiratory drive থাকতে হবে। মানুষের central nervous system থেকে শ্বাসকার্যের মাংসপেশী পর্যন্ত এক কার্যকরী pathway থাকতে হবে এবং একটি বাধামুক্ত শ্বাসপথ (airway) থাকতে হবে। এই তিনটির যে কোন একটি, দুটি বা তিনটির কার্যক্ষমতা নষ্ট হলে পর্যাপ্ত শ্বাসকার্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

খুব বেশী ঘুমের ওষুধ বা অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ প্রয়োগে central nervous system অবদমিত হয়, ফলে রোগীর respiratory drive থাকে না। এ সব ক্ষেত্রে যদি বিশেষ প্রতিষেধক (specifiic antagonist) থাকে যেমন nalorphine বা naloxone তবে তা দেওয়া যেতে পারে। তবে রোগীর স্বাভাবিক শ্বাসকার্য না ফিরে আসা পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাতে হবে।

Central nervous system থেকে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাংসপেশীসমূহ পর্যন্ত pathway নানাভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। সব থেকে বেশী হয় অ্যানেস্থিসিয়ার সময় muscle relaxant ব্যবহার করলে। এই সব muscle relaxant—যেমন টিউবোকিউর‍্যারিন, গ্যালামিন, প্যানকিউরোনিয়াম, সাক্সামেথোনিয়াম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোগীকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালানো হয় যতক্ষণ না এই সব ওষুধের কার্যকারিতা শেষ হয়। অবশ্য neostigmine nondepolarizing muscle relaxant-এর প্রতিষেধক (antidote) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একটি high spinal অ্যানেস্থিসিয়া অনেক সময় শ্বাসকার্য ব্যাহত করতে পারে, সে সময়ও কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানো দরকার।

Upper airway obstruction নানাকারণে হতে পারে—যেমন laryngospasm, শ্বাসনালীতে কোন অন্য জিনিস ঢুকে গেলে, টিউমার হলে, fistula বা epiglottitis হলে এবং অনেক সময় অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় রোগীর নিজের জিভ নীচের দিকে ঝুলে পড়ে শ্বাসরোধ করতে পারে। এই সব acute upper airway obstruction-এ রোগীর চিকিৎসা তাৎক্ষণিক হওয়া উচিত নতুবা

রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। প্রথমেই রোগীর শ্বাসপথ পরিষ্কার করে দিতে হবে যাতে ভালোভাবে শ্বাসনালী দিয়ে শ্বাস যেতে পারে। তারপর একটি Boyle অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিন এবং মুখের মাস্কের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাতে হবে—দরকার হলে endotracheal intubation করতে হবে। অনেক সময় গলায় (trachea) মোটা সূচ দিয়ে ফুটো করে অক্সিজেন দেওয়া হয় কিন্তু এভাবে শ্বাসক্রিয়া প্রায় করাই যায় না। এরপর প্রয়োজনে tracheostomy করতে হবে। শ্বাসকার্য চালু করেই রোগীকে শিরাপথে fluid দেওয়া দরকার যাতে cardiovascular stability থাকে। এর পর কী কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়েছে তা নির্ণয় ক'রে যথাবিধি চিকিৎসা করা দরকার।

কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালাতে গেলে দুইটি জিনিষের দিকে নজর রাখা দরকার। প্রথমটি রোগীর ফুসফুসের মধ্যে জোর করে বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া—এটাই inspiration। তারপর সেই বাতাস ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দিতে হবে—সেটাই expiration। Inspiration-এর সময় রোগীর বুকের খাঁচা ভালভাবে ফুলে উঠছে কিনা তা সব সময়েই দেখতে হবে। Expiration-এর জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে, যাতে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যেতে পারে এবং তার পরেই পরের শ্বাসকার্য চলতে থাকবে। Expiration-এর সময় কম হলে রোগীর intrathoracic প্রেশার অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং এতে রক্তপ্রবাহের ওপর অযথা চাপ পড়ে। মোটামুটি inspiration-এর সময় থেকে expiration-এর সময় কমপক্ষে দ্বিগুণ হওয়া উচিত।

স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ায় কোন কিছুর সাহায্য লাগে না—সেটি spontaneous শ্বাসকার্য। কিন্তু যখন রোগী ভালোভাবে পুরো নিঃশ্বাস নিতে পারে না তখন তার assistance বা অপরের সাহায্য লাগতে পারে। এই assisted breathing-এ রোগীর inspiration-এর সময় rebreathing বা reservoir ব্যাগ হাত দিয়ে চেপে বেশী প্রেশার দিয়ে বাতাস রোগীর ফুসফুসে দেওয়া হয়। এই assisted inspiration-এর পরই passive expiration-এর জন্য সময় দেওয়া হয়। পরের inspiration-এ আবার reservoir ব্যাগে প্রেশার দেওয়া হয়।

যখন রোগী একেবারেই শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে অক্ষম তখন controlled ventilation করা হয়। পুরো inspiration এবং expiration-এ রোগীর নিজের কোন কাজ থাকে না। Controlled এবং assisted respiration—উভয়কেই

intermittent positive pressure ventilation বলা হয়। এই পদ্ধতিতে pulmonary inflation-এর জন্য mechanical ventilator অথবা reservoir ব্যাগ থেকে রোগীর শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে পরিমিত পজিটিভ প্রেসার দেওয়া হয়।

এই positive pressure ventilation-এ শরীরের বিভিন্ন তন্ত্রে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

স্বাভাবিক শ্বাসকার্যে inspiratory, intrapulmonary এবং intrapleural প্রেশার সব সময় negative থাকে কিন্তু positive pressure breathing-এ এগুলি positive হয়ে পড়ে। কৃত্রিম শ্বাসকার্যে ফুসফুসের compliance শতকরা ৫০ ভাগের মত কমে যেতে পারে। Physiological dead space এবং tidal volume-এর অনুপাত বেড়ে যায়। এই আনুপাতিক হার আরও বেড়ে যেতে পারে যদি ফুসফুসের অসুখ থাকে। বয়স বাড়ার সংগে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বাড়ার সংগেও এই অনুপাত বাড়তে থাকে।

বেশী পজিটিভ প্রেশারে ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। অত্যধিক প্রেশারে alveoli rupture করতে পারে, কিন্তু এ অতি বিরল ঘটনা। Reservoir ব্যাগ ব্যবহার করে কখনও ৫০ সে. মি. H_2O প্রেসারের বেশী করা যায় না। অবশ্য mechanical ventilator ব্যবহার করলে অনেক বেশী প্রেশারে ক্ষতি হতেই পারে।

কৃত্রিম শ্বাসকার্যে অনেক সময় respiratory alkalosis হতে পারে। এতে রক্তের হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন বাহিত হবার সম্ভাবনা বেশী হয়, মস্তিষ্কে vasoconstriction হয় এবং cardiac output কমে যায়, কিন্তু এতে রোগীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। বেশী ventilation হলে রোগীর রক্তে কারবনডাই-অক্সাইড অত্যধিক কমে যায় এবং এতে ascending reticular formation অবদমিত হয়, তার ফলে pain threshold বেড়ে যায়।

অনেকদিন কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালালে রোগীর ফুসফুসে atelectasis হতে দেখা যায়। Periodic deep breath বা sigh দিলে এই atelectasis-এর ঘটনা কম হয়।

পজিটিভ প্রেশার শ্বাসকার্যে রোগীর right atrial pressure বেড়ে যায় এবং তার ফলে venous return এবং cardiac output কমে। সাধারণ ক্ষেত্রে হয়তো এটি বিশেষ ক্ষতি করে না, তবে রোগীর hypovolaemia থাকলে

বিপদের কারণ হতে পারে। Expiration-এর সময় negative phase দিলে cardiac output মোটামুটি ঠিক থাকে এবং রক্তচাপ কমে না।

ফুসফুসে রক্ত সংবহন (pulmonary blood flow) এই পজিটিভ প্রেশার শ্বাসক্রিয়ায় বিঘ্নিত হয়। Pulmonary capillary প্রেশার যদি বেড়ে যায় তবে তা right heart-এ চাপ সৃষ্টি করে। অনেক দিন কৃত্রিম শ্বাসকার্যে pulmonary oedema পর্য্যন্ত হতে পারে।

কৃত্রিম ভাবে শ্বাসকার্য চালানোর সময় রোগীর অক্সিজেন consumption কমে যায় কেননা শ্বাসকার্যের জন্ম রোগীর কোন muscular effort থাকে না। অ্যানেস্থিসিয়ার সময় muscle relaxant এবং narcotic ওষুধের মাত্রাও কম লাগে।

অ্যানেস্থিসিয়ার সময় কৃত্রিম শ্বাসকার্য করলে কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। এতে ফুসফুসে অ্যানেস্থিসিয়ার গ্যাস বা ভেপার interchange খুব ভালোভাবে হয় এবং এই সব ওষুধও কম লাগে। Thoracic অপারেশনে রোগীর paradoxical breathing এবং mediastinal flutter প্রতিরোধে এই কৃত্রিম শ্বাসকার্য অপরিহার্য। Upper abdomen-এর অপারেশনে diaphragm movement যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বহুক্ষণ ধরে যে সব অপারেশন হয় তাতে alelectasis হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে controlled ventilation সেই হার কমাতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতিতে hypoxia এবং respiratory acidosis হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। Neurosurgery-তে, diaphragmatic হারনিয়া অপারেশনে, cardiac surgery-তে, thoracic surgery-তে controlled respiration অত্যাবশ্যক। মোটের উপর এই পদ্ধতি ভালো শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ করে, ভালো muscular relaxation করে এবং একটি আদর্শ working condition দিতে সাহায্য করে।

অবশ্য এই কৃত্রিম শ্বাসকার্যের কয়েকটি অসুবিধাও আছে। এতে রোগীর অ্যানেস্থিসিয়ার respiratory sign কিছু বোঝার উপায় থাকে না। এই পজিটিভ প্রেশার রোগীর হৃৎপিণ্ড এবং রক্তপ্রবাহের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ফুসফুসে রক্তপ্রবাহ (pulmonary blood flow) ব্যাহত হতে পারে।

এই নিয়ন্ত্রিত শ্বাসকার্য (controlled ventilation) ঠিক মত হচ্ছে কি.না তার দিকে যথেষ্ট নজর রাখা দরকার। কম (hypoventilation) অথবা

বেশী (overventilation) শ্বাসকার্য যাতে না হয় তার দিকে নজর দেওয়া উচিত। রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ এবং দেহের তাপমাত্রা ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। প্রয়োজন বোধে gas analysis করার দরকার হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী পজিটিভ প্রেশারে নিয়ন্ত্রিত শ্বাসকার্য অভিজ্ঞ এবং কুশলী চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানেই করা উচিত।

সাধারণভাবে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হলে বা অপর্যাপ্ত হলে রোগীকে কৃত্রিমভাবে পজিটিভ প্রেশারে শ্বাসকার্য চালানো হয়। নিম্নোক্ত অবস্থায় কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানো একান্ত আবশ্যক :

১। রোগীর শ্বাসক্রিয়ার মাংসপেশীসমূহে অথবা neuromuscular junction-এ যদি গণ্ডগোল দেখা দেয়, যেমন—অ্যানেস্থিসিয়ার সময় muscle relaxant ব্যবহার করলে, কয়েকটি অসুখের ক্ষেত্রে—যেমন টিটেনাশ, myasthenia gravis, dystrophia myotonica ইত্যাদিতে, যে কোন অরগানোফসফরাস ওষুধের বিষক্রিয়ায়।

২। রোগীর ফুসফুসে কোন অসুখ থাকলে—যেমন-chronic bronchitis, emphysema, pulmonary oedema, idiopathic respiratory distress syndrome, status asthmaticus, নিউমোনিয়া, aspiration pneumonitis, জলে ডোবা, bronchiolitis ইত্যাদিতে।

৩। রোগীর central nervous system অত্যধিক অবমদিত থাকলে—যেমন head injury, cervical cord injury, অক্সিজেনের অভাবে অথবা আঘাতে অথবা প্রদাহে cerebral damage হলে, epilepsy, নানারকম narcotic ওষুধের বিষক্রিয়ায়, মস্তিষ্কের অপারেশনের পর ইত্যাদিতে।

৪। রোগীর peripheral nerve যদি কোন অসুখে আক্রান্ত হয়—যেমন পোলিও মাইলাইটিশ এবং পলিনিউরাটিশের ক্ষেত্রে। অপারেশনের সময় যদি আকস্মিকভাবে phrenic nerve কাটা পড়ে তবে diaphragmatic paralysis হয়, high epidural বা spinal block-এও diaphragmatic paralysis হয়—সেক্ষেত্রেও কৃত্রিম শ্বাসকার্যের দরকার হতে পারে।

৫। Mechanical impairment-এর জন্য শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হয়—যেমন multiple fractured ribs বা crush injury of chest, thoracotomy-র পরে, intrathoracic tumour বা cyst থাকলে, exomphalos অপারেশনের

পর, diaphragmatic হারনিয়া অথবা eventration অপারেশনের পর কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানোর দরকার হতে পারে।

কৃত্রিম শ্বাসকার্যের প্রয়োগপদ্ধতি :

কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালানোর অনেক রকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আগের দিনে Holger Nielson method, Silvester method এবং Schafer method খুবই ব্যবহার করা হতো। এগুলি বিশেষ ভাবে জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক (first aid) চিকিৎসা হিসাবে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্যে চালানো হতো। এতে রোগীর বুকে বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়াই রোগীর শ্বাস নিতে সাহায্য করতো। কিন্তু এই সব পদ্ধতি খুব বেশী সাফল্য দেয় না—এগুলি ব্যবহার করারও নানান অসুবিধা আছে। তাই এসব পদ্ধতি এখন আর বিশেষ ব্যবহার করা হয় না।

এখন কৃত্রিম শ্বাসকার্যের first aid বা প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে mouth to mouth ventilation বা mouth to nose ventilation খুবই প্রচলিত। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এই পদ্ধতি খুবই সহজ, ভালো ফল দেয় এবং এতে কোন যন্ত্রপাতি লাগে না বলে যে কোন স্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতি সাধারণের শিক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার।

যদি কিছু সাধারণ এবং সহজ যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় তবে এই respiratory resuscitation অধিকতর সাফল্য দিতে পারে। এই সব নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি প্রতিটি হাসপাতাল ওয়ার্ডে, অ্যাম্বুলেন্সে, first aid centre-এ এবং প্রতি সাধারণ চিকিৎসকের ব্যাগে থাকা বাঞ্ছনীয়।

Brook airway (চিত্র ৫৮) :

এটি দিয়ে mouth to airway ventilation করা যায়। এর একটি দিক pharyngeal airway-র মত—সেটি রোগীর মুখের মধ্যে থাকে। তারপর একটি flange থাকে যাতে মুখের উপর লাগলে ভালো airtight থাকে। সেই flange থেকে উপরের দিকে একটি টিউব থাকে এবং তার মধ্যে একটি one—way valve থাকে। সেই ভাল্ব দিয়ে expired gas পাশের একটি ছোট ফাঁকা জায়গা দিয়ে

বাইরে বেরিয়ে যায়। এই airway স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের তৈরী হয়, ফলে রোগী বমি করলে দেখা যায়। এটি ভালোভাবে রোগীর মুখে লাগানো হয় এবং রোগীর নাক বন্ধ রেখে mouth to airway ventilation করা হয়। সাধারণ mouth
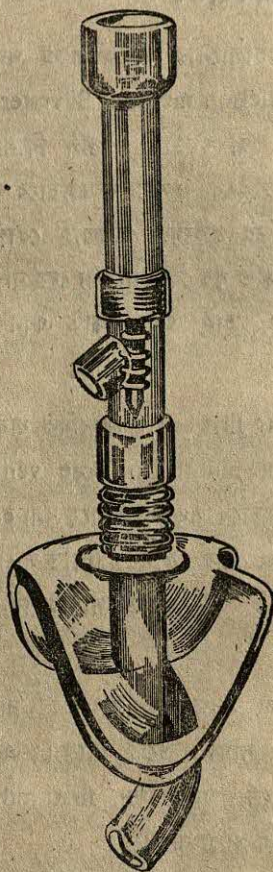
চিত্র নং ৫৮ : Brook airway

to mouth ventilation-এর চেয়ে এটি বেশী কার্যকরী। এই পদ্ধতি প্রয়োগে প্রয়োগকর্তারও অস্বস্তি বোধ হয় না।

Ambu resuscitator থাকলে সাধারণ বাতাস দিয়ে রোগীকে ভালোভাবে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানো যায়। এসম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এরসংগে Ruben non-rebreathing ভাল্ব লাগানো থাকে এবং এর কার্যকারিতাও যথেষ্ট সন্তোষজনক।

E.M.O. apparatus-এ হাপর বা bellows থাকার দরুন যে কোন অবস্থায় artificial respiration দেওয়ার কাজে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। এই E. M. O. inhaler একটি draw over anaesthetic vaporizer। এ দিয়ে বাতাস এবং ইথারের সাহায্যে রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া যায়। তবে vaporizer বাদ দিয়ে Oxford inflating bellows ব্যবহার করে পজিটিভ প্রেশার ventilation করা যায় (চিত্র ৫৯)। এইভাবে Penlon bellows unit-ও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই automatic non-rebreathing ভাল্ব ব্যবহার করা একান্ত দরকার।
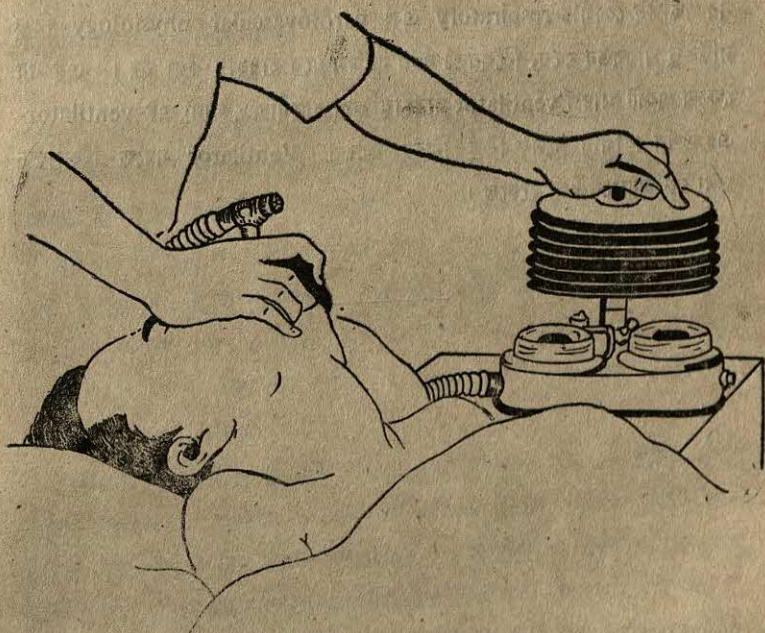
চিত্র নং ৫৯ : Oxford inflating bellows দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসকার্য।

Intermittent পজিটিভ প্রেশার দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালানোর সবচেয়ে ভালো এবং প্রচলিত পদ্ধতি হোল রোগীকে endotracheal intubation করে Boyle অ্যানেস্থিসিয়ার মেশিনের সাহায্যে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানো। এই পদ্ধতি যে কোন respiratory insufficiency-তে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। এতে হাতের সাহায্যে reser-

voir ব্যাগে প্রেশার দিয়ে রোগীর শ্বাসকার্য চালানো হয়। Endotracheal intubation-এর প্রয়োগপদ্ধতি দ্বাদশ অধ্যায়ে সবিশেষ বলা হয়েছে।

অনেক সময় tracheostomy করার দরকার হয়। সেই ক্ষেত্রে cuffed tracheostomy টিউব পরিয়ে Boyle apparatus-এর সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানো হয়। Tracheostomy কী কারণে করা হয়, কেমন ভাবে করা হয়, এর সুবিধা এবং অসুবিধা সব জানতে হলে ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনেক দিন ধরে কৃত্রিম শ্বাসকার্য (artificial ventilation) দিতে হলে mechanical ventilator-এর সাহায্য নেওয়া দরকার। কৃত্রিম শ্বাসকার্যের সব পদ্ধতিই রোগীর respiratory এবং cardiovascular physiology কিছু না কিছু পরিবর্তন করে, বিশেষতঃ যখন বহুদিন ধরে ব্যবহার করা হয়। এই সব ক্ষেত্রে একটি আদর্শ ventilator ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, কেননা এই ventilator-এর উপর রোগীর অনেক কিছু নির্ভর করে। Ventilator সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়

কৃত্রিম পদ্ধতিতে খাদ্য প্রয়োগ

রোগী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কিছু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং অনেক সময় চিকিৎসকের পরামর্শেই রোগীকে মুখ দিয়ে খেতে দেওয়া হয় না। সে সময় জীবনধারণের জন্য রোগীকে খাদ্য দিতে গেলে তা কৃত্রিম ভাবেই (artificial alimentation) দিতে হবে।

মুখ দিয়ে খাদ্য খাওয়ার তুলনা হয় না। এর মত সহজ নিরাপদ পদ্ধতি নেই। এতে রোগী খাদ্যের স্বাদে গন্ধে আকৃষ্ট হয়—এর মত কম খরচে খাদ্য অন্য পদ্ধতিতে দেওয়া যায় না। বস্তুত পক্ষে শিরাপথে (intravenous) খাদ্য দেওয়া ঠিক স্বাভাবিক নয়। এতে অনেক সময় বিপদও হতে পারে—খরচও অত্যন্ত বেশী। এতে খাদ্য gastrointestinal tract এবং লিভারকে এড়িয়ে গিয়ে সোজাপথে রক্তে চলে আসে। সুতরাং যতই সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে শিরাপথে খাদ্য দেওয়া হোক না কেন, তা কোন মতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। খাদ্য পরিপাকে, তার ক্রিয়াবিক্রিয়ায় লিভার, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের যথেষ্ট অবদান থাকে।

কিন্তু যখন রোগীকে মুখ দিয়ে খেতে দেওয়া সম্ভব নয় তখন কৃত্রিম উপায় ছাড়া গতি নেই। সাধারণ রোগীর পাকস্থলীতে Ryle's tube পরিয়ে খাদ্য দেওয়া হয়—তাকে বলে tube feeding। এই পদ্ধতিও যখন প্রয়োগ করা যায় না তখন শিরাপথে parenteral feeding দেওয়া হয়। আগে আরও কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো—যেমন rectal, intrasternal বা subcutaneous infusion কিন্তু এগুলির বেশী কুফল থাকার জন্য এখন মোটেই ব্যবহার হয় না। এ সবে রোগীর ব্যথা হতে পারে, প্রদাহ এবং allergic reaction হতে পারে, উপরন্তু খাদ্য ভালোভাবে শোষণও হয় না।

কৃত্রিমভাবে খাদ্য প্রয়োগ সাধারণতঃ এই সব রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য : যে সব রোগী অনেকদিন অজ্ঞান অচৈতন্য থাকে—যেমন বারবিচুরেট বা অন্য ধরণের বিষক্রিয়ায়, head injuryতে ; সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যাওয়া রোগীর ক্ষেত্রে, অত্যধিক বমি হতে থাকলে, অন্ত্রের অপারেশনের পর। যে সব

ক্ষেত্রে রোগী খেতে পারে না যেমন—খাদ্যনালীতে ক্যানসার ইত্যাদি। পলিনিউরাইটিশ পোলিওমাইলাইটিশ ইত্যাদি রোগীর বিশেষ ক্ষেত্রে রোগী মুখ দিয়ে খেলে শ্বাসনালীতে aspiration হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাদেরও কৃত্রিমভাবে খাওয়ালে ভালো হয়। Anorexia nervosa ইত্যাদি রোগীর খাওয়ার ইচ্ছাই থাকে না অনেক সময় তাদেরও কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ানোর দরকার হয়।

খাদ্যের প্রকারভেদ এবং তাদের গুণাগুণ :

সাধারণভাবে একটি পূর্ণবয়স্ক লোকের শরীরে স্বাভাবিক তাপ উৎপাদনের জন্য তিনটি জিনিসের দরকার—শর্করাজাতীয় খাদ্য, আমিষজাতীয় খাদ্য এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য। তাছাড়াও প্রচুর পরিমাণ জলেরও দরকার। ভিটামিন এবং খনিজ লবণজাতীয় পদার্থেরও প্রয়োজন আছে—এরা যদিও তাপ উৎপাদন করে না তবুও এদের বাদ দিয়ে শরীর ধারণ অসম্ভব।

একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে দৈনিক তার ওজনের প্রতি কিলোগ্রাম পিছু ২৫ থেকে ৩০ ক্যালোরি দরকার হয় সুতরাং ৭০ কে. জি. লোকের ক্ষেত্রে ১৭৫০ থেকে ২১০০ ক্যালোরি দরকার। এই ক্যালোরি তাকে খাদ্য থেকেই সংগ্রহ করতে হয়।

এক গ্রাম শর্করাজাতীয় খাদ্য শরীরে ৪ ক্যালোরি তাপ দেয়, এক গ্রাম আমিষজাতীয় খাদ্য ৪ ক্যালোরি এবং এক গ্রাম স্নেহজাতীয় খাদ্য ৯ ক্যালোরি তাপ দিতে পারে। অ্যালকোহল প্রতি গ্রামে ৭ ক্যালোরি তাপ দেয়।

একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন শর্করাজাতীয় খাদ্য ২ গ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে, আমিষজাতীয় খাদ্য ১ গ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য ২ গ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে পাওয়া উচিত। এতেই তার তাপের প্রয়োজন মিটবে। জল সাধারণতঃ দৈনিক ২৫ থেকে ৩০ মি. লি. প্রতি কে. জি. হিসাবে মোট ১৭৫০ থেকে ২৫০০ মি. লি. লাগে।

লবণজাতীয় খনিজ পদার্থের দরকার দৈনিক প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের অনুপাতে এই রকম : সোডিয়াম ১থেকে ২·৫ mEq., পটাশিয়াম ০·৭ থেকে ০·৮ mEq , ক্লোরাইড ১ থেকে ২·৫ mEq , ক্যালসিয়াম ৫ থেকে ১৫ মি. গ্রা. , ম্যাগনেশিয়াম ১ থেকে ৬ মি. গ্রা. , ফসফরাস ১৫ থেকে ৪৭ মি. গ্রা. , লোহা ০·১৪ থেকে১·৪ মি. গ্রা. , তামা ৪২ থেকে ৫৬ মাইক্রোগ্রাম , ম্যাঙ্গানীজ ২৮ মাইক্রোগ্রাম , কোবাল্ট ৭ থেকে ১৪ মাইক্রোগ্রাম , জিংক ২৭ মাইক্রোগ্রাম ; আয়োডিন ৮ মাইক্রোগ্রাম।

দৈনিক প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের হিসাবে ভিটামিনের দরকার এই রকম : ভিটামিন A, ৫০০ থেকে ৮০০ ইউনিট ; ভিটামিন D, ৪০ থেকে ৫০ ইউনিট ; ভিটামিন K, ২ থেকে ৩ মি. গ্রা.; ভিটামিন E, ৩ থেক ৬ মি. গ্রা.; ভিটামিন C, ২ থেকে ৪ মি. গ্রা. থায়ামিন ০·২৫ মি. গ্রা. ; রাইবোফ্লেভিন ০·১ থেকে ·১৫ ; নিয়াসিনামাইড ১ থেকে ১·৫ মি. গ্রা. ; পাইরিডক্সিন ০·১ থেকে ০·১৫ মি. গ্রা. ; প্যান্টোথেনল, ০·০৮ থেকে ০·১৫ মি. গ্রা. ; ভিটামিন B_{12}, ০·০৬ থেকে ০·৭ মাইক্রোগ্রাম ; ফলিকএসিড ৩৫ মাইক্রোগ্রাম ; বায়োটিন ২·০ থেকে ৩·৫ মাইক্রোগ্রাম।

এইসব খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী মায়েদের ক্ষেত্রে, ভারী অসুখ, জ্বর এবং thyrotoxicosis থাকলে এগুলি বেশী পরিমাণে দেওয়া দরকার।

একজন মানুষ যদি কোন খাদ্য না খায় এবং পূর্ণ বিশ্রামে থাকে তবে দৈনিক ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজন কমে যায়। কেননা শরীর থেকে কিছু শারীরিক পরিশ্রম করার জন্য, কিছু বিপাক বা metabolism-এর জন্য এবং শরীরের amino acid থেকে protein synthesis করার জন্য শক্তি ব্যয় হতেই থাকে। এই energy demand আরও বেড়ে যায় অপারেশন, injury, জ্বর এবং sepsis-এ, কিন্তু শর্করাজাতীয়, আমিষজাতীয় এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের catabolism হয়ে এই demand মেটাবার চেষ্টা হয়।

আমাদের শরীরে এই ইন্ধন সংরক্ষণ (fuel reserve) খুব একটা বেশী নেই। একটি পূর্ণবয়স্ক ৭০ কে. জি. মানুষের ক্ষেত্রে লিভার গ্লাইকোজেন থাকে ৭৫ গ্রাম, মাংসপেশীতে গ্লাইকোজেন ১৫০ গ্রাম, প্রোটিন (মাংস) ৬০০০ গ্রাম, চর্বি বা adipose tissue ১৫০০০ গ্রাম। দেহ তরল বা body fluid-এ গ্লুকোজ থাকে ২০ গ্রাম, plasma fatty acid ০·৩ গ্রাম, plasma triglycerides ৩ গ্রাম। অনশন বা starvation-এ লিভার গ্লাইকোজেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

রোগীর পুষ্টি বা nutritional support-এর দরকার হলে প্রথমে রোগীর tube feeding-এর কথাই চিন্তা করতে হবে। পরে একান্ত দরকারেই শিরাপথে feeding দেওয়া হয়। রোগীকে আগে থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। রোগীর বয়স, ওজন, রোগের ইতিহাস ঠিকমত জানতে হবে। রোগীর কোন gastrointestinal disease আছে কিনা দেখতে হবে। দরকার মত ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে হবে। রোগীর খাদ্য ঠিকমত

সুষম ক'রে তবেই দিতে হবে। এই কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য প্রয়োগ করার সময় রোগীকে ঠিকমত monitor করতে হবে। খাদ্যের সংগে ঠিকমত fluid balance-এর দিকে নজর দিতে হবে। রক্তে এবং প্রস্রাবে electrolyte control করা দরকার। Acid base ঠিক রাখাও অবশ্য কর্তব্য। প্রতিদিন রোগীর ওজন নেওয়া উচিত।

Tube Feeding :

কৃত্রিমভাবে খাদ্য খাওয়ানোর এটি একটি সুপরিচিত পদ্ধতি। সাধারণতঃ রোগী যখন বিষক্রিয়া বা head injury-তে অচৈতন্য থাকে, অপারেশনের পরে যখন রোগীকে মুখ দিয়ে খাওয়ানো চলে না বিশেষতঃ যখন রোগী মুখ দিয়ে খেতে পারে না, মুখের অপারেশনের পরে এই tube feeding দেওয়া যেতে পারে। শিরাপথে feeding দেওয়ার বদলে অথবা তার সংগে টিউব দিয়ে feeding দেওয়া যায়।

এই পদ্ধতিতে রবার বা পলিথিনের তৈরী Ryle's টিউব নাকের মধ্য দিয়ে পাকস্থলী বা ক্ষুদ্র অন্ত্র (small intestine) পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং এটি ঐ অবস্থায় বহুদিন রাখা যায়। এই Ryle's টিউব পরানো খুব একটা কঠিন কাজ নয়, তবে ঠিকমত জায়গায় এটি ঠিক আছে কিনা তা দেখা দরকার। একটি সিরিঞ্জ দিয়ে টানলে বা suction করলে পাকস্থলীর রস বেরিয়ে আসবে অথবা অল্প বাতাস সিরিঞ্জ দিয়ে পাকস্থলীতে দিলে stethoscope দিয়ে বাতাস যাওয়ার শব্দ শোনা যাবে—এই ভাবেই টিউবের যথার্থ position নিরূপণ করা হয়। এই টিউবটি এমন জিনিস দিয়ে তৈরী হওয়া উচিত যাতে খাদ্যনালী বা পাকস্থলীতে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া করতে না পারে। টিউবটি ব্যবহার করার আগে বীজাণুমুক্ত করা উচিত এবং সাবধানে রোগীকে পরানো উচিত। রোগীর মুখের যত্ন নেওয়া উচিত, ভালোভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত। পাকস্থলী ছাড়াও অনেক সময় টিউবটি upper small intestine-এ দেওয়া হয়—এতে regurgitation হওয়ার আশংকা কমে। তবে টিউবটি duodenum-এ রাখা অধিকতর যুক্তিসংগত, কেননা এখানে শোষণক্রিয়া মোটামুটি শতকরা ৯০ ভাগ ভালোভাবে হয়।

এই পদ্ধতিতে যে খাদ্য দেওয়া হবে তাতে শর্করা, স্নেহ এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য নির্ধারিত মাত্রায় থাকতে হবে যেন রোগী পর্যাপ্ত ক্যালোরি পায়। জল,

লবণজাতীয় খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিনও পরিমাণ মত থাকা দরকার। মোটামুটি সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে তরল খাদ্যই দেওয়া হয়। সুতরাং যে সব খাদ্য দেওয়া হবে তা যেন ভাল দ্রবণীয় এবং সমজাতীয় বা homogenous হয়। এই খাদ্য যেন বীজাণুমুক্ত হয়। অল্প পরিমাণে যেন যথেষ্ট ক্যালোরি দিতে পারে। এই খাদ্য খুব ঘন হলে Ryle's tube দিয়ে ভালোভাবে যাবে না, আবার অনেক সময় টিউব বন্ধ করে দিতেও পারে। সাধারণতঃ পাউডার দুধ, ডিম, চিনি, গ্লুকোজ, ঘি জাতীয় পদার্থ, ফলের রস, মল্ট ইত্যাদি দেওয়া হয়। অল্প ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ এর সংগে দেওয়া হয়। ডিম এবং পাউডার দুধ এই tube feeding-এ খুবই ভালো কেননা এদের biological utility খুব বেশী। চর্বি, ঘি বা ভেজিটেবল তেল খুব বেশী দেওয়া উচিত নয়, কেননা এগুলি হজম হওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। মোট ক্যালোরির শতকরা ৩৫ ভাগের বেশী এই ঘি জাতীয় পদার্থ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। Methyl cellulose অনেক সময় roughage হিসাবে দেওয়া হয়। এতে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় হওয়ার আশংকা কমে।

এই সব খাবার অনেকক্ষণ তৈরী করা থাকলে জীবাণু জন্মাতে পারে। সুতরাং এগুলি সব সময় refriegerator-এ রাখা উচিত। কিন্তু রোগীকে খাওয়ানোর সময় এই খাবার রোগীর দেহের তাপমাত্রার কাছাকাছি নিয়ে আসা উচিত। সাধারণভাবে পরিমাণে কম খাবার ১৫০ থেকে ২০০ মি. লি. ২ থেকে ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেওয়া যেতে পারে। রোগী অজ্ঞান অচৈতন্য থাকলে বা tracheostomy করা থাকলে রোগীর শয্যার মাথার দিক খানিকটা অন্ততঃ ৩০ মিনিট উঁচু করে রাখা উচিত যাতে রোগীর regurgitation না হয়। খাবার দেওয়ার পর একটু জল দেওয়া দরকার যাতে টিউবটি বন্ধ না হয়ে যায়। কিন্তু যেন অনেক বাতাস পাকস্থলীতে না যায়। অনেক সময় drip method-এ এই tube feeding দেওয়া হয়।

অনেক দিন ধরে tube feeding দিলে কিছু উপসর্গ হতে পারে। এতে pharynx এবং oesophagus-এর mucous membrane-এ প্রদাহ, ক্ষত এবং এমন কি পচন পর্যন্ত করতে পারে। এমন কি অনেক সময় larynx পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। সুতরাং সপ্তাহে অন্ততঃ ২ বার এই টিউব পরিবর্তন করা দরকার এবং মাঝে মাঝেই গলা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

এ ছাড়াও tube feeding-এর কিছু অসুবিধা হতে পারে। এতে

regurgitation হতে পারে। তাই প্রতিরোধের জন্য রোগীকে খাবার দেওয়ার আগে Ryle's টিউব একটু suction করে নেওয়া উচিত এবং রোগীর মাথার দিক অল্প উঁচু করে রাখা উচিত। রোগীর খাবারে যদি roughage না দেওয়া হয় রোগীর কোষ্ঠ কাঠিন্য ঘটে। রোগীর কোন কারণে রক্তে পটাশিয়াম যদি কমে যায় তবে intestinal motility-ও কমে এবং এর ফলেও কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। টিউব feeding-এর পর রোগীর উদরাময় হতেও দেখা যায়। এটি বীজাণুযুক্ত খাবারের জন্য হতে পারে। অত্যধিক স্নেহজাতীয় বা শর্করাজাতীয় খাবার দেওয়ার জন্যও হতে পারে। Enteritis হলেও উদরাময় হবে। এটি সাধারণতঃ অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহারের ফলে mycotic infection-এর জন্য হয়। এমতাবস্থায় antimycotic ওষুধ দেওয়া দরকার। সব থেকে বিপজ্জনক উপসর্গ হলো hypertonic dehydration। এটি hyperosmolar tube feeding-এর জন্য হয়। এতে রোগীর শরীরে লবণ-জাতীয় খনিজ পদার্থ অত্যন্ত বেশী হয়ে যায় এবং রোগীর azotaemia থাকে। এটি সাধারণতঃ head injury রোগীর ক্ষেত্রেই বেশী ঘটে। এক্ষেত্রে রোগীকে প্রথমদিকে শিরাপথে feeding দেওয়া দরকার এবং পরে তার সংগেই টিউব দিয়ে feeding করা যেতে পারে। এই সব রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া উচিত।

বহুদিন ধরে টিউব feeding দেওয়া হলে পাকস্থলী এবং অন্ত্রে ক্ষয় (erosion) এবং ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। Steroid, digitalis বা পটাশিয়াম ওষুধ tube feeding-এ না দেওয়াই উচিত। প্রয়োজন বোধে অন্যভাবে যেমন শিরাপথে দিতে হবে।

Parenteral feeding :

রোগী যখন মুখ দিয়ে খেতে পারে না, টিউব দিয়ে খাওয়ানোরও যখন অসুবিধা থাকে তখন শিরাপথেই রোগীকে খাদ্য দিতে হবে। এই পদ্ধতি খুবই প্রচলিত। এই পদ্ধতিতেও রোগীর মান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শর্করা, আমিষ এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। জল, লবণ জাতীয় খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিনও অবশ্যই দিতে হবে। তবে এখানে এই সব খাদ্য খুবই সতর্কতার সংগে দিতে হবে কেননা খাদ্য একেবারেই শিরাপথে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। রোগীর অন্ত্রে এবং লিভারে এই সব খাদ্যের শোষণ এবং প্রাথমিক বিপাক (metabolism) ঘটে না।

আমিষজাতীয় খাদ্য বা প্রোটীন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। রোগীর খাদ্যতালিকায় যদি পর্যাপ্ত প্রোটীন না থাকে অথবা যদি রোগীর দেহ থেকে প্রোটীন বা amino acid অত্যধিক ক্ষয় হয় তবে খুব তাড়াতাড়ি রোগীর negative nitrogen balance ঘটে। অত্যধিক দেহের তাপবৃদ্ধি ঘটলে, বীজাণু সংক্রমণ থাকলে শরীরের প্রোটীন catabolism বেড়ে যায়। অপারেশনের পরে, injury হলেও প্রোটীন catabolism বেড়ে যায়। এই প্রোটীনের ক্ষয়ক্ষতি হতেই থাকলে অনেক ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। এতে শরীরে অ্যান্টিবডি ঠিকমত তৈরী হতে পারে না, রক্তকণিকা এবং জীবকোষ ঠিকমত regenerate করতে পারে না, ক্ষত আরোগ্য ভালোভাবে হয় না, হর্মোন এবং এনজাইম ভালো তৈরী (synthesis) হয় না, রোগীর শরীরে শোথ (oedema) হতে পারে এবং coagulation defect-ও হতে পারে। সুতরাং রোগীকে এমতাবস্থায় প্রোটীন দিতেই হবে।

শিরাপথে প্রোটীন দেওয়ার জন্য যেগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি সাধারণতঃ রক্ত, প্লাজমা, এবং এলবুমিন (albumin)। এছাড়াও protein hydrolysate এবং crystalline aminoacid mixture ব্যবহার করা হয়। Protein hydrolysate অনেক রকমের হয়, তবে এদের মধ্যে casein hydrolysate খুব বেশী ব্যবহার করা হয়। এর pH মোটামুটি কম এবং সোডিয়াম বেশী থাকে। ১ গ্রাম protein hydrolysate মোটামুটি ০·৭৫ গ্রাম প্রোটীনের সমতুল্য। Crystalline aminoacid mixture যদি দেওয়া হয় তবে সবরকম amino acid-এর পরিমাণ ঠিক মত হওয়া উচিত এবং essential এবং non-essential amino acid-এর অনুপাত ঠিক রাখা উচিত। এর laevo isomerগুলিই biologically active। Dextro isomer বেশীর ভাগ প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যায় এবং এটি প্রস্রাব বাড়াতে (osmotic diuresis) সাহায্য করে। Amino acid solution খুব সতর্কতার সংগে ব্যবহার করা উচিত বিশেষতঃ যাদের করোনারী (coronary) এবং কিডনীর অসুখ আছে। যাদের acidosis এবং hypokalaemia আছে তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রোটীনের ভালো synthesis-এর জন্য এবং catabolism রোধ করার জন্য রোগীকে anabolic steroid দেওয়া যেতে পারে এবং এর সংগে শর্করা জাতীয় খাদ্যও দিতে হবে। অপারেশনের পরে প্রথম দিকে প্রোটীন catabolism

অবশ্যম্ভাবী সুতরাং সে সময় বাইরে থেকে বেশ প্রোটীন দিয়ে কাজ হয় না। ক্যালোরি সমতা ঠিক হলেই রোগীকে প্রোটীন দেওয়া উচিত।

ক্যালোরি জোগানোর জন্য সবচেয়ে ভালো শর্করা জাতীয় খাদ্য। এটি অনেক ভাবে দেওয়া যেতে পারে। যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, ল্যাকটোজ, ইনভার্ট সুগার, সর্বিটল, গ্লিসেরল, ডেক্সট্রান ইত্যাদি। গ্লুকোজ খুব বেশী ব্যবহার করা হয় এবং এটি প্রতি গ্রামে ৪ ক্যালোরি যোগায়। অনশনে বা fasting অবস্থায়—যেমন রোগীর অপারেশনের পর রোগীর গ্লুকোজ tolerance কমে যায় এবং প্রস্রাবের সংগে গ্লুকোজ বেরিয়ে যায়। সেই জন্য প্রতি ৫০ গ্রাম গ্লুকোজ শিরাপথে দিলে সংগে ১২ থেকে ১৬ ইউনিট ইনসুলিন (insulin) দেওয়া দরকার। এতে glucose retention-এ সুবিধা হয়। ইনসুলিন দিলে aminoacid শোষণে সুবিধা হয়, triglyceride তৈরী হতে সুবিধা হয় এবং free fatty acid শোষণ ভাল হয়।

Fructose শিরাপথে দিলে ইনসুলিন ছাড়াই বিপাক হয়। এটি গ্লুকোজের চেয়ে তাড়াতাড়ি শরীরে কার্যকরী হয়। Fructose দিলে আরও কয়েকটি সুবিধা আছে—এটিতে প্রস্রাবের পরিমাণ কম হয়, hyperglycaemia-র ঘটনা কমে এবং তাড়াতাড়ি গ্লাইকোজেন হতে পারে। তবে কিছুটা laevulose কখনও কখনও গ্লুকোজে রূপান্তরিত হতে পারে—তখনও ইনসুলিন দিতে হতে পারে। Invert sugar শিরাপথে দিলে কখনও অত্যধিক glycosuria করে না। Sorbitol মাঝে মঝে amino acid solution-এর সংগে দেওয়া হয়। Fat solution এর সংগে অনেক সময় গ্লিসেরল (glycerol) দেওয়া হয়। গ্লিসেরল গ্লুকোজের মতই ক্যালোরি দেয়। তবে অত্যধিক দিলে রক্তকণিকা ভেঙে যায় এবং মাংসপেশীর টান (muscle cramp) হতে পারে। ইথাইল অ্যালকোহল প্রতি গ্রামে ৭ ক্যালোরি জোগায় এবং এটি রোগী ভালো সহ্যও করতে পারে, তবে এটি অন্যান্য উপসর্গের জন্য পুষ্টি জোগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবহার করা হয় না।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য শরীরের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। এটি অল্প পরিমাণে অনেক ক্যালোরি যোগায়। ১ গ্রামে ৯ ক্যালোরি পাওয়া যায়। শরীরের মোট ক্যালোরির শতকরা ৪০ ভাগ স্নেহজাতীয় খাদ্য থেকেই আসা উচিত। Fat emulsion-এর কোন osmotic effect নেই, তাই এটি শিরাপথে ভালোভাবে

দেওয়া যায় এবং এর শরীরে ব্যবহারও ভাল হয়। এটি প্রস্রাবে এবং মলে নির্গমন (excretion) হয় না।

Fat emulsion খুব সতর্ককার সংগে তৈরী করা দরকার নতুবা embolism হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Fat-এর কণাগুলি সাধারণতঃ ০'৫ থেকে ১ μ ব্যাসের হওয়া দরকার। Fat emulsion সব সময় রক্তের সংগে isotonic হওয়া দরকার এবং তার জন্য গ্লুকোজ, গ্লিসারিন বা সর্বিটল (sorbitol) এর সংগে ব্যবহার করা হয় emulsifying agent হিসাবে।

Fat emulsion খুব তাড়াতাড়ি শিরাপথে দিলে নাড়ীর গতি দ্রুত হতে পারে, রক্তচাপ কমে যেতে পারে। রোগীর shock হতে পারে। রোগীর শ্বাসকষ্ট, cyanosis, বমি, জ্বর, urticaria ইত্যাদিও হতে পারে। বিলম্বিত উপসর্গ (delayed effect) হিসাবে hyperlipaemia, hepato-splenomegaly, রক্তাল্পতা, coagulation defect, fat pigmentation ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

Fat emulsion সাধারণতঃ খুব খারাপ ধরনের malabsorption syndrome-এ—fistula, enteritis, colitis—এইসব ক্ষেত্রে, সাংঘাতিক ভাবে পুড়ে যাওয়া রোগীর ক্ষেত্রে, অনেক দিন অচৈতন্য অবস্থায় থাকলে—যেখানে high calorie deficiency আছে—সেই সব ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। তবে যেসব রোগীর ক্ষেত্রে hyperlipaemia আছে, diabetes, nephrotic syndrome, kidney damage বা coagulation defect আছে তাদের ক্ষেত্রে কখনোই fat emulsion দেওয়া উচিত নয়। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয় না কেননা এটি গর্ভপাত করাতে পারে।

সাধারণতঃ soya bean oil এবং cotton seed oil ব্যবহার করা হয়। Soyabean oil একটি ১০ থেকে ২০% emulsion এবং এতে egg yolk phosphatide emulsifier হিসাবে ব্যবহার হয় এবং গ্লিসেরল (glycerol) দিয়ে isotonic করা হয়। Cotton seed oil soya lecithin দিয়ে emulsify করা হয় এবং sorbitol দিয়ে isotonic করা হয়। Fat emulsion প্রতিদিন ২ গ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে দেওয়া যেতে পারে—এর বেশী কখনই দেওয়া উচিত নয়। অনেক সময় fat emulsion-এর সংগে heparin (২'৫ ইউনিট প্রতি মিলিলিটার emulsion-এর জন্য) দেওয়া হয়। এতে

রোগীর hypercoagulation প্রতিরোধে সাহায্য হয় এবং এতে fat clearance-ও ভালো হয়।

খুব অল্প সময়ের জন্য শিরাপথে feeding দিতে হলে subcutaneous vein ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অনেক দিন দিতে হলে একটি পলিথিন ক্যাথেটার superior venacava অথবা inferior venacava পর্যন্ত পাঠানো দরকার। সাধারণতঃ basilic অথবা external jugular vein হয়ে superior venacava পর্যন্ত যাওয়া হয়। যদি solution বেশী osmolarity-র এবং বেশী pH-এর হয় তবে thrombophlebitis হওয়ার আশংকা বেশী থাকে। সেই জন্য মাঝে মাঝেই এক শিরা থেকে অন্য শিরায় infusion দেওয়া উচিত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

রক্ত সঞ্চালন

(Blood transfusion)

এক মানুষের রক্ত আর একজনকে দেওয়ার প্রচেষ্টা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড লোয়ার সর্বপ্রথম মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহে এই ভাবে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবহার করেন। তবে মানুষের রক্ত মানুষের দেহে সর্বপ্রথম সঞ্চালন করেন ব্লাণ্ডেল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। উইলিয়াম হার্ভে শরীরের রক্ত প্রবাহের (blood circulation) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তখনও রক্ত কী ভাবে দেওয়া উচিত, রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই বা কী হতে পারে—এই সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ছিল না। তখনকার সময়ে রক্ত-সঞ্চালনের বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না, সুতরাং রক্ত-সঞ্চালনের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এমন কি মৃত্যুর ঘটনা খুবই বেশী ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডষ্টিনার প্রত্যক্ষ করলেন যে মানুষের রক্তের বিভিন্ন শ্রেণী আছে—এটিই বিখ্যাত A B O system নামে বহুল প্রচারিত। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডষ্টিনার এবং উইনার আর একটি Rh system-এর প্রবর্তন করেন। এছাড়াও মানুষের রক্তের আরও অনেক শ্রেণীবিভাগ হয়েছে। তবে দৈনন্দিন রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এই A B O system এবং Rh system—এই দুটিই বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়। আধুনিক কালে এই রক্ত সঞ্চালন যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই করা হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং কুশলী চিকিৎসকের পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানে রক্ত সঞ্চালন এখন অনেক বেশী নিরাপদ এবং সহজসাধ্য। যথার্থ প্রয়োজনে রোগীকে রক্ত সঞ্চালন করে অনেক সময় অনেক রোগীর পুনরুজ্জীবন ঘটে।

এ বি ও পদ্ধতি (ABO system):

এই শ্রেণীবিন্যাসে মোট ৪ রকমের রক্ত হতে পারে—O, A, B, এবং AB। O শ্রেণীর রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টি-A ও অ্যান্টি-B—দুই অ্যান্টিবডিই থাকে। A শ্রেণীর রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টি-B এবং B শ্রেণীর রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টি-A অ্যান্টিবডি থাকে। সেইমত AB রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টি-A বা অ্যান্টি-B—কোন

অ্যান্টিবডিই থাকে না। সাধারণ ভাবে বলা হয়, রোগীর রক্ত যদি AB শ্রেণীর হয় তবে যে কোন শ্রেণীর রক্ত সে নিতে পারে (universal recipient) আর O শ্রেণীর রক্তের লোক যে কোন শ্রেণীর রোগীকে রক্ত দিতে পারে (universal donor)।

অ্যান্টি-A এবং অ্যান্টি-B অ্যান্টিবডিগুলি এমনিতেই শরীরে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে পরোক্ষভাবে মায়ের কাছ থেকে পায়। তবে তিন থেকে ছয় মাসের পর তারা নিজেরাই নিজেদের অ্যান্টিবডি তৈরী করতে পারে। এরা কিভাবে সঠিক অ্যান্টিজেন না থাকা সত্ত্বেও এই অ্যান্টিবডি তৈরী করে তা সঠিক জানা যায় নি।

রেসাস পদ্ধতি (Rhesus System)

এই রক্তের শ্রেণীবিন্যাসে বেশ জটিলতা আছে। তবে সহজভাবে ধরা যায় যে এতে ৬টি অ্যান্টিজেন থাকতে পারে—যেমন C, D, E এবং c, d, e। সাধারণতঃ Rh পজিটিভ বা নেগেটিভ ধরা হয় যখন D অ্যান্টিজেন রক্তে আছে অথবা নেই। শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ লোকের রক্তকণিকায় D অ্যান্টিজেন থাকে, সুতরাং তারা Rh পজিটিভ। বাকী অন্যরা Rh নেগেটিভ। যদি Rh পজিটিভ রক্ত কোন Rh নেগেটিভ রোগীকে সঞ্চালন করা হয়, সেক্ষেত্রে গ্রহীতার রক্তে অ্যান্টি D তৈরী হয় এবং পরবর্তী Rh পজিটিভ রক্ত সঞ্চালনে নানা রকমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটি Rh নেগেটিভ গর্ভবতী মায়ের যদি গর্ভস্থ সন্তান Rh পজিটিভ হয়, তবে সেক্ষেত্রেও এই দুই অসম শ্রেণীর রক্তের প্রভাবে অ্যান্টি-D তৈরী হয় এবং এতে গর্ভস্থ শিশু খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

যদিও প্রধানতঃ D ফ্যাকটরই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি তৈরী করে তবে অন্য Rh অ্যান্টিজেনও তা করতে পারে এবং অনেক সময়েই এতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। একই সংগে অ্যান্টি-C, অ্যান্টি-D এবং অ্যান্টি-E থাকতে পারে। গ্রহীতা বা রোগীর ক্ষেত্রে শুধু D অ্যান্টিজেন আছে কিংবা নেই সেটি নির্ণয় করেই সাধারনতঃ তার Rh ফ্যাকটর নিরূপণ করা হয়। তবে রক্তদাতার ক্ষেত্রে তাদের D ফ্যাকটর ছাড়াও C এবং E অ্যান্টিজেন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা দরকার। একমাত্র সেই প্রকৃতপক্ষে Rh নেগেটিভ যার রক্তে C, D এবং

E অ্যান্টিজেন নেই। Rh অ্যান্টিজেন বিশেষভাবে রক্তের লোহিতকণিকার মধ্যেই থাকে, শ্বেতকণিকা বা অন্য কিছুতে এর বিশেষ অস্তিত্ব নেই।

এই A B O system এবং Rh system ছাড়াও অনেক পদ্ধতিতে রক্তকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তবে তাদের বাস্তব ব্যবহার খুবই সীমিত।

যাই হোক, রক্তসঞ্চালনের সময় দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই রক্তের শ্রেণী বিচার-বিবেচনা করা উচিত এবং cross matching test করা উচিত। এই পরীক্ষায় গ্রহীতার রক্তের সিরাম এবং দাতার রক্তকণিকার অ্যান্টিবডি মেশানো হয় এবং ভালোভাবে দেখা হয় কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিনা। যদি গ্রহীতার রক্তের সিরামে অ্যান্টিবডি থাকে তবে ছানা কাটার মত agglutination হবে এবং সে ক্ষেত্রে সে রক্ত রক্তসঞ্চালনের জন্য উপযুক্ত নয়।

রক্তগ্রহণ এবং রক্ত সংরক্ষণ :

সাধারণভাবে রক্তদাতার বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যেই হওয়া উচিত। তবে আমাদের দেশে ৫৫ বছরের বেশী রক্তদাতার বয়স হলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। রক্তগ্রহণের আগে রক্তদাতার সাধারণ স্বাস্থ্য ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। রোগীর রক্তাল্পতা থাকলে, ভাইরাল হেপাটাইটিশ (viral hepatitis), ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যৌনব্যাধি বা কোন রকমের সাংঘাতিক এলার্জির অসুখ থাকলে সেই দাতার রক্তগ্রহণ না করাই শ্রেয়। যক্ষ্মা বা ক্যানসার রোগীর রক্ত নেওয়া হয় না। রক্তদাতার হিমোগ্লোবিন অন্ততপক্ষে শতকরা ৮৫ ভাগ থাকা উচিত।

একথা অবধারিত সত্য, আমাদের দেশে একেক বারে যে ২৫০ থেকে ৩০০ মিলিলিটার রক্ত দাতার শরীর থেকে নেওয়া হয়, সাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকারী কোন মানুষের পক্ষেই তা ক্ষতিকর নয়। তবে রক্ত দানের পরই অধিক শ্রম করা উচিত নয়, অন্ততপক্ষে কাজে যাওয়ার আগে এক রাত্রি পূর্ণ-বিশ্রাম অত্যন্ত প্রয়োজন।

রক্ত নেওয়ার সময় রোগীকে বেশ আরামে চিৎ হয়ে শুতে দেওয়া হয়। রোগীর সাধারণতঃ বাম হাতের উপরিভাগে স্ফিগমো ম্যানোমিটারের কাফ (sphygmomanometer cuff) অথবা টুর্নিকেট ভালোভাবে বাঁধা হয়। তারপর কনুই-এর সামনের চামড়া ভালোভাবে আয়োডিন, স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে একটি ভালো শিরায় একটি নির্দিষ্ট ছুঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে অল্প লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ঐ জায়গায় দিয়ে নিলে ব্যথা কম হয়।

সাধারণভাবে কাচের বোতলে এই রক্ত রাখা হয়। এই বোতল এবং রক্ত নেওয়ার সরঞ্জাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগে থেকেই বীজাণুমুক্ত রাখা হয়। বোতলের ছিপির দিকটিও সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত হওয়া একান্ত দরকার এবং এখানেও আলাদা মোড়ক দেওয়া থাকে। একমাত্র ব্যবহারের আগেই সেই মোড়ক খুলে ফেলা হয়।

এই বোতলে রক্ত সংরক্ষণের জন্য preservative হিসাবে এসিড সাইট্রেট ডেক্সট্রোজ অথবা সাইট্রেট ফসফেট ডেক্সট্রোজ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে রক্ত ঠিক স্বাভাবিক তরল অবস্থায় থাকে এবং বেশ কিছুদিন মোটামুটি কার্যকরী অবস্থায় থাকে। ২ গ্রাম ডাইসোডিয়াম সাইট্রেট এবং ৩ গ্রাম ডেক্সট্রোজ ১২০ মিলিলিটার জলে মিশিয়ে এসিড সাইট্রেট ডেক্সট্রোজ তৈরী করা হয়। এটি বহুদিন থেকেই সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ব্যবহারে ২১ দিন সংরক্ষণের পরেও অন্ততঃ ৭৫ ভাগ লোহিত কণিকা ভালো থাকে। অবশ্য আধুনিককালে সাইট্রেট ফসফেট ডেক্সট্রোজ এবং সাইট্রেট ফসফেট ২ ডেক্সট্রোজ এডেনিন আরও সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই বোতলের ছিপিতে একটি দিকে বাতাস যাওয়া আসার জন্য একটি টিউব থাকে। অন্যটিতে রক্তদাতার শিরা থেকে রক্ত টিউব দিয়ে বাহিত হয়ে সোজাসুজি বোতলের মধ্যে আসে। স্ফিগমো ম্যানোমিটারের প্রেশার ২০ মিলিমিটার মার্কারীতে তুলে রাখলে রক্ত ভালোভাবে আসে। রক্তদাতা সেই হাতের মুঠি একটু খোলা এবং বন্ধ করলেও রক্তপ্রবাহ ভালো হয়।

যখন রক্ত নেওয়া শেষ হয় তখন পরে পরীক্ষার জন্য pilot স্যাম্পেল রক্ত রাখা হয়। এরপর দাতার শিরা থেকে সূচ বের ক'রে নিয়ে সেখানে ভালোভাবে অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং দেওয়া হয়।

রক্তের বোতল ভালোভাবে সীল (seal) ক'রে, নথিভুক্ত ক'রে এবং লেবেল ক'রে বিশেষভাবে তৈরী রেফ্রিজেরেটারে রাখা হয়। এখানে ৪° থেকে ৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষিত হয়।

প্লাসটিক ব্যাগেও রক্ত রাখা যায় এবং এতে রক্তের লোহিত কণিকা, অণুচক্রিকা এবং প্লাজমার সংরক্ষণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। তবে এতে যদি দৈবক্রমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে তবে রক্তের ক্ষতি করতে পারে। প্লাসটিক

ব্যাগ থেকে রোগীকে রক্ত সঞ্চালন করলে খুব বেশী air embolism হওয়ার সুযোগ থাকে না, কেননা এতে সহজ রক্তপ্রবাহের জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয় না।

রক্তসংরক্ষণের ফলে রক্তের কিছু পরিবর্তন হয়ই এবং সেই পরিবর্তন যতই দিন যায় ততই বাড়তে থাকে। Whole blood বর্তমানে ২১ থেকে ২৮ দিন সংরক্ষণ করা যায়। সাধারণতঃ শরীর থেকে রক্ত নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে দিলে তাকে fresh blood transfusion বা তাজা রক্তসঞ্চালন বলে। এতে রক্তের সব উপাদান অনেকাংশে বজায় থাকে।

সংরক্ষিত রক্তের লোহিত কণিকায় এডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP), পটাশিয়াম, ২-৩ ডাইফসফোগ্লিসারেট কমে যায়, লোহিত কণিকার অক্সিজেন পরিবহনের ক্ষমতা কমে যায়, দেখতেও অনেক গোলাকার হয়ে পড়ে। এই সংরক্ষিত রক্তের প্লাজমায় পটাশিয়াম এবং অ্যামোনিয়া অত্যন্ত বেড়ে যায়, সাইট্রেট এবং ল্যাকটিক এসিড বেড়ে যায়। এতে মুক্ত হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও বেড়ে যায়। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য Factor V এবং VII কমে যায়, এমন কি অনেক সময় থাকেই না। শ্বেতকণিকা এবং অণুচক্রিকা সংখ্যায় অনেক কমে যায়—তাদের কার্যক্ষমতাও অনেকাংশে নষ্ট হয়। সংরক্ষিত রক্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জমাট (microaggregates) দেখা যায়।

এই সবই গ্রহীতার শরীরে ক্ষতি করতে পারে অথবা রক্তসঞ্চালনের আশানুরূপ ফল না দিতে পারে। সংরক্ষিত রক্তের বোতলে সব সময় তার group, ক্রমানুপাতিক সংখ্যা, নষ্ট হওয়ার তারিখ (expiry date) দেওয়া থাকে। সেই তারিখের পর ঐ রক্ত কখনও রক্তসঞ্চালনের পক্ষে উপযুক্ত থাকে না এবং এটি ভুলক্রমে দিলে বিপজ্জনক হতে পারে এবং মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

মৃতব্যক্তির রক্ত বের করে নিয়ে সংরক্ষণ করা যায় এবং অন্য রোগীর দেহে সঞ্চালন করাও যায়। এ নিয়ে রাশিয়ায় সাফল্যজনকভাবে অনেক কাজ হয়েছে, অবশ্য এটি সব দেশে চালু পদ্ধতি নয়। যে সব রোগী হঠাৎ হার্টের অসুখে, ইলেকট্রিক শক্ ইত্যাদিতে হঠাৎ মারা যায়—তাদের মৃত্যুর ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে ২ থেকে ৪ লিটার রক্ত অনায়াসে বের করে নেওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় রক্ত তরলই থাকে—পরেও কোন anticoagulant ওষুধ preservative (সংরক্ষক) হিসাবে লাগে না। মৃত্যুর পরে fibrinolysis-এর জন্য রক্ত জমাট

বাঁধতে পারে না। এইভাবে সংগৃহীত রক্ত ৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা হয়, তবে ৫ দিনের মধ্যেই এর ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

এখন কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর রক্তসঞ্চালনের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। মোটামুটি নিম্নোক্ত কারণেই রক্ত সঞ্চালন করা হয়।

১। কোণ দুর্ঘটনায় আঘাত পেলে, অত্যধিক রক্তপাত ঘটলে, অপারেশনের সময়ে, আগুনে পুড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, রোগীর শরীরে মোট রক্তের পরিমাণ অনেক কমে যেতে পারে। সেই ঘাটতি মেটানোর জন্য রোগীকে রক্ত দেওয়া দরকার। একটি পূর্ণবয়স্ক সাধারণ স্বাস্থ্যের মানুষের ৪০০ থেকে ১০০০ মিলি-লিটার রক্তপাত ঘটলে রক্তছাড়া অন্য জলীয় পদার্থ, গ্লুকোজ সলিউশন, ডেক্সট্রান ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। তবে এর চেয়ে বেশী রক্তপাত ঘটলে এবং অল্প সময়ে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হলে তাকে রক্তের সাহায্যেই চিকিৎসা করা একান্ত কর্তব্য। অনেক সময় রক্তই রোগীর পুনরুজ্জীবন ঘটায়।

রোগীর রক্তের জলীয় ভাগ অত্যধিক কমে গেলে প্লাজমা দিয়েই তার চিকিৎসা করা যেতে পারে। বিশেষত: পুড়ে যাওয়া রোগীর ক্ষেত্রে এটি খুবই প্রযোজ্য।

২। রোগীর রক্তাল্পতা থাকলে অর্থাৎ রক্তে হিমোগ্লোবিন অত্যধিক কমে গেলে রক্ত সঞ্চালন ক'রে অনেক সময় তার চিকিৎসা করা হয়। অবশ্য লৌহ ঘটিত ওষুধ, ফলিক এসিড, ভিটামিন B_{12} এসব দিয়েও এর ভালো চিকিৎসা হয়। তবে এতে কাজ না হলে এবং খুব তাড়াতাড়ি সুফল পেতে হলে আলাদা ভাবে প্যাকড্ লোহিত কণিকা সঞ্চালন করার দরকার হয়। রোগীর রক্তাল্পতা যত বেশী হয় রক্ত-সঞ্চালন তত সতর্কতার সংগে করা উচিত। এদের রক্ত সঞ্চালনের ফলে রক্তপ্রবাহে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং তার ফলে congestive heart failure বা pulmonary oedema হতে পারে। রক্তাল্পতার অন্যান্য ক্ষেত্রে—যেমন acute haemolytic anaemia বা aplastic anaemiaতে রক্ত-সঞ্চালন অত্যন্ত জরুরী চিকিৎসা।

৩। রোগীর রক্তে শ্বেতকণিকার ঘাটতি হলে, অণুচক্রিকার ঘাটতি হলে, albumin, fibrinogen বা γ-globulin-এর ঘাটতি হলে অনেক সময় তাজা রক্ত সঞ্চালনের দরকার হয়। অবশ্য রক্তের এই উপাদানগুলি যদি আলাদাভাবে পাওয়া যায় এবং ঠিক কি উপাদানের ঘাটতি তা যদি ভালোভাবে নির্ণয় করা যায়,

তবে সেই বিশেষ উপাদান দিয়েই চিকিৎসা করা বিধেয়। অন্যথায় রোগীকে পুরো রক্ত সঞ্চালন করেই চিকিৎসা করা হয়।

৪। রোগীর রক্তের জমাট বাঁধার কোন বৈষম্য থাকলে, রোগীর রক্তে অণুচক্রিকা বা clotting factors-এর অভাব থাকলে অনেক সময়ই তাজা রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। রোগীর শরীরে immune bodies-এর ঘাটতি পূরণেও রক্ত সঞ্চালনের দরকার আছে।

৫। রোগীর সাংঘাতিক বীজাণু সংক্রমণ হলে immune bodies দিলে ভালো হয় এবং সেক্ষেত্রে তাজা রক্তসঞ্চালনে বিশেষ উপকার হয়।

অপারেশনের আগে রোগীর রক্তাল্পতা থাকলে তার চিকিৎসা করা আশু কর্তব্য। রোগীর রক্তপরীক্ষায় যদি তার হিমোগ্লোবিন শতকরা ১০ গ্রামের মত থাকে তবে বিশেষ চিকিৎসার দরকার নেই। তবে হিমোগ্লোবিন যদি শতকরা ৬ গ্রাম বা তারও নীচে থাকে, তখন রোগীকে অপারেশনের আগেই রক্তসঞ্চালন করার প্রয়োজন হয়। এই সব রোগীকে অপারেশনের অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা আগে রক্ত দেওয়া দরকার কেননা রক্তসঞ্চালনের প্রথমদিকে রক্তকণিকার অক্সিজেন পরিবহনের ক্ষমতা পর্যাপ্ত থাকে না। ৫৪০ মিলিলিটার রক্তসঞ্চালনে রোগীর হিমোগ্লোবিন মোটামুটি শতকরা ১ গ্রাম বাড়ে।

রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার :

রোগীর রক্তের group ঠিকভাবে দেখা হয় এবং এর পরে রক্তদাতার রক্তের সংগে প্রত্যক্ষভাবে cross matching করা হয়। এই পরীক্ষায় যদি দুই রক্তের মিশ্রণে কোন তারতম্য না ঘটে তবে সেই রক্তই নির্দিষ্ট রক্ত সঞ্চালনের জন্য বিবেচিত হয়। অবশ্য Rh factor ও এর সংগে দেখে নেওয়া হয়।

রোগীকে বিছানায় শুইয়ে সাধারণতঃ তার হাতের শিরাপথে রক্ত সঞ্চালন করা হয়। সংরক্ষিত রক্তের লেবেল দেখে, তার expiry date দেখে, রোগীকে পরীক্ষা করে, তার হাসপাতালের টিকিট পরীক্ষা করে ভালোভাবে দেখে নেওয়া হয় যাতে কোন ভুল রক্ত না দেওয়া হয়ে যায়। সংরক্ষিত রক্তে যদি কোন রকমের গণ্ডগোল মনে হয় তবে তা সঞ্চালনের আগেই ঠিক করে নেওয়া উচিত। Haemolysed রক্ত কখনই সঞ্চালনের উপযুক্ত নয়। সংরক্ষিত রক্ত যদি খুব ঠাণ্ডা হয় তবে রোগীর স্বাভাবিক তাপমাত্রার কাছাকাছি এনেই তা সঞ্চালন করা হয়। রক্ত সঞ্চালনের সময় ঐ রক্তের মধ্যে অন্য কোন ওষুধ দেওয়া উচিত নয়। এতে রক্তে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে এবং রক্তের অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে।

রক্ত সঞ্চালনের সরঞ্জাম নিখুঁত এবং বীজাণুমুক্ত থাকা একান্ত দরকার। উপযুক্ত চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে রক্ত সঞ্চালন করা উচিত। নতুবা আকস্মিক উপসর্গ দেখা দিলে রোগীর বিপদ ঘটতে পারে। খুব জরুরী না হলে অধিক রাত্রে বা অন্য কোন বাজে সময়ে রক্ত সঞ্চালন করা ঠিক নয়। রোগীর কাছাকাছি প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ঔষধপত্র থাকাও একান্ত দরকার।

রক্ত সঞ্চালনের সময় রোগীকে বার বার পরীক্ষা করা উচিত। তার নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ ইত্যাদিতে কোন হেরফের হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। রক্ত যেমন খুব আস্তে দেওয়ার দরকার নেই, তেমনই খুব তাড়াতাড়ি রক্ত দেওয়াও উচিত নয়। অত্যধিক কম সময়ে অধিক রক্ত দিলে রোগীর বিশেষ ক্ষতি হতে পারে।

এখন দেখা দরকার, রক্ত সঞ্চালনের ফলে কোন কোন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেগুলি কেন হয় এবং কীভাবেই এসবের চিকিৎসা করা হয় তাও সম্যক জানা দরকার।

রক্ত সঞ্চালনের (Blood transfusion-এর) বিরূপ প্রতিক্রিয়া :

এই প্রতিক্রিয়া নানা ধরনের হতে পারে এবং এগুলি সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার প্রথমটি immediate effects—যেগুলি রক্ত সঞ্চালনের প্রায় সংগে সংগেই হতে পারে। আর দ্বিতীয়টি late effects—যেগুলি রক্ত দেওয়ার বেশ কিছু কাল পরে দেখা যায়। তাৎক্ষণিক উপসর্গগুলি নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে :

১। অনেক রোগীরই অল্প স্বল্প জ্বর হতে পারে। এটি খুবই সাধারণ ব্যাপার। রোগীর দেহের তাপ বাড়ে, অল্প কাঁপুনি হতে পারে, বমি হতে পারে। এটি রোগীর শরীরে আগেকার কোন transfusion-এর জন্য, white cell antibodies থাকার জন্য হতে পারে। Gram negative endotoxin অথবা apparatus বীজাণুযুক্ত এবং দূষিত হওয়ার জন্যও হতে পারে।

২। Allergic reaction : রোগীর আগে থেকে কোন allergy-র অসুখ থাকলে রক্ত সঞ্চালনের সময় এই উপসর্গ হতে পারে। অনেক সময় চামড়ায় rash, কাঁপুনি, হাঁপানির টান ইত্যাদি হতে পারে। রোগীর নাড়ীর গতি বেড়ে যায় এবং রক্তচাপ কমে যায়। এই অবস্থায় antihistaminic ওষুধ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

৩। অত্যধিক রক্ত সঞ্চালনের ফলে রোগীর blood volume অস্বাভাবিক বেড়ে যেতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি রক্ত সঞ্চালনের ফলেও এমনটি হতে পারে। এর ফলে congestive failure, pulmonary congestion এবং এমন কি oedema পর্যন্ত হতে পারে। এর প্রথম দিকে গলার শিরাগুলি খুব বেশী engorged হতে দেখা যায়। রোগীর central venous pressure অত্যধিক বেড়ে যায়। সুতরাং রক্ত সঞ্চালন খুব সতর্কতার সংগে দেওয়া উচিত, বিশেষতঃ রক্তাল্পতা এবং হার্টের অসুখের ক্ষেত্রে।

৪। বহুদিন সাধারণ তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষণ করলে রক্তে বীজাণু জন্মাতে পারে এবং এর ফলে রোগীর gram negative endotoxaemia বা septicaemia হতে পারে। এতে রোগীর প্রচণ্ড shock হয়, জ্বর হয় এবং পেটে ব্যথা হতে পারে। Coagulation defect হয়ে অধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে।

৫। Massive blood transfusion : রোগীর নির্ধারিত blood volume-এর অর্ধেক বা তার বেশী রক্ত যদি ১ ঘণ্টা বা তারও কম সময়ে রোগীকে দেওয়া হয় তবে তাকে massive blood transfusion বলে। যদি পুরো blood volume ২৪ ঘণ্টায় বা তার কম সময়ে দেওয়া হয় তবে তাকেও massive transfusion বলা হয়।

এই অত্যধিক রক্ত সঞ্চালনের (massive blood transfusion-এর) জন্যই কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

[ক] সংরক্ষিত রক্তে অত্যধিক পটাশিয়াম থাকার জন্য রক্তসঞ্চালনের পর রোগীর hyperkalaemia হতে পারে। ১৫ দিন সংরক্ষিত রক্তে প্রতি লিটারে ২৫ mEq পটাশিয়াম থাকতে পারে।

[খ] রোগীর শরীরে অত্যধিক সাইট্রেট যাওয়ার জন্য citrate intoxication হতে পারে। এতে hypocalcaemia-র উপসর্গগুলি দেখা যায় এবং এই অবস্থায় রোগীকে ক্যালসিয়াম দিয়েই চিকিৎসা করা হয়। দেড় লিটার রক্ত দেওয়ার পর প্রতি ৫০০ মিলি লিটার রক্ত প্রতি ১০ মি. লি. ১০% ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড শিরাপথে দেওয়া উচিত, যাতে রোগীর citrate intoxication না হয়।

[গ] সংরক্ষিত রক্ত খুবই কম pH-এর হয় সুতরাং অত্যধিক রক্ত সঞ্চালন করলে রোগীর metabolic acidosis হতে পারে।

[ঘ] সংরক্ষিত রক্তে বেশী অ্যামোনিয়া থাকে তাই রোগীর শরীরেও তা বাড়তে পারে। এটি লিভারের রোগীর ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হতে পারে।

[ঙ] সংরক্ষিত অত্যধিক ঠাণ্ডা (৪ থেকে ৬° সেন্টিগ্রেড) রক্ত অল্প সময়ে অত্যধিক দিলে রোগীর দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যেতে পারে।

[চ] এই massive blood transfusion-এর ফলে অপারেশনের জায়গায় অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। এটি সংরক্ষিত রক্তে কম platelet, factor v এবং factor vll থাকার জন্যই হয়।

৬। রক্ত সঞ্চালনের সাজ সরঞ্জামে গণ্ডগোল থাকলে বা অত্যধিক চাপে রক্তসঞ্চালন করলে অনেক সময় রোগীর air embolism হতে পারে।

৭। Haemolytic reactions : এটি সবথেকে বিপজ্জনক অবস্থা এবং এটি কখনই হতে দেওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ দুই ভাবে এই উপসর্গ হতে পারে ঃ

ক) Intravascular : এতে এক group-এর রক্ত যদি অন্য group-এর লোককে দেওয়া হয় তবে incompatible blood transfusion হয়। এটি A B O incompatiablity অথবা Rh factor-এর গণ্ডগোলের জন্যই হয়।

খ) Extravascular ঃ যখন নষ্ট হয়ে যাওয়া রক্ত, অত্যধিক ঠাণ্ডা রক্ত বা অত্যধিক গরম রক্ত অথবা date expired রক্ত রোগীকে দেওয়ার ফলে haemylytic reaction হতে পারে।

এই অসম (incompatible) রক্ত সঞ্চালন ঘটলে প্রথম দিকে রোগীর মাথা ভারী বোধ হয়, হাত-পা ঝিন-ঝিন করে, বুকে এবং পেটে ব্যথা অনুভব হয়, শ্বাসকষ্ট হয়। রোগীর বমি ভাব হতে পারে, অল্প জ্বর হতে পারে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে আসতে থাকে—রোগীর shock হয়। পরের দিকে রোগীর haemoglobinaemia, haemoglobinuria এবং oliguria হতে পারে।

রোগী যদি অ্যানেস্থিসিয়ায় থাকে তবে রক্ত সঞ্চালনজনিত উপসর্গগুলি বিশেষ ভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু রক্ত সঞ্চালনের সময় রোগীর যদি অকারণে নাড়ীর গতি দ্রুত হতে থাকে বা রক্তচাপ কমে আসতে থাকে অথবা অপারেশনের জায়গা থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হতে থাকে তবে haemolytic reaction-এর কথা চিন্তা করা উচিত। এমতাবস্থায় রক্ত সঞ্চালন তখনই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। সংগে সংগে অন্য কোন fluid infusion দেওয়া দরকার। রোগীর

রক্ত এবং বোতলের রক্ত আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো উচিত। রোগীর প্রস্রাবও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি haemoglobinuria হয় তবে mannitol দিয়ে প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়াতে হবে, অবশ্য এর সংগে বেশী fluid শিরাপথে দিতে হবে। এই incompatible রক্তসঞ্চালনে মৃত্যুর হার প্রায় শতকরা ৩০। সুতরাং রক্তসঞ্চালনের আগে ভালোভাবে grouping এবং cross matching করা দরকার। রক্ত সঞ্চালনের সময় রোগীকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত যাতে প্রথমাবস্থাতেই উপসর্গগুলি ধরা পড়ে এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে, infusion দিতে হবে, acidosis হলে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট শিরাপথে দিতে হবে। খুব বেশী জ্বর হলে cooling করা দরকার।

রক্ত সঞ্চালনের পরবর্তী উপসর্গগুলি :

১। রোগীর প্রথম বার রক্তসঞ্চালনের পর অথবা প্রথম গর্ভবতী হওয়ার পর Rh factor-এর অসাম্য ঘটলে রোগী sensitised অবস্থায় থাকে। পরবর্তী রক্ত সঞ্চালনের সময় অথবা পরবর্তী গর্ভাবস্থায় রোগীর শরীরে তখন নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সুতরাং রক্তসঞ্চালনের সময় রক্তদাতা এবং গ্রহীতার Rh factor নির্ণয় করা দরকার এবং সেই মত মান অনুযায়ী রক্ত দেওয়া দরকার।

২। রোগীর রক্তসঞ্চালনে বেশ কয়েকদিন পর ন্যাবা (jaundice)-এ আক্রান্ত হতে পারে। এটি সাধারণতঃ delayed haemolytic reaction-এর জন্য হয়। এ সময় বার বার রক্তসঞ্চালন করেও রোগীর হিমোগ্লোবিন লেভেল খুব একটা বাড়ে না।

৩। রক্তসঞ্চালনের সময় রক্তদাতার কিছু অসুখ রক্তের মাধ্যমে গ্রহীতার হতে পারে। এই সব অসুখের মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সিফিলিস, virus hepatitis (homologus serum hepatitis), trypanosomiasis, bacteriaemia, septiciaemia ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং দাতার রক্ত গ্রহণ করার আগে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই নেওয়া দরকার।

৪। রোগীকে বার বার রক্তসঞ্চালনের ফলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লোহা জাতীয় খনিজ পদার্থ জমে যেতে দেখা যায়। একে বলে transfusional haemosiderosis। Aplastic anaemia অসুখে বহু বছর ধ'রে বার বার রক্ত সঞ্চালন করতে হয়, তাই এক্ষেত্রে haemosiderosis বেশী দেখা যায়।

৫। রোগীর যে শিরাপথে রক্তসঞ্চালন করা হয় সেখানে অনেক সময় thrombophlebitis হতে পারে।

৬। Immunosuppression : রক্তসঞ্চালনের পর রোগীর নিজের immune response কমে যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রক্তসঞ্চালন সব সময় বেশ নিরাপদ পদ্ধতি নয়। কিন্তু রক্তসঞ্চালন অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্যভাবে রোগীর প্রাণ বাঁচায়। তাই রক্তসঞ্চালনের যে সব কুফল হয় সেগুলি যাতে না হতে পারে তার আগে থেকেই ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথমেই রক্তদাতাদের ভালোভাবে বাছাই করা দরকার—গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (good quality control) থাকা দরকার। রক্তগ্রহীতারও ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে screening করা উচিত। Blood bank-এর ভালো ব্যবস্থা থাকা দরকার—আধুনিক যন্ত্রপাতির একান্ত প্রয়োজন।

রক্তসঞ্চালন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে করানো উচিত। রক্তসঞ্চালনের সময় রোগীর monitoring খুব সর্তকতার সংগে করা উচিত। কোন উপসর্গ দেখা দিলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

একটি কথা সব সময়েই মনে রাখা উচিত—রক্তসঞ্চালন কখনই সাধারণভাবে নেওয়া উচিত নয়। Absolute indication ছাড়া কখনও রক্তসঞ্চালন দেওয়া উচিত নয়। রোগীর দেহে যদি রক্তের বিশেষ component-এর অভাব থাকে তবে সম্ভব হলে তাই দিয়েই চিকিৎসা করা যেতে পারে। এতে মূল্যবান রক্ত অপচয় হয় না উপরন্তু রক্তসঞ্চালনজাত কুফলের আশংকাও অনেক কম হয়।

গ্রন্থ বিবরণী (Bibliography)

১। উইলি ডলিউ. ডি. এবং চার্চিল-ডেভিডশন এইচ. সি. ; এ প্রাকটিশ অফ অ্যানেস্থিসিয়া। লয়েড-লিউক (মেডিক্যাল বুকশ্) লিমিটেড, লণ্ডন, ১৯৭৯।

২। ওয়ালটার জে. বি. এবং ইজরায়েল এম. এস. : জেনারেল প্যাথোলজি। জে. অ্যাণ্ড এ. চার্চিল, লণ্ডন, ১৯৭০।

৩। কনডন আর. ই. এবং ডিকোশী জে. জে. ; সার্জিক্যাল কেয়ার। লী অ্যাণ্ড ফেবিজার, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৮০।

৪। কলিনশ্ ভি. জে. : প্রিন্সিপলস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি। কোঠারি বুক ডিপো, বোম্বাই, ১৯৭২।

৫। গ্রে টি. সি. এবং নান জে. এফ. : জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া। ১ম এবং ২য় ভল্যুম, বাটারওয়ার্থস্, লণ্ডন, ১৯৮১।

৬। থর্নটন জে. এ. এবং লেভি সি. জে. : টেকনিকস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়া। চ্যাপমান অ্যাণ্ড হল, লণ্ডন, ১৯৭৪।

৭। পাল এ. কে. : এসেনশিয়ালস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কলিকাতা এবং দিল্লী, ১৯৮০।

৮। প্রায়র ডব্লিউ. জে. এবং বুশ ডি. সি. টি : এ ম্যানুয়াল অফ অ্যানেস্থিটিক টেকনিকস্। জন রাইট অ্যাণ্ড সন্স, লণ্ডন, ১৯৬৯।

৯। ফারমান জে. ভি. : অ্যানেস্থিসিয়া অ্যাণ্ড ই. এম. ও. সিষ্টেম। দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুক সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯৭০।

১০। বাক্সটন হফকিন ডি. এ. : অ্যানেস্থিসিয়া, রিকভারি অ্যাণ্ড ইনটেনশিভ কেয়ার। দি ইংলিশ ইউনিভারশিটি প্রেশ লিমিটেড, লণ্ডন, ১৯৭০।

১১। বিজলে জে. এম. এবং জোনস এস. ই. এফ. : এ গাইড টু পিডিয়াট্রিক অ্যানেস্থিসিয়া। ব্ল্যাকওয়েল সায়েন্টিফিক পাবলিকেশস্, লণ্ডন, ১৯৮০।

১২। লরেন্স ডি. আর. : ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুক সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯৮০।

১৩। লী জে. এ. এবং অ্যাটকিনশন আর. এস. : এ সিনপশিশ অফ অ্যানেস্থিসিয়া। দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুক সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯৭৩।

চিত্র-পরিচিতি

কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

রক্ত

আয়োডিন ১৩১ আপটেক ১১—৩৩°/॰ ৪ ঘণ্টায়
ইউরিয়া ১৫—৪০ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
ইউরিক এসিড ২—৬ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
এসিড ফসফাটেজ ১—৫ কে. এ. ইউনিট/১০০ মি. লি.
এলক্যালি রিজার্ভ ২৪—৩৫ মি. ইকুই/লিটার
এলক্যালাইন ফসফাটেজ ৩—১৩ কে. এ. ইউনিট/১০০ মি. লি.
কর্টিশল (Cortisol) সকাল ৯টায় ৬—২৬ মাইক্রোগ্রাম/১০০ মি. লি.
মধ্যরাত্রে ৬—৮ মাইক্রোগ্রাম/১০০ মি. লি.
ক্যালসিয়াম ৯—১১ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
কোলেষ্টরল ১৪৫—২৮০ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
ক্লোরাইড ৯৫—১১০ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
ক্রিয়েটিন ১—২ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
ক্রিয়েটিন ফসফোকাইনেজ (C P K) ০—৩৫ আই. ইউ/লিটার
গ্লুকোজ অনশনে (fasting) ৭০—১২০ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
খাবার পরে ১৮০ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি. পর্য্যন্ত
টি৩ (T_3) রেজিন আপটেক ৮৮—১১০°/॰
ট্রাইগ্লিসারাইড (অনশনে) ৬০—১৬০ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
ট্রান্স এমাইনেজ :
এস. জি. ও. টি. ০—২৫ ইউনিট/লিটার
এস. জি. পি. টি. ০—২০ ইউনিট/লিটার
থাইরক্সিন ৫·৫—১২·৫ মাইক্রোগ্রাম/১০০ মি. লি.
নন-প্রোটীন নাইট্রোজেন ২০—৪০ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
পটাশিয়াম ৩—৫ মি. ইকুই/লিটার
পি. এইচ. (pH) ৭·৩—৭·৫

পিO₂ (Po₂) ৯০—১০০ মি. মি. মার্কারী
পি CO₂ (Pco₂) ৩৫—৪৫ মি. মি. মার্কারী
প্রোটীন বাউণ্ড আয়োডিন ৪—৮ মাইক্রোগ্রাম /১০০ মি. লি.

প্রোটীন ঃ

অ্যালবুমিন ৪—৫˙৫ গ্রা./১০০ মি. লি.
গ্লোবিউলিন ১˙৫—৩ গ্রা./১০০ মি. লি.
ফিব্রিনোজেন ০˙২—০˙৫ গ্রা./১০০ মি. লি.
মোট ৬—৮ গ্রা/১০০ মি. লি.

ফসফেট ৩—৪˙৫ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
বাইকার্বোনেট ২২—২৮ মি. ইকুই/ লিটার
বিলিরুবিন ০˙১—১ মি. গ্রা. /১০০ মি. লি.
ম্যাগনেশিয়াম ১˙৫—৩ মি. ইকুই/লিটার
সিউডোকোলিন এষ্টারেজ ৪০—১০০ ইউনিট/১০০ মি. লি.
সোডিয়াম ১৩৫—১৫০ মি. ইকুই/লিটার

রক্তসম্বন্ধীয় অন্যান্য তথ্য ঃ

শরীরে রক্তের পরিমাণ ঃ ৩˙৫—৭ লিটার
পূর্ণবয়স্কদের ৮৫ মি.লি. /কে. জি.
শিশুদের ৯০ মি. লি./কে.জি.

হিমোগ্লোবিন ঃ

পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৩˙৫—১৮ গ্রা. /১০০ মি. লি.
স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১১˙৫—১৬˙৫ গ্রা. /১০০ মি. লি.
জন্মসময়ে ১৭—১৮ গ্রা. /১০০ মি. লি.

লোহিতকণিকার সংখ্যা ঃ

পুরুষদের ৪˙৫—৬˙৫ মিলিয়ন প্রতি ঘন মিলিমিটারে
স্ত্রীলোকের ৩˙৯—৫˙৬ মিলিয়ন প্রতি ঘন মি. মি.
Bleeding time ঃ ২ থেকে ৫ মিনিট

Coagulation time :

রাইট ক্যাপিলারী পদ্ধতিতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট

লী এবং হোয়াইট (venous) ৫—৭ মিনিট
বর্ণসূচক (Colour index) ০·৮৫—১·১৫
এরিথ্রোসাইট সেডিমেণ্টেশন রেট (ESR) ঃ
প্রথম ঘণ্টায় ২ থেকে ১২ মি. মি.

প্যাক সেল ভল্যুম (P C V) ঃ
পুরুষদের ৪০—৫৪%
স্ত্রীলোকদের ৩৫—৪৭%
লোহিতকণিকার গড় ব্যাস (Mean Corpuscular Diameter) :
৬·৭—৭·৭ μ
লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিনের গড় পরিমাণ (Mean Corpuscular Haemoglobin) : ২৭—৩২ μμ গ্রাম
লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিনের গড় তীব্রতা (Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration) ঃ ৩২—৩৬ গ্রাম. %
লোহিতকণিকার গড় আয়তন (Mean Corpuscular Volume) :
৮০-৯২ ঘন μ

রেটিকিউলোসাইট সংখ্যা (Reticulocyte Count) : ০·২—২%

শ্বেতকণিকা ঃ—

মোট পরিমাণ ১১০০০/ঘন মি. মি.
নিউট্রোফিল ২৫০০—৭৫০০/ঘন মি. মি. (৬৫-৭০%)
লিম্ফোসাইট ১৫০০—৩৫০০/ঘন মি. মি. (২০-২৫%)
এওসিনোফিল ৪০—৪৪০/ঘন মি.মি. (০-৪%)
বেসোফিল ০—১০০/ঘন মি. মি. (০-১%)
মনোসাইট ২০০—৮০০/ঘন মি. মি. (৫-৬%)

অনুচক্রিকা সংখ্যা (Platelet count) ঃ ২৫০০০০ থেকে ৫০০০০০/ঘন মি.মি.
প্রোথ্রম্বিন সময় (Prothrombin time) : ১৪ সেকেণ্ড

Cerebrospinal fluid :

পরিমাণ ১২০—১৫০ মি. লি.
কোষসমষ্টি (cells) ০—১০/ঘন মি.মি.
ক্লোরাইড ৭০০—৭৫০ মি.গ্রা./১০০ মি.লি.

প্রেশার ৭০—১৮০ মি.মি. H_2O

প্রোটিন ১০—৪৫ মি.গ্রা./১০০মি.লি.

গ্লুকোজ ৪০—৭০ মি.গ্রা./১০০ মি.লি.

প্রস্রাব (Urine) :

Specific gravity ১০১০—১০২৫

pH ৪˙৮—৭˙৪ (গড় ৬)

পরিমাণ ১৫০০—২০০০ মি.লি./২৪ ঘণ্টা

ক্লোরাইড ১৭০—২৫০ মি. ইকুই./২৪ ঘণ্টা

পটাশিয়াম ৩৫—৯০ মি. ইকুই/২৪ ঘণ্টা

ফসফেট ৩০—৯০ মি. ইকুই./২৪ ঘণ্টা

সোডিয়াম ১১০—২৪০ মি. ইকুই./২৪ ঘণ্টা

ইউরিয়া ১০—৩৫ গ্রা./২৪ ঘণ্টা

ইউরোবিলিনোজেন ০—৪ মি.গ্রা./২৪ ঘণ্টা

ক্যালসিয়াম ০˙১—০˙৩ গ্রা./২৪ ঘণ্টা

অ্যামোনিয়া ০˙১৪—১˙৪৭ গ্রা./২৪ ঘণ্টা

ক্রীয়েটিন ০˙১৫—০˙২৫ গ্রা./২৪ ঘণ্টা

ক্রীয়েটিনিন ১৬—২১ মি.গ্রা./কে.জি./২৪ ঘণ্টা

ইউরিক এসিড ০˙২—০˙৭ গ্রা./২৪ ঘণ্টা

শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষের কয়েকটি বিশেষ তথ্য :

	শিশু (গড় হিসাবে)	পূর্ণ বয়স্ক (গড় হিসাবে)
শরীরের ওজন (কে.জি.)	৩˙৫	৭০
সারফেস আয়তন (বর্গমিটার)	০˙২১	১˙৯
ট্রেকীয়ার ব্যাস (মি.মি.)	৮	১৮
শ্বাসক্রিয়া (প্রতি মিনিট)	৪০	২০
Tidal volume (মি.লি./কে.জি.)	৬	৭
Dead space (মি.লি./কে.জি.)	২˙২	২˙২
Vital capacity (মি.লি./কে.জি.)	৩৩	৫২
Minute volume (মি.লি./কে.জি.)	৬৫০	৬০০০

ফুসফুসের ওজন (গ্রাম)	৫০	৮০০
Alveolar ventilation (মি.লি./কে.জি./ মিনিট)	১২৫	৬০
অক্সিজেন consumption (মি.লি./কে.জি./ মিনিট)	৬.৯	৩.৩
Left ventricular output (মি.লি./ কে.জি./মিনিট)	৩৫০	১০০
Arterial অক্সিজেন টেনশন (মি.মি. মার্কারী)	৭৫	৯৫
Arterial কারবন ডাই-অক্সাইড টেনশন (মি.মি. মার্কারী)	৩৫	৪০

বাতাসের গঠন ঃ

নাইট্রোজেন	৭৮.০৮%
অক্সিজেন	২০.৯%
কারবন ডাই-অক্সাইড	০.০৪%
আর্গন	০.৯৩%
অন্যান্য গ্যাস—নাম মাত্র	

Endotracheal টিউবের মাপ ঃ

বয়স	টিউবের গড় দৈর্ঘ্য	টিউবের গড় ভিতরকার ব্যাস
নবজাত	১০—১২ সে.মি.	৩—৩.৫ মি.মি
১—১২ মাস	১২—১৬ সে.মি.	৩.৫—৫ মি. মি.
১—৩ বছর	১৬—১৮ সে.মি	৫—৬ মি.মি.
৪—৬ বছর	১৮—২০ সে.মি.	৫.৫—৬.৫ মি.মি.
৭—১৫ বছর	২০—২৪ সে.মি.	৬—৭.৫ মি.মি.
পূর্ণবয়স্ক	২৪—২৮ সে.মি.	৭.৫—৯.৫ মি.মি.

দেহ-তরল (body fluid) :

(দৈহিক ওজনের শতকরা হিসাবে)

মোট দেহ-তরল—পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬০%

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ৫০%

শিশুদের ক্ষেত্রে ৭৫%

অন্তরকোষীয় দেহ-তরল (intracellular fluid) ঃ

শরীরের ওজন অনুপাতে ঃ

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ৪০%

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোক ৩০%

শিশু ৪০%

বহির্কোষীয় দেহ-তরল (extracellular fluid) :

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ২০%	(প্লাজমা ৪% + অন্যান্য ১৬%)
পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোক ২০%	(প্লাজমা ৪% + অন্যান্য ১৬%)
শিশু ৩৫%	(প্লাজমা ৫% + অন্যান্য ৩০%)

দৈনিক গড় জলসাম্য (water balance) ঃ

জলের গ্রহণ—

পানীয় জল হিসাবে ১৫০০ মি.লি.

খাদ্যনিহিত জল হিসাবে ৭০০ মি. লি.

দেহে জারন প্রক্রিয়ায় ৩০০ মি. লি.

মোট ২৫০০। মি.লি.

জলের রেচন (excretion) ঃ

মূত্র ১৫০০ মি.লি.

মল ১০০ মি.লি.

ত্বক মাধ্যমে ৫০০ মি.লি.

ফুসফুস মাধ্যমে ৪০০ মি. লি.

মোট ২৫০০ মি. লি.

শিশুদের ক্ষেত্রে গড় নাড়ী, শ্বাসক্রিয়া এবং রক্তচাপ ঃ

	নাড়ী প্রতি মিনিটে	শ্বাসক্রিয়া প্রতিমিনিটে	রক্তচাপ (মি. মি. মার্কারী)
নবজাত	১৬০-১৮০	১৮-৪০	৮০/৫০
১-৪ বছর	১০০-১১০	২৫-৩৫	৮৫/৬০
৫-৭ বছর	৮০-১০০	২০-৩০	৯০/৬০
৮-৯ বছর	৮০-১০০	২০-২৫	৯৫/৬৫
১০ বছর	৮০-১০০	২০-২৫	১০০/৬৫
প্রাপ্তবয়স্ক	৭০-৭৪	১২-২০	১২০/৮০

কিছু রূপান্তর তালিকা :

দৈর্ঘ্য : ১ মাইল = ১৭৬০ গজ = ৫২৮০ ফুট = ১'৬০৯ কি. মি.
১ গজ = ৩ ফুট = ০'৯১৪ মিটার
১ ফুট = ১২ ইঞ্চি
১ ইঞ্চি = ২'৫৪ সে. মি. = ২৫ মি. মি
১ সে. মি = ০'৩৯৪ ইঞ্চি
১ মিটার = ১০০সে. মি. = ৩৯'৪ ইঞ্চি
১ কিলোমিটার = ০'৬২ মাইল

আয়তন : ১ একর = ৪৮৪০ বর্গগজ
১ বর্গফুট = ১৪৪ বর্গ ইঞ্চি
১ বর্গ ইঞ্চি = ৬'৪৫ বর্গ সে. মি.
১ বর্গমিটার = ১০'৮ বর্গ ফট
১ বর্গ সে. মি. = ০'১৫ বর্গ ইঞ্চি

১ ঘন ফুট = ১৭২৮ ঘন ইঞ্চি
১ ঘন ইঞ্চি = ১৬'৪ ঘন সে. মি.
১ ঘন সে. মি = ০'০৬১ ঘন ইঞ্চি

British Standard :
১ গ্যালন = ৮ পাইন্ট = ১৬০ ফ্লুইড আউন্স = ২৭৭ ঘন ইঞ্চি
১ পাইন্ট = ২০ ফ্লুইড আউন্স = ৫৬৮ মি. লি.
১ আউন্স = ২৮'৪ মি. লি.
১ লিটার = ০'২২ গ্যালন = ৩৫'২ ফ্লুইড আউন্স
৪৮০ মিনিম = ১ আউন্স
১ মিনিম = ০'০৫৯ মি. লি.
১ ফ্লুইড ড্রাম = ৩'৫ মি. লি.
১ মি. লি. = ১৭ মিনিম

U.S.A. Standard :
১ গ্যালন = ৮ পাইন্ট = ১২৮ ফ্লুইড আউন্স = ২৩১ ঘন ইঞ্চি = ৩'৭৮ লিটার

১ পাইন্ট = ১৬ ফ্লুইড আউন্স = ৪৭৩ মি. লি.

১ ফ্লুইড আউন্স=১'৮ ঘন ইঞ্চি=২৯'৬ মি.লি.

১ U. S. গ্যালন=০'৮৩ ব্রিটিশ গ্যালন

ওজন : ১ কে. জি=২'২ পাউণ্ড

১ পাউণ্ড =০'৪৫ কে. জি.=৪৫৩'৬ গ্রাম=১৬ আউন্স

১ আউন্স =২৮'৩ গ্রাম

১ গ্রাম =১০০০ মিলি গ্রাম=১৫'৪ গ্রেন=০'০৩৫৩ আউন্স

১ গ্রেন=৬৫ মিলি গ্রাম

গ্রেন × ০' ৯৬৪৮ =গ্রাম

গ্রাম × ১৫'৪৩২ =গ্রেন

প্রেশার : ১ অ্যাটমোস্‌ফীয়ার=৭৬০ মি.মি. মার্কারী

=১০'৩ মি. H_2O

=১'০৩৩ কে. জি. / বর্গ সে. মি.

=১৪' ৭০ পাউণ্ড / বর্গ ইঞ্চি

=৩৩'৯ ফুট H_2O

=২৯'৯২ ইঞ্চি মার্কারী

=২১১৬ পাউণ্ড/বর্গফুট

১ মি. মি. মার্কারী=১'৩৬ সে. মি. H_2O

১ সে. মি. H_2O=০'৭৩৫ মি. মি. মার্কারী

তাপ :

সেলশিয়াশ থেকে ফারেনহিট :

$^{o}F=(^{o}C\times\frac{৯}{৫})+৩২$

ফারেনহিট থেকে সেলশিয়াশ :

$^{o}C=(^{o}F-৩২)\times\frac{৫}{৯}$

পারিবারিক পরিমান পদ্ধতি :

১ চা চামচ=৫ মি. লি.

১ টেবল চামচ=১৫ মি. লি.

১ কাপ=২৪০ মি. লি

নির্দেশিকা